বিচিত্র প্রবন্ধ

বিচিত্র প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
প্রকাশক—শ্রীকিশোরীমোহন সাঁতরা

বিচিত্র প্রবন্ধ

প্রথম সংস্করণ ... . বৈশাখ, ১৩১৪
পুনর্মুদ্রণ ... ১৩২৩
* * * *
দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্ত্তিত) .. চৈত্র, ১৩৪২

মূল্য—১৲

শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন (বীরভূম)
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা

এই গ্রন্থের পরিচয় আছে "বাজে কথা" প্রবন্ধে। অর্থাৎ ইহার যদি কোনো মূল্য থাকে তাহা বিষয়বস্তু-গৌরবে নয়, রচনা-রস-সম্ভোগে।

পাঠ-পরিচয়

"বিচিত্র প্রবন্ধের" পূর্ব্বের শৃঙ্খলা ভাঙিয়া, এবারে রচনাগুলিকে কালানুক্রমিকভাবে সাজানো হইয়াছে। "নানাকথা" ও "পথপ্রান্তে" নামক রচনাদুইটি পঞ্চাশ বৎসর আগেকার "ভারতী" এবং "বালক" পত্রিকাদ্বয় হইতে সংগৃহীত। ইতিপূর্ব্বে আর কোনো গ্রন্থে ইহারা প্রকাশিত হয় নাই। বিষয় ও ভঙ্গীগত মিল থাকায় আষাঢ়, সোনার কাঠি, ছবির অঙ্গ ও শরৎ—রচনাচারিটি "পরিচয়" গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া ইহাতে যোগ করা গেল। পক্ষান্তরে, রাজপথ, য়ুরোপযাত্রী, পঞ্চভূত, জলপথে, ঘাটে, স্থলে ও বঙ্গস্মৃতি রচনা-কয়টি এবারে বাদ দেওয়া হইয়াছে। কারণ, উহার কোনোটি পূর্ব্ব হইতেই অন্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল, আর, কোনোটি বা বিষয়ের সামঞ্জস্যহেতু শীঘ্রই গ্রন্থান্তরে সঙ্কলিত হইবে। স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে "পঞ্চভূতের" একটি নূতন সংস্করণ অচিরেই প্রকাশিত হইতেছে। ইতি—

গত দশ বৎসরের পত্র-সংগ্রহ হইতে ২৫টি পত্র বাছিয়া গ্রন্থশেষে "চিঠির টুকরি"-নামে প্রকাশ করা হইয়াছে।

চৈত্র, ১৩৪২ প্রকাশক

সূচীপত্র

বিচিত্র প্রবন্ধ

সরোজিনী প্রয়াণ

(অসমাপ্ত বিবরণ)

১১ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার। ইংরাজি ২৩শে মে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ। আজ শুভলগ্নে "সরোজিনী" বাষ্পীয় পোত তাহার দুই সহচরী লৌহতরী দুই পার্শ্বে লইয়া বরিশালে তাহার কর্ম্মস্থানের উদ্দেশে যাত্রা করিবে। যাত্রীর দল বাড়িল। কথা ছিল আমরা তিন জনে যাইব—তিনটি বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ মানুষ। সকালে উঠিয়া জিনিষপত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়া আছি, পুরুষ-পরিহসনীয়া শ্রীমতী ভ্রাতৃজায়া ঠাকুরাণীর নিকটে ম্লানমুখে বিদায় লইবার জন্য সমস্ত উদ্যোগ করিতেছি এমন সময় শুনা গেল তিনি সসন্তানে আমাদের অনুবর্ত্তিনী হইবেন। তিনি কার মুখে শুনিয়াছেন যে আমরা যে-পথে যাইতেছি, সে পথ দিয়া বরিশালে যাইব বলিয়া অনেকে বরিশালে যায় নাই এমন শুনা গিয়াছে, আমরাও পাছে সেইরূপ ফাঁকি দিই এই সংশয়ে তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া নিজের ডান হাতের পাঁচটা ছোটো ছোটো সরু সরু আঙুলের নখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিস্তর বিবেচনা করিতে লাগিলেন, অবশেষে ঠিক আটটার সময়

নথাগ্র হইতে যতগুলো বিবেচনা ও যুক্তি সংগ্রহ সম্ভব সমস্ত নিঃশেষে আকর্ষণ করিয়া লইয়া আমাদের সঙ্গে গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন।

সকালবেলায় কলিকাতার রাস্তা যে বিশেষ সুদৃশ্য তাহা নহে, বিশেষতঃ চিৎপুর রোড। সকালবেলাকার প্রথম সূর্য্যকিরণ পড়িয়াছে, শ্যাক্‌রা গাড়ির আস্তাবলের মাথায়,—আর এক সার বেলোয়ারি ঝাড়ওয়ালা মুসলমানদের দোকানের উপর। গ্যাস-ল্যাম্পগুলোর গায়ে সূর্য্যের আলো এমনি চিক্‌মিক্ করিতেছে সেদিকে চাহিবার জো নাই। সমস্ত রাত্রি নক্ষত্রের অভিনয় করিয়া তাহাদের সাধ মেটে নাই, তাই সকাল বেলায় লক্ষ যোজন দূর হইতে সূর্য্যকে মুখ ভেঙাইয়া অতিশয় চক্‌চকে মহত্ত্ব-লাভের চেষ্টায় আছে। ট্রামগাড়ি শিস্ দিতে দিতে চলিয়াছে, কিন্তু এখনো যাত্রী বেশি জোটে নাই। ম্যুনিসিপালিটির শকট কলিকাতার আবর্জ্জনা বহন করিয়া, অত্যন্ত মন্থর হইয়া চলিয়া যাইতেছে। ফুট্‌পাথের পার্শ্বে সারি সারি শ্যাক্‌রা গাড়ি আরোহীর অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া; সেই অবসরে অশ্বচর্ম্মাবৃত চতুষ্পদ কঙ্কালগুলা ঘাড় হেঁট করিয়া অত্যন্ত শুকনো ঘাসের আঁটি অন্যমনস্কভাবে চিবাইতেছে, তাহাদের সেই পারমার্থিক ভাব দেখিলে মনে হয় যে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহারা তাহাদের সম্মুখস্থ ঘাসের আঁটির সঙ্গে সমস্ত জগৎসংসারের তুলনা করিয়া সারবত্তা ও সরসতা সম্বন্ধে কোনো প্রভেদ দেখিতে পায় নাই। দক্ষিণে মুসলমানের দোকানের হৃতচর্ম্ম খাসীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কতক দড়িতে ঝুলিতেছে, কতক খণ্ড খণ্ড আকারে শলাকা আশ্রয় করিয়া অগ্নিশিখার উপরে ঘুর খাইতেছে এবং বৃহৎকায় রক্তবর্ণ কেশবিহীন শ্মশ্রুলগণ বড়ো বড়ো হাতে মস্ত মস্ত রুটি সেঁকিয়া তুলিতেছে। কাবাবের দোকানের পাশে ফুঁকো ফানুষ নির্ম্মাণের জায়গা, অনেক ভোর হইতেই তাহাদের চুলায় আগুন জ্বালানো হইয়াছে। ঝাঁপ খুলিয়া কেহ বা হাত মুখ ধুইতেছে, কেহ বা দোকানের সম্মুখে ঝাঁট দিতেছে, দৈবাৎ কেহ বা লাল কলপ দেওয়া দাড়ি

লইয়া চোখে চসমা আঁটিয়া একখানা পার্সী কেতাব পড়িতেছে। সম্মুখে মসজিদ; একজন অন্ধ ভিক্ষুক মসজিদের সিঁড়ির উপরে হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

গঙ্গার ধারে কয়লাঘাটে গিয়া পৌঁছানো গেল। সম্মুখ হইতে ছাউনিওয়ালা বাঁধা নৌকাগুলা দৈত্যদের পায়ের মাপে বড়ো বড়ো চটিজুতার মতো দেখাইতেছে। মনে হইতেছে, তাহারা যেন হঠাৎ প্রাণ পাইয়া অনুপস্থিত চরণগুলি স্মরণ করিয়া চট্‌চট্ করিয়া চলিবার প্রতীক্ষায় অধীর হইয়া পড়িয়াছে। একবার চলিতে পাইলে হয়, এইরূপ তাহাদের ভাব; একবার উঠিতেছে, যেন উঁচু হইয়া ডাঙার দিকে চাহিয়া দেখিতেছে কেহ আসিতেছে কি না,—আবার নামিয়া পড়িতেছে। একবার আগ্রহে অধীর হইয়া জলের দিকে চলিয়া যাইতেছে, আবার কী মনে করিয়া আত্মসম্বরণ পূর্ব্বক তীরের দিকে ফিরিয়া আসিতেছে। গাড়ি হইতে মাটিতে পা দিতে না দিতে ঝাঁকে ঝাঁকে মাঝি আমাদের উপরে আসিয়া পড়িল। এ বলে আমার নৌকায়, ও বলে আমার নৌকায়, এইরূপে মাঝির তরঙ্গে আমাদের তনুর তরী একবার দক্ষিণে, একবার বামে, একবার মাঝখানে আবর্ত্তের মধ্যে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। অবশেষে অবস্থার তোড়ে, পূর্ব্ব জন্মের বিশেষ একটা কী কর্ম্মফলে বিশেষ একটা নৌকার মধ্যে গিয়া পড়িলাম। (পাল তুলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। গঙ্গায় আজ কিছু বেশি ঢেউ দিয়াছে, বাতাসও উঠিয়াছে। এখন জোয়ার। ছোটো ছোটো নৌকাগুলি আজ পাল ফুলাইয়া ভারি তেজে চলিয়াছে, আপনার দেমাকে আপনি কাৎ হইয়া পড়ে বা! একটা মস্ত ষ্টীমার দুই পাশে দুই লৌহতরী লইয়া আশপাশের ছোটোখাটো নৌকাগুলির প্রতি নিতান্ত অবজ্ঞাভাবে লোহার নাকটা আকাশে তুলিয়া গাঁ গাঁ শব্দ করিতে করিতে সধূম নিশ্বাসে আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে।) মনোযোগ দিয়া দেখি আমাদেরই জাহাজ—রাখ্ রাখ্ থাম্ থাম্। মাঝি

কহিল—"মহাশয়, ভয় করিবেন না, এমন ঢের বার জাহাজ ধরিয়াছি।" বলা বাহুল্য এবারও ধরিল। জাহাজের উপর হইতে একটা সিঁড়ি নামাইয়া দিল। ছেলেদের প্রথমে উঠানো গেল, তাহার পর আমার ভাজ ঠাকুরাণী যখন বহু কষ্টে তাঁহার স্থল-পদ্ম-পা-দুখানি জাহাজের উপর তুলিলেন তখন আমরাও মধুকরের মতো তাহারি পশ্চাতে উপরে উঠিয়া পড়িলাম।

(২)

যদিও স্রোত এবং বাতাস প্রতিকূলে ছিল, তথাপি আমাদের এই গজবর ঊর্দ্ধশুণ্ডে বৃংহিতধ্বনি করিতে করিতে গজেন্দ্রগমনের মনোহারিতা উপেক্ষা করিয়া চত্বারিংশ তুরঙ্গ-বেগে ছুটিতে লাগিল। আমরা ছয় জন এবং জাহাজের বৃদ্ধ কর্ত্তাবাবু এই সাত জনে মিলিয়া জাহাজের কামরার সম্মুখে খানিকটা খোলা জায়গায় কেদারা লইয়া বসিলাম। আমাদের মাথার উপরে কেবল একটি ছাত আছে। সম্মুখ হইতে হুহু করিয়া বাতাস আসিয়া কানের কাছে সোঁ সোঁ করিতে লাগিল, জামার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে অকস্মাৎ ফুলাইয়া তুলিয়া ফর ফর আওয়াজ করিতে থাকিল এবং আমার ভ্রাতৃজায়ার সুদীর্ঘ সুসংযত চুলগুলিকে বার বার অবাধ্যতাচরণে উৎসাহিত করিয়া তুলিল। তাহারা না কি জাত-সাপিণীর বংশ, এই নিমিত্ত বিদ্রোহী হইয়া বেণী বন্ধন এড়াইয়া পূজনীয়া ঠাকুরাণীর নাসাবিবর ও মুখরন্ধ্রের মধ্যে পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিল, আবার আর কতকগুলি ঊর্দ্ধমুখ হইয়া আস্ফালন করিতে করিতে মাথার উপর রীতিমতো নাগলোকের উৎসব বাধাইয়া দিল; কেবল বেণী নামক অজগর সাপটা শত বন্ধনে বদ্ধ হইয়া, শত

শেলে বিদ্ধ হইয়া, শত পাক পাকাইয়া নির্জ্জীব ভাবে খোঁপা আকারে ঘাড়ের কাছে কুণ্ডলী পাকাইয়া রহিল। অবশেষে কখন এক সময়ে দাদা কাঁধের দিকে মাথা নোয়াইয়া ঘুমাইতে লাগিলেন, বৌঠাকুরাণীও চুলের দৌরাত্ম্য বিস্মৃত হইয়া চৌকির উপরে চক্ষু মুদিলেন।

জাহাজ অবিশ্রাম চলিতেছে। (ঢেউগুলি চারিদিকে লাফাইয়া উঠিতেছে—তাহাদের মধ্যে এক-একটা সকলকে ছাড়াইয়া শুভ্র ফণা ধরিয়া হঠাৎ জাহাজের ডেকের উপর যেন ছোবল মারিতে আসিতেছে—গর্জ্জন করিতেছে, পশ্চাতের সঙ্গীদের মাথা তুলিয়া ডাকিতেছে—স্পর্দ্ধা করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া চলিতেছে—মাথার উপরে সূর্য্যকিরণ দীপ্তিমান চোখের মতো জ্বলিতেছে—নৌকাগুলাকে কাৎ করিয়া ধরিয়া তাহার মধ্যে কী আছে দেখিবার জন্য উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিতেছে, মুহূর্ত্তের মধ্যে কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিয়া নৌকাটাকে ঝাঁকানী দিয়া আবার কোথায় তাহারা চলিয়া যাইতেছে। আপিসের ছিপ্ ছিপে পান্সীগুলি পালটুকু ফুলাইয়া আপনার মধুর গতির আনন্দ আপনি যেন উপভোগ করিতে করিতে চলিতেছে, তাহারা মহৎ মাস্তুল-কিরীটী জাহাজের গাম্ভীর্য্য উপেক্ষা করে, ষ্টীমারের পিনাক ধ্বনিও মান্য করে না, বরঞ্চ বড়ো বড়ো জাহাজের মুখের উপর পাল দুলাইয়া হাসিয়া রঙ্গ করিয়া চলিয়া যায়, জাহাজও তাহাতে বড়ো অপমান জ্ঞান করে না।) কিন্তু গাধাবোটের ব্যবহার স্বতন্ত্র, তাহাদের নড়িতে তিন ঘণ্টা, তাহাদের চেহারাটা নিতান্ত স্থূলবুদ্ধির মতো—তাহারা নিজে নড়িতে অসমর্থ হইয়া অবশেষে জাহাজকে সরিতে বলে—তাহারা গায়ের কাছে আসিয়া পড়িলে সেই স্পর্দ্ধা অসহ্য বোধ হয়।

এক সময় শুনা গেল আমাদের জাহাজের কাপ্তেন নাই। জাহাজ ছাড়িবার পূর্ব্ব রাত্রেই সে গা-ঢাকা দিয়াছে। শুনিয়া আমার ভাজ-ঠাকুরাণীর ঘুমের ঘোর একেবারে ছাড়িয়া গেল—তাঁহার সহসা মনে

হইল যে, কাপ্তেন যখন নাই তখন নোঙবেব অচল-শরণ অবলম্বন করাই শ্রেয়। দাদা বলিলেন তাহাব আবশ্যক নাই, কাপ্তেনের নীচেকার লোকেরা কাপ্তেনের চেয়ে কোনো অংশে ন্যূন নহে। কর্ত্তাবাবুরও সেইরূপ মত। বাকি সকলে চুপ কবিয়া বহিল কিন্তু তাহাদেব মনের ভিতরটা আর কিছুতেই প্রসন্ন হইল না। তবে, দেখিলাম নাকি জাহাজটা সত্য সত্যই চলিতেছে, আব, হাঁক-ডাকেও কাপ্তেনের অভাব সম্পূর্ণ ঢাকা পড়িযাছে, তাই চুপ মারিয়া রহিলাম। হঠাৎ জাহাজের হৃদয়েব ধুক-ধুক শব্দ বন্ধ হইয়া গেল—কল চলিতেছে না—নোঙর ফেলো, নোঙর ফেলো বলিয়া শব্দ উঠিল—নোঙব ফেলা হইল। কলের এক জায়গায় কোথায় একটা জোড় খুলিয়া গেছে—সেটা মেরামত কবিলে তবে জাহাজ চলিবে। মেবামত আরম্ভ হইল। এখন বেলা সাড়ে-দশটা, দেড়টার পূর্ব্বে মেরামত সমাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

বসিয়া বসিয়া গঙ্গাতীবেব শোভা দেখিতে লাগিলাম। শাস্তিপুরের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গাতীবেব যেমন শোভা এমন আর কোথায় আছে। গাছপালা ছায়া কুটীব—নয়নেব আনন্দ অবিবল সাবি সারি দুইধারে ববাবব চলিয়াছে—কোথাও বিরাম নাই। কোথাও বা তটভূমি সবুজ ঘাসে আচ্ছন্ন হইয়া গঙ্গাব কোলে আসিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছে, কোথাও বা একেবাবে নদীব জল পর্য্যন্ত ঘন গাছপালা লতাজালে জড়িত হইয়া ঝুঁকিয়া আসিয়াছে—জলেব উপর তাহাদের ছায়া অবিশ্রাম দুলিতেছে, কতকগুলি সূর্য্যকিবণ সেই ছায়াব মাঝে মাঝে ঝিকমিক কবিতেছে, আর বাকি কতকগুলি, গাছপালার কম্পমান রুচি মসৃণ সবুজ পাতার উপরে চিক্‌চিক্ কবিয়া উঠিতেছে। একটা-বা নৌকা তাহাব কাছাকাছি গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা রহিয়াছে, সে সেই ছায়াব নিচে, অবিশ্রাম জলেব কুলকুল শব্দে, মৃদু মৃদু দোল খাইয়া বড়ো আরামের ঘুমাইতেছে। তাহার আর এক পাশে বড়ো বড়ো গাছের অতি

ঘনচ্ছায়ার মধ্য দিয়া ভাঙা ভাঙা বাঁকা একটা পদচিহ্নের পথ জল পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। সেই পথ দিয়া গ্রামের মেয়েরা কলসী কাঁখে করিয়া জল লইতে নামিতেছে, ছেলেরা কাদার উপরে পড়িয়া জল ছোঁড়াছুঁড়ি করিয়া সাঁতার কাটিয়া ভারি মাতামাতি করিতেছে। প্রাচীন ভাঙা ঘাটগুলির কী শোভা! মানুষেরা যে এ ঘাট বাঁধিয়াছে তাহা এক রকম ভুলিয়া যাইতে হয়, এও যেন গাছপালার মতো গঙ্গাতীরের নিজস্ব। ইহার বড়ো বড়ো ফাটলের মধ্য দিয়া অশথগাছ উঠিয়াছে, ধাপগুলির ইঁটের ফাঁক দিয়া ঘাস গজাইতেছে—বহু বৎসরের বর্ষার জলধারায় গায়ের উপরে শেয়ালা পড়িয়াছে—এবং তাহার রং চারিদিকের শ্যামল গাছপালার রঙের সহিত কেমন সহজে মিশিয়া গেছে। মানুষের কাজ ফুরাইলে প্রকৃতি নিজের হাতে সেটা সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, তুলি ধরিয়া এখানে ওখানে নিজের রং লাগাইয়া দিয়াছেন। অত্যন্ত কঠিন সগর্ব্ব ধবধবে পারিপাট্য নষ্ট করিয়া, ভাঙাচোরা বিশৃঙ্খল মাধুর্য্য স্থাপন করিয়াছেন। গ্রামের যে সকল ছেলে-মেয়েরা নাহিতে বা জল লইতে আসে তাহাদের সকলেরই সঙ্গে ইহার যেন একটা-কিছু সম্পর্ক পাতানো আছে—কেহ ইহার নাতনী, কেহ ইহার মা-মাসি। তাহাদের দাদামহাশয় ও দিদিমারা যখন এতটুকু ছিল তখন ইহারই ধাপে বসিয়া খেলা করিয়াছে, বর্ষার দিনে পিছল খাইয়া পড়িয়া গিয়াছে। আর সেই যে যাত্রাওয়ালা বিখ্যাত গায়ক অন্ধ শ্রীনিবাস সন্ধ্যাবেলায় ইহার পৈঠার উপর বসিয়া বেহালা বাজাইয়া গৌরী রাগিণীতে "গেল গেল দিন" গাহিত ও গাঁয়ের দুই চারিজন লোক আশে পাশে জমা হইত, তাহার কথা আজ আর কাহারও মনে নাই। গঙ্গা-তীরের ভগ্ন দেবালয়গুলিরও যেন বিশেষ কী মাহাত্ম্য আছে। তাহার মধ্যে আর দেবপ্রতিমা নাই। কিন্তু সে নিজেই জটাজূটবিলম্বিত অতি পুরাতন ঋষির মতো অতিশয় ভক্তিভাজন

ও পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে। এক এক জায়গায় লোকালয়—সেখানে জেলেদের নৌকা সারি সারি বাঁধা রহিয়াছে। কতকগুলি জলে, কতকগুলি ডাঙায় তোলা, কতকগুলি তীরে উপুড় করিয়া মেরামত করা হইতেছে, তাহাদের পাঁজরা দেখা যাইতেছে। কুঁড়ে ঘরগুলি কিছু ঘন ঘন কাছাকাছি—কোনো কোনোটা বাঁকাচোরা বেড়া দেওয়া —দুই চারিটি গরু চরিতেছে, গ্রামের দুই একটা শীর্ণ কুকুর নিষ্কর্মার মতো গঙ্গার ধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; একটা উলঙ্গ ছেলে মুখের মধ্যে আঙুল পুরিয়া বেগুনের ক্ষেতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া আমাদের জাহাজের দিকে চাহিয়া আছে। হাঁড়ি ভাসাইয়া লাঠি-বাঁধা ছোটো ছোটো জাল লইয়া জেলের ছেলেরা ধারে ধারে চিংড়িমাছ ধরিয়া বেড়াইতেছে। সম্মুখে তীরে বটগাছের জালবদ্ধ শিকড়ের নিচে হইতে নদীস্রোতে মাটি ক্ষয় করিয়া লইয়া গিয়াছে—ও সেই শিকড়গুলির মধ্যে একটি নিভৃত আশ্রয় নির্মিত হইয়াছে। একটি বুড়ি তাহার দুই চারিটি হাঁড়িকুঁড়ি ও একটি চট লইয়া তাহারই মধ্যে বাস করে। আবার আর এক দিকে চড়ার উপরে বহুদূর ধরিয়া কাশ বন—শরৎকালে যখন ফুল ফুটিয়া উঠে তখন বায়ুর প্রত্যেক হিল্লোলে হাসির সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিতে থাকে। যে কারণেই হউক্ গঙ্গার ধারের ইঁটের পাঁজাগুলিও আমার দেখিতে বেশ ভালো লাগে;—তাহাদের আশেপাশে গাছপালা থাকে না—চারিদিকে পোড়ো জায়গা এবড়ো খেবড়ো—ইতস্তত: কতকগুলা ইঁট খসিয়া পড়িয়াছে—অনেকগুলি ঝামা ছড়ানো—স্থানে স্থানে মাটি কাটা—এই অনুর্বরতা বন্ধুরতার মধ্যে পাঁজাগুলো কেমন হতভাগ্যের মতো দাঁড়াইয়া থাকে। গাছের শ্রেণীর মধ্য হইতে শিবের দ্বাদশ মন্দির দেখা যাইতেছে, সমুখে ঘাট, নহবৎখানা হইতে নহবৎ বাজিতেছে। তাহার ঠিক পাশেই খেয়াঘাট। কাঁচা ঘাট, ধাপে ধাপে তালগাছের গুঁড়ি দিয়া বাঁধানো। আরও দক্ষিণে কুমারদের বাড়ি, চাল হইতে কুমড়া ঝুলিতেছে। একটি প্রৌঢ়া

কুটীরের দেয়ালে গোবর দিতেছে—প্রাঙ্গণ পরিষ্কার, তক্‌তক্ করিতেছে—কেবল এক প্রান্তে মাচার উপরে লাউ লতাইয়া উঠিয়াছে, আর একদিকে তুলসীতলা। সূর্য্যাস্তের নিস্তরঙ্গ গঙ্গায় নৌকা ভাসাইয়া দিয়া গঙ্গার পশ্চিম পারের শোভা যে দেখে নাই সে বাংলার সৌন্দর্য্য দেখে নাই বলিলেও হয়। এই পবিত্র শান্তিপূর্ণ অনুপম সৌন্দর্য্যচ্ছবির বর্ণনা সম্ভবে না। এই স্বর্ণচ্ছায় ম্লান সন্ধ্যালোকে দীর্ঘ নারিকেলের গাছগুলি মন্দিরের চূড়া, আকাশের পটে আঁকা নিস্তব্ধ গাছের মাথাগুলি, স্থির জলের উপরে লাবণ্যের মতো সন্ধ্যার আভা—সুমধুর বিরাম, নির্ব্বাপিত কলরব, অগাধ শান্তি—সে সমস্ত মিলিয়া নন্দনের একখানি মরীচিকার মতো ছায়াপথের পরপারবর্ত্তী সুদূর শান্তিনিকেতনের একখানি ছবির মতো পশ্চিম দিগন্তের ধার-টুকুতে আঁকা দেখা যায়। ক্রমে সন্ধ্যার আলো মিলাইয়া যায়, বনের মধ্যে এদিকে ওদিকে এক-একটি করিয়া প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে, সহসা দক্ষিণের দিক হইতে একটা বাতাস উঠিতে থাকে—পাতা ঝর্‌ঝর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠে, অন্ধকারে বেগবতী নদী বহিয়া যায়, কূলের উপরে অবিশ্রাম তরঙ্গ আঘাতে ছল্‌ছল্ করিয়া শব্দ হইতে থাকে—আর কিছু ভালো দেখা যায় না, শোনা যায় না—কেবল ঝিঁঝি পোকার শব্দ উঠে—আর জোনাকিগুলি অন্ধকারে জ্বলিতে নিভিতে থাকে। আরো রাত্রি হয়। ক্রমে কৃষ্ণ পক্ষের সপ্তমী চাঁদ ঘোর অন্ধকার অশথগাছের মাথার উপর দিয়া ধীরে ধীরে আকাশে উঠিতে থাকে। নিম্নে বনের শ্রেণীবদ্ধ অন্ধকার, আর উপরে ম্লান চন্দ্রের আভা। খানিকটা আলো অন্ধকার-ঢালা গঙ্গার মাঝখানে একটা জায়গায় পড়িয়া তরঙ্গে তরঙ্গে ভাঙিয়া ভাঙিয়া যায়। ও-পারের অস্পষ্ট বনরেখার উপর আর-খানিকটা আলো পড়ে—সেইটুকু আলোতে ভালো করিয়া কিছুই দেখা যায় না; কেবল ও-পারের সুদূরতা ও অস্ফুটতাকে মধুর রহস্যময় করিয়া তোলে। এ-পারে নিদ্রার রাজ্য আর ও-পারে স্বপ্নের দেশ বলিয়া মনে হইতে থাকে।

এই যে-সব গঙ্গার ছবি আমার মনে উঠিতেছে, এ কি সমস্তই এইবারকার ষ্টীমার-যাত্রার ফল? তাহা নহে। এ-সব কত দিনকার কত ছবি, মনের মধ্যে আঁকা রহিয়াছে। ইহারা বড়ো সুখের ছবি, আজ ইহাদের চারিদিকে অশ্রুজলের স্ফটিক দিয়া বাঁধাইয়া রাখিয়াছি। এমনতরো শোভা আর এ জন্মে দেখিতে পাইব না।)

মেরামৎ শেষ হইয়া গেছে—যাত্রীদের স্নানাহার হইয়াছে, বিস্তর কোলাহল করিয়া নোঙর তোলা হইতেছে। জাহাজ ছাড়া হইল। বামে মুচিখোলার নবাবের প্রকাণ্ড খাঁচা। ডানদিকে শিবপুর বটানিকেল গার্ডেন। যত দক্ষিণে যাইতে লাগিলাম, গঙ্গা ততই চওড়া হইতে লাগিল। বেলা দুটো তিনটের সময়ে ফলমূল সেবন করিয়া সন্ধ্যা বেলায় কোথায় গিয়া থামা যাইবে তাহারি আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গেল। আমাদের দক্ষিণে বামে নিশান উড়াইয়া অনেক জাহাজ গেল আসিল—তাহাদের সগর্ব্ব গতি দেখিয়া আমাদের উৎসাহ আরও বাড়িয়া উঠিল। বাতাস যদিও উল্টা বহিতেছে, কিন্তু স্রোত আমাদের অনুকূল। আমাদের উৎসাহের সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের বেগও অনেক বাড়িয়াছে। জাহাজ বেশ দুলিতে লাগিল। দূর হইতে দেখিতেছি এক-একটা মস্ত ঢেউ ঘাড় তুলিয়া আসিতেছে, আমরা সকলে আনন্দের সঙ্গে তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছি—তাহারা জাহাজের পাশে নিষ্ফল রোষে ফেনাইয়া উঠিয়া গর্জ্জন করিয়া জাহাজের লোহার পাঁজরায় সবলে মাথা ঠুকিতেছে, হতাশ্বাস হইয়া দুই পা পিছাইয়া পুনশ্চ আসিয়া আঘাত করিতেছে, আমরা সকলে মিলিয়া তাহাই দেখিতেছি।) হঠাৎ দেখি কর্ত্তাবাবু মুখ বিবর্ণ করিয়া কর্ণধারের কাছে ছুটিয়া যাইতেছেন। হঠাৎ রব উঠিল এই এই—রাখ্ রাখ্, থাম্ থাম্। গঙ্গার তরঙ্গ অপেক্ষা প্রচণ্ডতর বেগে আমাদের সকলেরই হৃদয় তোলপাড় করিতে লাগিল। চাহিয়া

দেখি সম্মুখে আমাদের জাহাজের উপর সবেগে একটা লোহার বয়া ছুটিয়া আসিতেছে, অর্থাৎ আমরা বয়ার উপরে ছুটিয়া চলিতেছি। কিছুতেই সামলাইতে পারিতেছি না। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের মতো বয়াটার দিকে চাহিয়া আছি। সে জিনিষটা মহিষের মতো ঢুঁ উদ্যত করিয়া আসিতেছে। অবশেষে ঘা মারিল।

(৩)

কোথায় সেই অবিশ্রাম জলকল্লোল, শত লক্ষ তরঙ্গের অহোরাত্র উৎসব, কোথায় সেই অবিরল বনশ্রেণী, আকাশের সেই অবারিত নীলিমা, ধরণীর নবযৌবনে পরিপূর্ণ হৃদয়োচ্ছ্বাসের ন্যায় সেই অনন্তের দিকে চির-উচ্ছ্বসিত বিচিত্র তরুতরঙ্গ, কোথায় সেই প্রকৃতির শ্যামল স্নেহের মধ্যে প্রচ্ছন্ন শিশু লোকালয়গুলি—ঊর্দ্ধে সেই চিরস্থির আকাশের নিম্নে সেই চিরচঞ্চলা স্রোতস্বিনী।—চিরস্তব্ধের সহিত চিরকোলাহলময়ের, সর্ব্বত্রসমানের সহিত চিরবিচিত্রের, নির্ব্বিকারের সহিত চিরপরিবর্ত্তনশীলের অবিচ্ছেদ প্রেমের মিলন কোথায়। এখানে সুরকিতে ইঁটেতে, ধূলিতে নাসারন্ধ্রে, গাড়িতে ঘোড়াতে হঠ-যোগ চলিতেছে। এখানে চারিদিকে দেয়ালের সহিত দেয়ালের, দরজার সহিত হুড়কার, কড়ির সহিত বরগার চাপকানের সহিত বোতামের আঁটাআঁটি মিলন।

পাঠকেরা বোধ করি বুঝিতে পারিয়াছেন, এতদিন সরেজমিনে লেখা চলিতেছিল—সরে-জমিনে না হউক সরে-জলে বটে—এখন আমরা ডাঙার ধন ডাঙায় ফিরিয়া আসিয়াছি। এখন সেখানকার কথা এখানে পূর্ব্বেকার কথা পরে লিখিতে হইতেছে—সুতরাং এখন যাহা লিখিব তাহার ভুলচুকের জন্য দায়ী হইতে পারিব না।

এখন মধ্যাহ্ন। আমার সমুখে একটা ডেস্ক, পা-পোষে একটা কালো মোটা কুকুর ঘুমাইতেছে—বারান্দায় শিকলি-বাঁধা একটা বাঁদর লেজের উকুন বাছিতেছে, তিনটে কাক আলিসার উপরে বসিয়া অকারণ চেঁচাইতেছে এবং এক এক-বার খপ করিয়া বাঁদরের ভুক্তাবশিষ্ট ভাত এক-চঞ্চু লইয়া ছাতের উপরে উড়িয়া বসিতেছে। ঘরের কোণে একটা প্রাচীন হার্মোনিয়ম বাক্সের মধ্যে গোটাকতক ইঁদুর খট্‌ খট্‌ করিতেছে। কলিকাতা সহরের ইমারতের একটি শুষ্ক কঠিন কামরা, ইহারি মধ্যে আমি গঙ্গার আবাহন করিতেছি—তপঃক্ষীণ জহ্নুমুনির শুষ্ক পাকস্থলীর অপেক্ষা এখানে ঢের বেশি স্থান আছে। আর, স্থান-সঙ্কীর্ণতা বলিয়া কোনো পদার্থ প্রকৃতির মধ্যে নাই। সে আমাদের মনে। দেখো—বীজের মধ্যে অরণ্য, একটি জীবের মধ্যে তাহার অনন্ত বংশপরম্পরা। আমি যে ঐ ষ্টীফেন সাহেবের এক বোতল ব্লুব্লাক্ কালী কিনিয়া আনিয়াছি, উহারি প্রত্যেক ফোঁটার মধ্যে কত পাঠকের সুষুপ্তি মাদার-টিংচার আকারে বিরাজ করিতেছে। এই কালীর বোতল দৈবক্রমে যদি সুযোগ্য হাতে পড়িত তবে ওটাকে দেখিলে ভাবিতাম, সৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী অন্ধকারের মধ্যে এই বিচিত্র আলোকময় অমর জগৎ যেমন প্রচ্ছন্ন ছিল, তেম্‌নি ঐ এক বোতল অন্ধকারের মধ্যে কত আলোকময় নূতন সৃষ্টি প্রচ্ছন্ন আছে। একটা বোতল দেখিয়াই এত কথা মনে উঠে, যেখানে ষ্টীফেন সাহেবের কালীর কারখানা সেখানে দাঁড়াইয়া একবার ভাবিলে বোধ করি মাথা ঠিক রাখিতে পারি না। কত পুঁথি, কত চটি, কত যশ, কত কলঙ্ক, কত জ্ঞান, কত পাগলামী, কত ফাঁসির হুকুম, যুদ্ধের ঘোষণা, প্রেমের লিপি কালো কালো হইয়া স্রোত বাহিয়া বাহির হইতেছে। ঐ স্রোত যখন সমস্ত জগতের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে—তখন—দূর হউক কালী যে ক্রমেই গড়াইতে চলিল, ষ্টীফেন সাহেবের সমস্ত কারখানাটাই দৈবাৎ [illegible] উল্টাইয়া পড়িয়াছে,—এবারে ব্লটিং কাগজের কথা মনে

পড়িতেছে।—স্রোত ফিরানো যাব্। এসো এবার গঙ্গার স্রোতে এসো।

সত্য ঘটনায় ও উপন্যাসে প্রভেদ আছে, তাহার সাক্ষ্য দেখো, আমাদের জাহাজ ধরায় ঠেকিল তবু ডুবিল না।—পরম বীরত্ব সহকারে কাহাকেও উদ্ধার করিতে হইল না—প্রথম পরিচ্ছেদে জলে ডুবিয়া মরিয়া ষড়বিংশ পরিচ্ছেদে কেহ ডাঙায় বাঁচিয়া উঠিল না। না ডুবিয়া সুখী হইয়াছি সন্দেহ নাই, কিন্তু লিখিয়া সুখ হইতেছে না, পাঠকেরা নিশ্চয়ই অত্যন্ত নিরাশ হইবেন, কিন্তু আমি যে ডুবি নাই সে আমার দোষ নয়, নিতান্তই অদৃষ্টের কারখানা।

মরিলাম না বটে কিন্তু যমরাজের মহিষের কাছ হইতে একটা রীতিমতো ঢুঁ খাইয়া ফিরিলাম। সুতরাং সেই ঝাঁকানির কথাটা স্মরণ-ফলকে খোদিত হইয়া রহিল। খানিকক্ষণ অবাক্ ভাবে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করা গেল—সকলেরই মুখে একভাব, সকলেই বাক্যব্যয় করা নিতান্ত বাহুল্য জ্ঞান করিলেন। বৌঠাকরুণ বৃহৎ একটা চৌকির মধ্যে কেমন একরকম হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার দুইটি ক্ষুদ্র আনুষঙ্গিক আমার দুই পার্শ্ব জড়াইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দাদা কিয়ৎক্ষণ ঘন ঘন গোঁফে তা' দিয়া কিছুই সিদ্ধান্ত করিতে পারিলেন না। কর্ত্তা বাবু রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "সমস্তই মাঝির দোষ," মাঝি কহিল, তাহার অধীনে যে ব্যক্তি হাল ধরিয়াছিল তাহার দোষ। সে কহিল—হালের দোষ। হাল কিছু না বলিয়া অধোবদনে সটান জলে ডুবিয়া রহিল—গঙ্গা দ্বিধা হইয়া তাহার লজ্জা রক্ষা করিলেন।

এই খানেই নোঙর ফেলা হইল। যাত্রীদের উৎসাহ দেখিতে দেখিতে হ্রাস হইয়া গেল—সকাল বেলায় যেমনতরো মুখের ভাব, কল্পনার এঞ্জিন-গঞ্জন গতি ও আওয়াজের উৎকর্ষ দেখা গিয়াছিল, বিকালে ঠিক তেমনটি দেখা গেল না। আমাদের উৎসাহ নোঙরের সঙ্গে সঙ্গে সাত

হাত জলের নিচে নামিয়া পড়িল। একমাত্র আনন্দের বিষয় এই ছিল যে, আমাদিগকেও অতদূর নামিতে হয় নাই। কিন্তু সহসা তাহারই সম্ভাবনা সম্বন্ধে চৈতন্য জন্মিল। এ সম্বন্ধে আমরা যতই তলাইয়া ভাবিতে লাগিলাম, ততই আমাদের তলাইবার নিদারুণ সম্ভাবনা মনে মনে উদয় হইতে লাগিল। এই সময় দিনমণি অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন। বরিশালে যাইবার পথ অপেক্ষা বরিশালে না যাইবার পথ অত্যন্ত সহজ ও সংক্ষিপ্ত এ বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে দাদা জাহাজের ছাদের উপর পায়চারি করিতে লাগিলেন। একটা মোটা কাছির কুণ্ডলীর উপর বসিয়া এই ঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যে হাস্য-কৌতুকের আলো জ্বালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম—কিন্তু বর্ষাকালের দেশালাই কাঠির মতো সেগুলা ভালো করিয়া জ্বলিল না। অনেক ঘর্ষণে থাকিয়া থাকিয়া অমনি একটু একটু চমক মারিতে লাগিল। যখন সরোজিনী জাহাজ তাঁহার যাত্রীসমেত গঙ্গা-গর্ভের পঙ্কিল বিশ্রাম শয্যায় চতুর্ব্বর্গ লাভ করিয়াছেন, তখন খবরের কাগজের Sad accidentএর কোটায় একটি মাত্র প্যারাগ্রাফে চারিটি মাত্র লাইনের মধ্যে কেমন সংক্ষেপে নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিব সে বিষয়ে নানা কথা অনুমান করিতে লাগিলাম। এই সংবাদটি এক চামচ গরম চায়ের সহিত অতি ক্ষুদ্র একটি বটিকার মতো কেমন অবাধে পাঠকদের গলা দিয়া নামিয়া যাইবে, তাহা কল্পনা করা গেল। বন্ধুরা বর্ত্তমান লেখকের সম্বন্ধে বলিবেন—"আহা কত বড়ো মহদাশয় লোকটাই গেছেন গো,—এমন আর হইবে না।" এবং লেখকের পূজনীয়া ভ্রাতৃজায়া সম্বন্ধে বলিবেন—"আহা, দোষে গুণে জড়িত মানুষটা ছিল—যেমন তেমন হোক্ তবু তো ঘরটা জুড়ে ছিল।" ইত্যাদি ইত্যাদি। জাঁতার মধ্য হইতে যেমন বিমল শুভ্র ময়দা পিষিয়া বাহির হইতে থাকে, তেমনি বৌঠাকুরাণীর চাপা ঠোঁট জোড়ার মধ্য হইতে হাসিরাশি ভাঙিয়া বাহির হইতে লাগিল।

আকাশে তারা উঠিল—দক্ষিণে বাতাস বহিতে লাগিল। খালাসীদের নমাজ পড়া শেষ হইয়া গিয়াছে। একজন ক্যাপা খালাসী তাহার তারের যন্ত্র বাজাইয়া, এক মাথা কোঁকড়া ঝাঁকড়া চুল নাড়াইয়া, পরম উৎসাহে গান গাহিতেছে। ছাতের উপরে বিছানায় যে যেখানে পাইলাম শুইয়া পড়িলাম—মাঝে মাঝে এক-একটি অপরিস্ফুট হাই ও সুপরিস্ফুট নাসাধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। বাক্যালাপ বন্ধ। মনে হইল যেন একটা বৃহৎ দুঃস্বপ্ন পক্ষী আমাদের উপরে নিস্তব্ধভাবে চাপিয়া আমাদের কয়জনকে কয়টা ডিমের মতো তা' দিতেছে। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। আমার মনে হইতে লাগিল 'মধুরেণ সমাপয়েৎ।' যদি এমনই হয়—কোনো সুযোগে যদি একেবারে কুষ্ঠির শেষ কোঠায় আসিয়া পড়িয়া থাকি, যদি জাহাজ ঠিক বৈতরণীর পর পারের ঘাটে গিয়াই থামে—তবে বাজনা বাজাইয়া দাও—চিত্রগুপ্তের মজলিষে হাঁড়ি মুখ লইয়া যেন বেরসিকের মতো দেখিতে না হই। আর, যদি সে জায়গাটা অন্ধকারই হয় তবে এখান হইতে অন্ধকার সঙ্গে করিয়া রাণীগঞ্জে কয়লা বহিয়া লইয়া যাইবার বিড়ম্বনা কেন? তবে বাজাও! আমার ভ্রাতুষ্পুত্রটি সেতারে ঝঙ্কার দিল। ঝিনি ঝিনি ঝিন ঝিন ইমন কল্যাণ বাজিতে লাগিল।

তাহার পর দিন অনুসন্ধান করিয়া অবগত হওয়া গেল, জাহাজের এটা ওটা সেটা অনেক জিনিষেরই অভাব। সেগুলি না থাকিলেও জাহাজ চলে বটে কিন্তু যাত্রীদের আবশ্যক বুঝিয়া চলে না, নিজের খেয়ালেই চলে। কলিকাতা হইতে জাহাজের সরঞ্জাম আনিবার জন্য লোক পাঠাইতে হইল। এখন কিছু দিন এই খানেই স্থিতি।

গঙ্গার মাঝে মাঝে এক-এক বার না দাঁড়াইলে গঙ্গার মাধুরী তেমন উপভোগ করা যায় না। কারণ, নদীর একটি প্রধান সৌন্দর্য্য গতির সৌন্দর্য্য। চারিদিকে মধুর চঞ্চলতা, জোয়ার ভাঁটার আনাগোনা,

তরঙ্গের উত্থান পতন, জলের উপর ছায়ালোকের উৎসব—গঙ্গার মাঝখানে একবার স্থির হইয়া না দাঁড়াইলে এ সব ভালো করিয়া দেখা যায় না। আর জাহাজের হাঁস-ফাঁসানি, আগুনের তাপ, খালাসীদের গোলমাল, মায়াবদ্ধ দানবের মতো দীপ্তনেত্র এঞ্জিনের গোঁ-ভরে সনিশ্বাস খাটুনি, দুই পাশে অবিশ্রাম আবর্তিত দুই সহস্রবাহু চাকার সরোষ ফেন-উদ্গার—এ-সকল, গঙ্গার প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার বলিয়া বোধ হয়। তাহা ছাড়া গঙ্গার সৌন্দর্য্য উপেক্ষা করিয়া ছুটিয়া চলা কার্যাতৎপর অতিসভ্য উনবিংশ শতাব্দীকেই শোভা পায় কিন্তু রসজ্ঞের ইহা সহ্য হয় না। এ যেন আপিসে যাইবার সময় নাকে মুখে ভাত গোঁজা। অন্নের অপমান। যেন গঙ্গা-যাত্রার একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ গড়িয়া তোলা। এ যেন মহাভারতের সূচিপত্র গলাধঃকরণ করা।

আমাদের জাহাজ লৌহশৃঙ্খল গলায় বাঁধিয়া খাড়া দাঁড়াইয়া রহিল। স্রোতস্বিনী খর-প্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছে। কখনো তরঙ্গসঙ্কুল, কখনো শান্ত, কোথাও সঙ্কীর্ণ, কোথাও প্রশস্ত, কোথাও ভাঙন ধরিয়াছে, কোথাও চড়া পড়িয়াছে। এক-এক জায়গায় কূল কিনারা দেখা যায় না। আমাদের সম্মুখে পরপার মেঘের রেখার মতো দেখা যাইতেছে। চারিদিকে জেলেডিঙি ও পালতোলা নৌকা। বড়ো বড়ো জাহাজ প্রাচীন পৃথিবীর বৃহদাকার সরীসৃপ জলজন্তুর মতো ভাসিয়া চলিয়াছে। এখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। মেয়েরা গঙ্গার জলে গা ধুইতে আসিয়াছে, রোদ পড়িয়া আসিতেছে। বাঁশ বন, খেজুর বন, আম বাগান ও ঝোপঝাপের ভিতরে ভিতরে এক একটি গ্রাম দেখা যাইতেছে। ডাঙায় একটা বাছুর আড়ি করিয়া গ্রীবা ও লাঙ্গুল নানা ভঙ্গীতে আস্ফালন পূর্ব্বক একটি বড়ো ষ্টীমারের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছে। গুটিকতক মানব-সন্তান ডাঙায় দাঁড়াইয়া হাততালি দিতেছেন; যে চর্ম্মখানি পরিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার বেশি পোষাক পরা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। ক্রমে অন্ধকার

ছুইয়া আসিল। তীরের কুটিরে আলো জ্বলিল। সমস্ত দিনের জাগ্রত আলস্য সমাপ্ত করিয়া রাত্রের নিদ্রায় শরীর মন সমর্পণ করিলাম।

১২৯১

নানা কথা

মানুষের হৃদয় ছড়িয়ে আছে মিলিয়ে আছে, পৃথিবীর আলোয় ছায়ায়, তার গন্ধে তার গানে। অতীতকালের সংখ্যাতীত মানুষের প্রেমে পৃথিবী যেন ওড়না উড়িয়ে আছে, বায়ুমণ্ডলে যেমন তার বাষ্পের উত্তরীয়, এ তেমনি তার চিন্ময় আবরণ, এর মধ্য দিয়ে মানুষ রং পায় সুর পায় আপন চিরন্তন মনের। তাই যখন শুনি আমাদের প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষদের সময়েও "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মেঘমাশ্লিষ্ট সানু" দেখা যেত, তখন আপনাদের মধ্যে সেই পূর্ব্বপুরুষদের চিত্ত অনুভব করি, তাঁদের সেই মেঘদেখার সুখ আমাদের সুখের সঙ্গে যুক্ত হয়, বুঝতে পারি যাঁরা গেছেন তাঁরাও আছেন।

বিজনে অরণ্যের বৃক্ষ নিতান্ত শূন্য, কিন্তু যে বৃক্ষের দিকে একজন মানুষ চেয়েছে, সে বৃক্ষে সে মানুষের চাহনি ছাপ দিয়ে গেছে। বহুদিন থেকে যে গাছের তলায় রৌদ্রের বেলায় মানুষ বসে সে গাছে যেমন ছবিৎবর্ণ আছে তেমনি মনুষ্যত্বের অংশ আছে। আমাদের সেই পূর্ব্বপুরুষদের নেত্রের আভা আমাদের স্বদেশ-আকাশের তারকার

জ্যোতিতে প্রতিফলিত। স্বদেশের বিজনে আমাদের শতসহস্র সঙ্গীর বাস, স্বদেশে আমাদের শতসহস্র বৎসর পরমায়ু।

সচরাচর লোকে মাকড়সার জালের সঙ্গে আমাদের জীবনের তুলনা দিয়ে থাকে। বন্ধনই আমাদের বাসস্থান। বন্ধন না থাকলে আমরা নিরাশ্রয়। সে বন্ধন আমরা নিজের ভিতর থেকে রচনা করি। বন্ধন রচনা করা আমাদের এমনি স্বাভাবিক যে একবার জাল ছিঁড়লে দেখতে দেখতে আবার শত শত বন্ধন গাঁথতে বসি, ভুলি আবার জাল ছিঁড়বেই। নতুন জায়গায় যাই সেখানে নতুন বন্ধন জড়াতে থাকি। সেখানকার গাছে ভূমিতে আকাশে, সেখানকার চন্দ্র সূর্য্য তারায়, সেখানকার মানুষে, সেখানকার রাস্তায় ঘাটে, সেখানকার আচার ব্যবহারে, সেখানকার ইতিহাসে, আমাদের জালের শত শত সূত্র লগ্ন ক'রে দিই, মাঝখানে রাখি আপনাকে। এমনি আমরা মাকড়সার জাতি।

আমরা বন্ধ না হোলে মুক্ত হোতে পাই না। ইংরেজিতে যাকে freedom বলে তা আমাদের নেই, বাংলায় যাকে স্বাধীনতা বলে তা আমাদের আছে। কঠিনতর অধীনতাই স্বাধীনতা। সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং। কিন্তু পরের অধীন হওয়াই সহজ, আপনার অধীন হওয়াই শক্ত।

স্বাধীনতার অর্থ আপনার অর্থাৎ একের অধীনতা, অধীনতার অর্থ পরের অর্থাৎ সহস্রের অধীনতা। যার গৃহ নেই, তাকে কখনো গাছের তলে, কখনো মাঠে, কখনো খড়ের গাদায়, কখনো দয়াবানের কুটীরে আশ্রয় নিতে হয়, যার গৃহ আছে সে সংসারের অসংখ্যের মধ্যে ব্যাকুল নয়। যে নৌকো হালের অধীন নয় সে কিছুতেই স্বাধীন ব'লে গর্ব্ব করতে পারে না, কারণ সে শতসহস্র তরঙ্গের অধীন। যে দ্রব্য পৃথিবীর

ভারাকর্ষণের অধীনতাকে উপেক্ষা করে, তাকে প্রত্যেক সামান্য বায়ু-হিল্লোলের অধীনতায় দশদিকে ঘুরে মরতে হবে। অসীম জগৎসমুদ্রে অগণ্য তরঙ্গ, এখানে স্বাধীনতা ব্যতীত আমাদের গতি নাই। অতএব স্বাধীনতা অর্থে বন্ধনমুক্তি নয়, স্বাধীনতার অর্থ কখনো হাল কখনো নোঙরের শৃঙ্খলকে সম্মান করা।

সেদিন আমাকে একজন বন্ধু জিজ্ঞাসা করছিলেন, নূতন কবির আর প্রয়োজন কী? পুরাতন কবির কবিতা তো বিস্তর আছে। নূতন কথা এমনই কী বলা হচ্চে? পুরাতন নিয়েই তো কাজ চলে যায়।

নূতনই পুরাতনকে রক্ষা করে থাকে। পুরাতনের মধ্যেই নূতনের বাস। নূতন পুরাতনে বিচ্ছেদ হোলেই জীবনের অবসান। যেদিন দেখব পৃথিবীতে নূতন কবি আর উঠছে না, সেদিন জানব পুরাতন কবিদের সম্পূর্ণ মৃত্যু হয়েছে।

নূতন কবিতার ধারা শুষ্ক হোলে পুরাতনে পৌঁছবার স্রোত বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের মধ্যেকার এ দীর্ঘ ব্যবধান অবিশ্রাম লোপ ক'রে রাখছে কে? নূতন কবিতা।

প্রত্যেক বসন্ত পুরাতনকেই পায় নূতন গানে নূতন ফুলে। আমরা বলি নবীন বসন্ত কিন্তু প্রত্যেক বসন্তই পুরাতন বসন্ত।

ব্যাপ্ত হোলে যা অন্ধকার, সংহত হোলে তা আলোক, আরো সংহত হোলে তা অগ্নি। সংহতিই প্রাণ। সংহত হোলেই তেজ, প্রাণ, আকার, ব্যক্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে। আমরা জড়োপাসক শক্তি-উপাসক ব'লেই বৃহত্ত্বের উপাসনা করে থাকি, বৃহত্ত্বে অভিভূত হয়ে যাই। কিন্তু বৃহৎ অপেক্ষা ক্ষুদ্র অধিক আশ্চর্য্য। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বাষ্প-রাশি অপেক্ষা একবিন্দু জল আশ্চর্য্য। সুবিস্তৃত নীহারিকা অপেক্ষা

সংক্ষিপ্ত সৌরজগৎ আশ্চর্য্য। আরম্ভ বৃহৎ, পরিণাম ক্ষুদ্র। আবর্ত্তের মুখ অতি বৃহৎ, আবর্ত্তের শেষ বিন্দুমাত্র। সুবিশাল জগৎ ঘুরে ঘুরে এই ক্ষুদ্রত্বের দিকে বিন্দুত্বের দিকে চলে। কেন্দ্রের মহৎ আকর্ষণে পরিধি সংক্ষিপ্ত হয়ে কেন্দ্রত্বে আত্মবিসর্জ্জন করতে যায়।

যত বৃহৎ হই তত দেশকালের অধীন হোতে হয়। আয়তন নিয়ে আমাদের নিরন্তর যুদ্ধ। কার সঙ্গে? দানব কাল ও দানব দেশের সঙ্গে। দেশকাল বলে—আয়তন আমার, আমার জিনিষ আমাকে ফিরিয়ে দাও। অবিশ্রাম লড়াই ক'রে অবশেষে কেড়ে নেয়। শ্মশান-ক্ষেত্রে তার ডিক্রিজারি।

কিন্তু আমরা জানি আমরা মৃত্যুকে জিতব। অর্থাৎ দেশকালকে অতিক্রম করব। মনুষ্যের অভ্যন্তরে এক সেনাপতি আছে। সে যুদ্ধ করছে। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মরছে কিন্তু যুদ্ধের বিরাম নেই। আমরা সংহতিকে অধিকার ক'রে ব্যাপ্তিকে জিতব—মনুষ্যত্বের এই সাধনা।

সংহতিকে অধিকার করাই শক্ত। আমাদের হৃদয় মন বাষ্পের মতো চারদিকে ছড়িয়ে আছে। হু হু ক'রে ব্যাপ্ত হয়ে পড়া যেমন বাষ্পের স্বাভাবিক গুণ, আমরাও তেমনি স্বভাবতই চারদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ি। অভ্যন্তরে সুদৃঢ় আকর্ষণশক্তি না থাকলে আপন হয়ে আমরা পর হয়ে যাই। আপনাকে বিন্দুতে নিবিষ্ট করাই শক্ত। যোগীরা এই বিন্দুমাত্রে স্থায়ী হবার জন্য বৃহৎ সংসারের আশ্রয় ছেড়ে সূচ্যগ্রস্থানের জন্যই লড়াই করেন। তাঁরা বিন্দুর বলে ব্যাপককে অধিকার করবেন। সঙ্কীর্ণতার বলে পরিকীর্ণতা লাভ করবেন।

সংহত দীপশিখা তার আলোকে সমস্ত গৃহ অধিকার করে। কিন্তু সেই শিখা যখন প্রচ্ছন্ন উত্তাপ আকারে গৃহের কড়িতে বরগায় তার উপকরণে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে তখন গৃহই তাকে বদ্ধ ক'রে রাখে, সে

জাগতে পায় না। যতটা ব্যাপ্ত হব ততটা অধিকার করব, এর উল্টোটাই ঠিক। অর্থাৎ যতটা ব্যাপ্ত হবে তুমি ততই অধিকৃত হবে। কিন্তু চারদিক থেকে আপনাকে প্রত্যাহার ক'রে যখন বহ্নিশিখার মতো স্বতন্ত্র দীপ্তি পাবে তখন তোমার সেই তেজস্বী স্বাতন্ত্র্যের জ্যোতিতে চারিদিক উজ্জ্বলরূপে অধিকার করতে পারবে।

ভারতবর্ষীয় সাধনার চরম লক্ষ্য সংহতি অর্থাৎ অধ্যাত্মযোগ। প্রাণশক্তি, মানসশক্তি, অধ্যাত্মশক্তিকে সংহত করতে পারলে তবেই অন্তরকে বাহিরকে জয় করা যায়।

আমার কোনো বন্ধু লিখেছেন অতীতকাল অমরাবতী। অতীতে অমৃত আছে। অতীত সংক্ষিপ্ত। বর্ত্তমান কেবল অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুহূর্ত্ত, অতীতকালে সেই মুহূর্ত্তরাশি সংহত হয়ে যায়। বর্ত্তমান ত্রিশটা পৃথক দিন, অতীত একটা সমগ্র মাস। যাকে প্রত্যেক বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে দেখি আমরা প্রতিক্ষণে তার মৃত্যুই দেখতে পাই, যাকে অতীতে দেখি তার অমরতা দেখতে পাই।

যখন গড়তে আরম্ভ করি তখনই প্রতিমা চোখের সম্মুখে জেগে থাকে, যখন শেষ ক'রে ফেলি তখন দেখি তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। সুদূর লক্ষ্যাভিমুখে যখন যাত্রা আরম্ভ করি তখন লক্ষ্যের প্রতি এত টান যে লক্ষ্য যেন প্রত্যক্ষ, আর পথপ্রান্তে যখন যাত্রা শেষ করি তখন পথের প্রতি এত মায়া যে লক্ষ্য আর মনে পড়ে না। যাকে আশা করি তাকে যতখানি পাই আশা পূর্ণ হোলে তাকে আর ততখানি পাইনে। অর্থাৎ চাইলে যতখানি পাই পেলে ততখানি পাইনে।

আসল কথা শেষ মানুষের হাতে নেই। 'শেষ হোলো' ব'লে যে আমরা

দুঃখ করি তার অর্থ এই—শেষ হয়নি তবুও শেষ হোলো। আকাঙ্ক্ষা রয়েছে অথচ চেষ্টার অবসান হোলো। এইজন্য মানুষের কাছে শেষের অর্থ দুঃখ। কারণ মানুষের সমাপ্তির অর্থ অসম্পূর্ণতা।

১২৯২ (সংশোধিত)

ছোটোনাগপুর

রাত্রে হাবড়ার রেলগাড়িতে চড়িলাম। গাড়ির ঝাঁকানিতে নাড়া খাইয়া ঘুমটা যেন ঘোলাইয়া যায়। চেতনায় ঘুমে, স্বপ্নে জাগরণে, খিচুড়ি পাকাইয়া যায়। মাঝে মাঝে আলোর শ্রেণী ঘণ্টাধ্বনি, কোলাহল, বিচিত্র আওয়াজে ষ্টেশনের নাম হাঁকা, আবার ঠং ঠং ঠং তিনটে ঘণ্টার শব্দে মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত অন্তর্হিত, সমস্ত অন্ধকার, সমস্ত নিস্তব্ধ, কেবল স্তিমিততারা নিশীথিনীর মধ্যে গাড়ির চাকার অবিশ্রাম শব্দ। সেই শব্দের তালে তালে মাথার ভিতরে সৃষ্টিছাড়া স্বপ্নের দল সমস্ত রাত্রি ধরিয়া নৃত্য করিতে থাকে। রাত চারটের সময় মধুপুর ষ্টেশনে গাড়ি বদল করিতে হইল। অন্ধকার মিলাইয়া আসিলে পর প্রভাতের আলোকে গাড়ির জানলায় বসিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিলাম।

গাড়ি অবিশ্রাম অগ্রসর হইতে লাগিল। ভাঙা মাঠের এক-এক জায়গায় শুষ্ক নদীর বালুকা-রেখা দেখা যায়, সেই নদীর পথে বড়ো বড়ো কালো কালো পাথর পৃথিবীর কঙ্কালের মতো বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মাঝে মাঝে একেকটা মুণ্ডের মতো পাহাড় দেখা যাইতেছে।

দূরের পাহাড়গুলি ঘন নীল, যেন আকাশের নীল মেঘ খেলা করিতে আসিয়া পৃথিবীতে ধরা পড়িয়াছে, আকাশে উড়িবার জন্য যেন পাখা তুলিয়াছে কিন্তু বাঁধা আছে বলিয়া উড়িতে পারিতেছে না; আকাশ হইতে তাহার স্বজাতীয় মেঘেরা আসিয়া তাহার সঙ্গে কোলাকুলি করিয়া যাইতেছে। ঐ দেখো, পাথরের মতো কালো, ঝাঁকড়া চুলের ঝুঁটি বাঁধা মানুষ হাতে একগাছা লাঠি লইয়া দাঁড়াইয়া। দুটো মহিষের ঘাড়ে একটা লাঙল জোড়া, এখনো চাষ আরম্ভ হয়নি, তাহারা স্থির হইয়া রেলগাড়ির দিকে তাকাইয়া আছে। মাঝে মাঝে এক-একটা জায়গা ঘৃতকুমারীর বেড়া দিয়া ঘেরা, পরিষ্কার, তক্তক্ করিতেছে, মাঝখানে একটি বাঁধানো ইঁদারা। চারিদিক বড়ো শুষ্ক দেখাইতেছে। পাতলা লম্বা শুকনো শাদা ঘাসগুলো কেমন যেন পাকাচুলের মতো। বেঁটে বেঁটে পত্রহীন গুল্মগুলি শুকাইয়া বাঁকিয়া কালো হইয়া গেছে। দূরে দূরে এক-একটা তালগাছ ছোট্ট মাথা ও একখানি দীর্ঘ পা লইয়া দাঁড়াইয়া। মাঝে মাঝে একেকটা অশথ গাছ আমগাছও দেখা যায়। শুষ্কক্ষেত্রের মধ্যে একটিমাত্র পুরাতন কুটীরের চালশূন্য ভাঙা ভিত্তি নিজের ছায়ার দিকে তাকাইয়া আছে। কাছে একটা মস্ত গাছের দগ্ধ গুঁড়ির খানিকটা।

সকালে ছয়টার সময় গিরিধি স্টেশনে গিয়া পৌঁছিলাম। আর রেল-গাড়ি নাই। এখান হইতে ডাকগাড়িতে যাইতে হইবে। ডাকগাড়ি মানুষে টানিয়া লইয়া যায়। এ'কে কি আর গাড়ি বলে? চারটে চাকার উপর একটা ছোটো খাঁচা।

সর্ব্বপ্রথমে গিরিধি ডাকবাংলায় গিয়া স্নানাহার করিয়া লওয়া গেল। ডাকবাংলার যতদূরে চাই ঘাসের চিহ্ন নাই। মাঝে মাঝে গোটাকতক গাছ। চারিদিকে যেন রাঙামাটির ঢেউ। একটা রোগা টাট্টু ঘোড়া গাছের তলায় বাঁধা, চারিদিকে চাহিয়া কী যে

খাইবে তাহা ভাবিয়া পায় না। কোনো কাজ না থাকাতে গাছের গুঁড়িতে গা ঘষিয়া গা চুলকাইতেছে। আরেকটা গাছে একটা ছাগল লম্বা দড়িতে বাঁধা, সে বিস্তর গবেষণায় শাকের মতো একটু একটু সবুজ উদ্ভিদ-পদার্থ পট্ পট্ করিয়া ছিঁড়িতেছে। এখান হইতে যাত্রা করা গেল। পাহাড়ে রাস্তা। সম্মুখে পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলে অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। শুষ্ক শূন্য সুবিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে সাপের মতো আঁকিয়া বাঁকিয়া ছায়াহীন সুদীর্ঘ পথ রৌদ্রে শুইয়া আছে। একবার কষ্টেশ্রেষ্টে টানিয়া ঠেলিয়া গাড়ি চড়াও রাস্তার উপর তুলিতেছে, একবার গাড়ি গড়্ গড় করিয়া দ্রুতবেগে ঢালু রাস্তায় নামিয়া যাইতেছে। ক্রমে চলিতে চলিতে আশেপাশে পাহাড় দেখা দিতে লাগিল। লম্বা লম্বা সরু সরু শালগাছ। উইয়ের ঢিবি। কাটা গাছের গুঁড়ি। স্থানে স্থানে একেকটা পাহাড় আগাগোড়া কেবল দীর্ঘ সরু পত্রলেশশূন্য গাছে আচ্ছন্ন। উপবাসী গাছগুলো তাহাদের শুষ্ক শীর্ণ অস্থিময় দীর্ঘ আঙুল আকাশের দিকে তুলিয়া, এই পাহাড়গুলাকে দেখিলে মনে হয় যেন ইহারা সহস্র তীরে বিদ্ধ, যেন ভীষ্মের শরশয্যা। আকাশে মেঘ করিয়া আসিয়া অল্প অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। কুলিরা গাড়ি টানিতে টানিতে মাঝে মাঝে বিকট চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। মাঝে মাঝে পথের নুড়িতে হুঁচট্ খাইয়া গাড়িটা অত্যন্ত চমকিয়া উঠিতেছে। মাঝের এক জায়গায় পথ অবসান হইয়া বিস্তৃত বালুকাশয্যায় একটি ক্ষীণ নদীর রেখা দেখা দিল। নদীর নাম জিজ্ঞাসা করাতে কুলিরা কহিল "বড়াকর নদী।" টানাটানি করিয়া গাড়ি এই নদীর উপর দিয়া পার করিয়া আবার রাস্তায় তুলিল। রাস্তার দুই পাশে ডোবাতে জল দাঁড়াইয়াছে; তাহাতে চার পাঁচটা মহিষ পরস্পরের গায়ে মাথা রাখিয়া অর্দ্ধেক শরীর ডুবাইয়া আছে, পরম আলস্যভরে আমাদের দিকে এক একবার কটাক্ষপাত করিতেছে মাত্র।

যখন সন্ধ্যা আসিল, আমরা গাড়ি হইতে নামিয়া হাঁটিয়া চলিলাম। অদূরে দুইটি পাহাড় দেখা যাইতেছে তাহার মধ্য দিয়া উঠিয়া নামিয়া পথ গিয়াছে। যেখানেই চাহি, চারিদিকে লোক নাই, লোকালয় নাই, শস্য নাই, চষা মাঠ নাই, চারিদিকে উঁচুনিচু পৃথিবী নিস্তব্ধ নিঃশব্দ কঠিন সমুদ্রের মতো ধুধু করিতেছে। দিক্ দিগন্তরের উপরে গোধূলির চিক্‌চিকে সোনালি আঁধারের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। কোথাও জনমানব জীবজন্তু নাই বটে, তবু মনে হয় এই সুবিস্তীর্ণ ভূমিশয্যায় যেন কোন এক বিরাট পুরুষের জন্য নিদ্রার আয়োজন হইতেছে। কে যেন প্রহরীর ন্যায় মুখে আঙুল দিয়া দাঁড়াইয়া, তাই সকলে ভয়ে নিঃশ্বাস রোধ করিয়া আছে। দূর হইতে উপচ্ছায়ার মতো একটি পথিক ঘোড়ার পিঠে বোঝা দিয়া আমাদের পাশ দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

রাত্রিটা কোনোমতে জাগিয়া ঘুমাইয়া পাশ ফিরিয়া কাটিয়া গেল। জাগিয়া উঠিয়া দেখি বামে ঘনপত্রময় বন। গাছে গাছে লতা, ভূমি নানাবিধ গুল্মে আচ্ছন্ন। বনের মাথার উপর দিয়া দূর পাহাড়ের নীল-শিখর দেখা যাইতেছে। মস্ত মস্ত পাথর। পাথরের ফাটলে এক-একটা গাছ, তাহাদের ক্ষুধিত শিকড়গুলো দীর্ঘ হইয়া চারিদিক হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে, পাথরখানাকে বিদীর্ণ করিয়া তাহারা কঠিন মুঠি দিয়া খাদ্য আঁকড়িয়া ধরিতে চায়। সহসা বামে জঙ্গল কোথায় গেল। সুদূরবিস্তৃত মাঠ। দূরে গরু চরিতেছে, তাহাদিগকে ছাগলের মতো ছোটো ছোটো দেখাইতেছে। মহিষ কিম্বা গরুর কাঁধে লাঙল দিয়া পশুর লাঙ্গুল মলিয়া চাষারা চাষ করিতেছে। চষা মাঠ বামে পাহাড়ের উপর সোপানে সোপানে থাকে থাকে উঠিয়াছে।

বেলা তিনটার সময় হাজারিবাগের ডাকবাংলায় আসিয়া পৌঁছিলাম। প্রশস্ত প্রান্তরের মধ্যে হাজারিবাগ সহরটি অতি পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। সাহরিক ভাব বড়ো নাই। গলিঘুঁজি, আবর্জনা, নর্দামা,

ঘেঁসাঘেঁসি, গোলমাল, গাড়ি ঘোড়া, ধুলো কাদা, মাছি মশা, এ সকলের প্রাদুর্ভাব বড়ো নাই। মাঠ পাহাড় গাছপালার মধ্যে সহরটি তক্‌তক্ করিতেছে।

একদিন কাটিয়া গেল। এখন দুপুরবেলা। ডাকবাংলার বারান্দার সম্মুখে কেদারায় একলা চুপ করিয়া বসিয়া আছি। আকাশ সুনীল। দুই খণ্ড শীর্ণ মেঘ শাদা পাল তুলিয়া চলিয়াছে। অল্প অল্প বাতাস আসিতেছে। একরকম মেঠো মেঠো ঘেসো ঘেসো গন্ধ পাওয়া যাইতেছে। বারান্দার চালের উপর একটা কাঠবিড়ালি। দুইটা শালিখ বারান্দায় আসিয়া চকিতভাবে পুচ্ছ নাচাইয়া লাফাইতেছে। পাশের রাস্তা দিয়া গরু লইয়া যাইতেছে তাহাদের গলার ঘণ্টার ঠুং ঠুং শব্দ শুনিতেছি। লোকজনেরা কেউ ছাতা মাথায় দিয়া কেউ কাঁধে মোট লইয়া কেউ দুয়েকটা গরু তাড়াইযা, কেউ একটা ছোটো টাট্টুর উপর চড়িয়া রাস্তা দিয়া অতি ধীরেসুস্থে চলিতেছে, কোলাহল নাই, ব্যস্ততা নাই, মুখে ভাবনার চিহ্ন নাই। দেখিলে মনে হয় এখানকার মানব-জীবন দ্রুত এঞ্জিনের মতো হাঁসফাঁস করিয়া অথবা গুরুভারাক্রান্ত গরুর গাড়ির চাকার মতো আর্তনাদ করিতে করিতে চলিতেছে না। গাছের তলা দিয়া দিয়া একটুখানি শীতল নির্ঝর যেমন ছায়ায় ছায়ায় কুলকুল্ করিয়া যায়, জীবন তেম্‌নি করিয়া যাইতেছে। সম্মুখে ঐ আদালত। কিন্তু এখানকার আদালতও তেমন কঠোরমূর্তি নয়। ভিতরে যখন উকিলে উকিলে শামলায় শামলায় লড়াই বাধিয়াছে তখন বাহিরের অশথগাছ হইতে দুই পাপিয়ার অবিশ্রাম উত্তর প্রত্যুত্তর চলিতেছে। বিচারপ্রার্থী লোকেরা আমগাছের ছায়ায় বসিয়া জটলা করিয়া হাহা করিয়া হাসিতেছে, এখান হইতে শুনিতে পাইতেছি। মাঝে মাঝে আদালত হইতে মধ্যাহ্নের ঘণ্টা বাজিতেছে। চারিদিকে যখন জীবনের মৃদুমন্দ গতি, তখন এই ঘণ্টার শব্দ শুনিলে টের পাওয়া যায় যে

শৈথিল্যের স্রোতে সময় ভাসিয়া যায় নাই, সময় মাঝখানে দাঁড়াইয়া প্রতিঘণ্টায় লৌহকণ্ঠে বলিতেছে "আর কেহ জাগুক্ না জাগুক্ আমি জাগিয়া আছি।" কিন্তু লেখকের অবস্থা ঠিক সেরূপ নয়। আমার চোখে তন্দ্রা আসিতেছে।

১২৯২

রুদ্ধ গৃহ

বৃহৎ বাড়ির মধ্যে কেবল একটি ঘর বন্ধ। তাহার তালাতে মরিচা ধরিয়াছে—তাহার চাবি কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সন্ধ্যাবেলা সে ঘরে আলো জ্বলে না, দিনের বেলা সে ঘরে লোক থাকে না—এমন কতদিন হইতে কে জানে।

সে ঘর খুলিতে ভয় হয়, অন্ধকারে তাহার সম্মুখ দিয়া চলিতে গা ছম্‌ছম্ করে। যেখানে মানুষ হাসিয়া মানুষের সঙ্গে কথা কয় না, সেইখানেই আমাদের যত ভয়। যেখানে মানুষে মানুষে দেখাশুনো হয়, সেই পবিত্রস্থানে ভয় আর আসিতে পারে না।

দুইখানি দরজা ঝাঁপিয়া ঘর মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছে। দরজার উপর কান দিয়া থাকিলে ঘরের ভিতর হইতে যেন হু হু শব্দ শুনা যায়।

এ ঘর বিধবা। একজন কে ছিল সে গেছে, সেই হইতে এ গৃহের দ্বার রুদ্ধ। সেই অবধি এখানে আর কেহ আসেও না, এখান হইতে আর কেহ যায়ও না। সেই অবধি এখানে যেন মৃত্যুরও মৃত্যু হইয়াছে।

এ জগতে অবিশ্রাম জীবনের প্রবাহ মৃত্যুকে হু হু করিয়া ভাসাইয়া লইয়া যায়, মৃত কোথাও টিঁকিয়া থাকিতে পারে না। এই ভয়ে সমাধি-

ভবন কৃপণের মতো মৃতকে চোরের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য পাষাণ-প্রাচীরের মধ্যে লুকাইয়া রাখে, ভয় তাহার উপরে দিবারাত্রি পাহারা দিতে থাকে। মৃত্যুকেই লোকে চোর বলিয়া নিন্দা করে, কিন্তু জীবনও যে চকিতের মধ্যে মৃত্যুকে চুরি করিয়া আপনার বহুবিস্তৃত পরিবারের মধ্যে বাঁটিয়া দেয়, সে কথার কেহ উল্লেখ করে না।

পৃথিবী মৃত্যুকেও কোলে করিয়া লয় জীবনকেও কোলে করিয়া রাখে—পৃথিবীর কোলে উভয়েই ভাই বোনের মতো খেলা করে। এই জীবনমৃত্যুর প্রবাহ দেখিলে, তরঙ্গভঙ্গের উপর ছায়া-আলোর খেলা দেখিলে আমাদের কোনো ভয় থাকে না, কিন্তু বদ্ধ মৃত্যু রুদ্ধ ছায়া দেখিলেই আমাদের ভয় হয়। মৃত্যুর গতি যেখানে আছে, জীবনের হাত ধরিয়া মৃত্যু যেখানে একতালে নৃত্য করে, সেখানে মৃত্যুরও জীবন আছে, সেখানে মৃত্যু ভয়ানক নহে, কিন্তু চিহ্নের মধ্যে আবদ্ধ গতিহীন মৃত্যুই প্রকৃত মৃত্যু, তাহাই ভয়ানক। এই জন্য সমাধিভূমি ভয়ের আবাসস্থল।

পৃথিবীতে যাহা আসে তাহাই যায়। এই প্রবাহেই জগতের স্বাস্থ্যরক্ষা হয়। কণামাত্রের যাতায়াত বন্ধ হইলে জগতের সামঞ্জস্য ভঙ্গ হয়। জীবন যেমন আসে, জীবন তেম্নি যায়, মৃত্যুও যেমন আসে মৃত্যুও তেম্নি যায়। তাহাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করো কেন? হৃদয়টাকে পাষাণ করিয়া সেই পাষাণের মধ্যে তাহাকে সমাহিত করিয়া রাখো কেন? তাহা কেবল অস্বাস্থ্যের কারণ হইয়া উঠে। ছাড়িয়া দাও তাহাকে যাইতে দাও—জীবনমৃত্যুর প্রবাহ রোধ করিয়ো না। হৃদয়ের দুই দ্বারই সমান খুলিয়া রাখো। প্রবেশের দ্বার দিয়া সকলে প্রবেশ করুক, প্রস্থানের দ্বার দিয়া সকলে প্রস্থান করিবে।

গৃহ দুই দ্বারই রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যেদিন দ্বার প্রথম রুদ্ধ হইল সেইদিনকার পুরাতন অন্ধকার আজও গৃহের মধ্যে একলা জাগিয়া

আছে। গৃহের বাহিরে দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি আসিতেছে, গৃহের মধ্যে কেবল সেই একটি দিনই বসিয়া আছে। সময় সেখানে চারিটি ভিত্তির মধ্যেই রুদ্ধ। পুরাতন কোথাও থাকে না, এই ঘরের মধ্যে আছে।

এই গৃহের অন্তরে বাহিরে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হইয়াছে। বাহিরের বার্তা অন্তরে পৌঁছয় না, অন্তরের নিঃশ্বাস বাহিরে আসিতে পায় না। জগতের প্রবাহ এই ঘরের দুই পাশ দিয়া বহিয়া যায়। এই গৃহ যেন বিশ্বের সহিত নাড়ির বন্ধন ছেদন করিয়াছে।

দ্বার রুদ্ধ করিয়া গৃহ পথের দিকে চাহিয়া আছে। যখন পূর্ণিমার চাঁদের আলো তাহার দ্বারের কাছে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকে, তখন তাহার দ্বার খুলিব-খুলিব করে কী না কে বলিতে পারে! পাশের ঘরে যখন উৎসবের আনন্দধ্বনি উঠে তখন কি তাহার অন্ধকার ছুটিয়া যাইতে চায় না? এ ঘর কী ভাবে চাহে, কী ভাবে শোনে আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না।

ছেলেরা যে-একদিন এই ঘরের মধ্যে খেলা করিত, সেই কোলাহলময় দিন এই গৃহের নিশীথিনীর মধ্যে পড়িয়া আজ কাঁদিতেছে। এই গৃহের মধ্যে যে-সকল স্নেহ-প্রেমের লীলা হইয়া গিয়াছে, সেই স্নেহ-প্রেমের উপর সহসা কপাট পড়িয়া গেছে,—এই নিস্তব্ধ গৃহের বাহিরে দাঁড়াইয়া আমি তাহাদের ক্রন্দন শুনিতেছি। স্নেহ প্রেম বদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য হয় নাই। মানুষের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া তাহাকে গোর দিয়া রাখিবার জন্য হয় নাই। তাহাকে জোর করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে সংসারক্ষেত্রের জন্য সে কাঁদে।

তবে এ গৃহ রুদ্ধ রাখিয়ো না—দ্বার খুলিয়া দাও। সূর্যের আলো দেখিয়া মানুষের সাড়া পাইয়া চকিত হইয়া ভয় প্রস্থান করিবে। সুখ এবং দুঃখ, শোক এবং উৎসব, জন্ম এবং মৃত্যু পবিত্র সমীরণের মতো
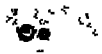
ইহার বাতায়নের মধ্যে দিয়া চিরদিন যাতায়াত করিতে থাকিবে। সমস্ত জগতের সহিত ইহার যোগ হইয়া যাইবে।

১২৯২

পথপ্রান্তে

আমি পথের ধারে বসিয়া লিখি, তাই কী লিখি ভাবিয়া পাই না।

ছায়াময় পথ। প্রান্তে আমার ক্ষুদ্র গৃহ। তাহার বাতায়ন উন্মুক্ত। ভোরের বেলায় সূর্যের প্রথম কিরণ অশোকশাখার কম্পমান ছায়ার সঙ্গে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়, আমাকে দেখে, আমার কোলের উপর পড়িয়া খেলা করে, আমার লেখার উপর আসিয়া পড়ে, এবং যখন চলিয়া যায় তখন লেখার উপরে খানিকটা সোনালি রঙ রাখিয়া দিয়া যায়, আমার লেখার উপরে তাহার কনক চুম্বনের চিহ্ন থাকিয়া যায়। আমার লেখার চারিধারে প্রভাত ফুটিয়া উঠে। মাঠের ফুল, মেঘের রং, ভোরের বাতাস এবং একটুখানি ঘুমের ঘোর আমার পাতার মধ্যে মিশাইয়া থাকে, অরুণের প্রেম আমার অক্ষরগুলির চারিদিকে লতাইয়া উঠে।

আমার সমুখ দিয়া কত লোক আসে কত লোক যায়। প্রভাতের আলো তাহাদের আশীর্বাদ করিতেছে, স্নেহভবে বলিতেছে তোমাদের যাত্রা শুভ হউক, পাখীরা কল্যাণগান করিতেছে, পথের আশেপাশে ফুট'-ফুট' ফুলেরা আশার মতো ফুটিয়া উঠিতেছে। যাত্রা আরম্ভের সময়ে সকলে বলিতেছে ভয় নাই, ভয় নাই। প্রভাতে সমস্ত বিশ্বজগৎ শুভযাত্রার গান গাহিতেছে। অনন্ত নীলিমার উপর দিয়া সূর্যের

জ্যোতির্ম্ময় রথ ছুটিয়াছে। নিখিল চরাচর যেন এইমাত্র বিশ্বেশ্বরের জয়ধ্বনি করিয়া বাহির হইল। সহাস্য প্রভাত আকাশে বাহুবিস্তার করিয়া আছে, অনন্তের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া জগৎকে পথ দেখাইয়া দিতেছে। প্রভাত, জগতের আশা, আশ্বাস, প্রতিদিবসের নান্দী। প্রতিদিন সে পূর্ব্বের কনকদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া জগতে স্বর্গ হইতে মঙ্গলবার্ত্তা আনিয়া দেয়, সমস্ত দিনের মতো অমৃত আহরণ করিয়া আনে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে নন্দনের পারিজাতের গন্ধ আসিয়া পৃথিবীর ফুলের গন্ধ জাগাইয়া তোলে। প্রভাত জগতের যাত্রা-আরম্ভের আশীর্ব্বাদ—সে আশীর্ব্বাদ মিথ্যা নহে।

আমার লেখার উপরে ছায়া ফেলিয়া পৃথিবীর লোক পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। তাহারা সঙ্গে কিছুই লইয়া যায় না। তাহারা সুখ দুঃখ ভুলিতে ভুলিতে চলিয়া যায়। জীবন হইতে প্রতি নিমেষের ভার ফেলিতে ফেলিতে চলিয়া যায়। তাহাদের হাসিকান্না আমার লেখার উপরে পড়িয়া অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। তাহাদের গান তাহারা ভুলিয়া যায়, তাহাদের প্রেম তাহারা রাখিয়া যায়।

আর কিছুই থাকে না কিন্তু প্রেম তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। তাহারা সমস্ত পথ কেবল ভালোবাসিতে বাসিতে চলে। পথের যেখানেই তাহারা পা ফেলে সেইখানটুকুই তাহারা ভালোবাসে। সেইখানেই তাহারা চিহ্ন রাখিয়া যাইতে চায়—তাহাদের বিদায়ের অশ্রুজলে সে জায়গাটুকু উর্ব্বরা হইয়া উঠে। তাহাদের পথের দুই পার্শ্বে নূতন নূতন ফুল নূতন নূতন তারা ফুটিয়া থাকে। নূতন নূতন পথিক-দিগকে তাহারা ভালো বাসিতে বাসিতে অগ্রসর হয়। প্রেমের টানে তাহারা চলিয়া যায়, প্রেমের প্রভাবে তাহাদের প্রতিপদক্ষেপের শ্রান্তি দূর হইয়া যায়। জননীর স্নেহের ন্যায় জগতের শোভা সমস্ত পথ তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে, হৃদয়ের অন্ধকার অন্তঃপুর হইতে

তাহাদিগকে বাহিরে ডাকিয়া আনে, পশ্চাৎ হইতে সম্মুখের দিকে তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া লইয়া যায়।

প্রেম যদি কেহ বাঁধিয়া রাখিতে পারিত তবে পথিকদের যাত্রা বন্ধ হইত। প্রেমের যদি কোথাও সমাধি হইত, তবে পথিক সেই সমাধির উপরে জড় পাষাণের মতো চিহ্নের স্বরূপ পড়িয়া থাকিত। নৌকার গুণ যেমন নৌকাকে বাঁধিয়া লইয়া যায়, যথার্থ প্রেম তেমনি কাহাকেও বাঁধিয়া রাখিয়া দেয় না, কিন্তু বাঁধিয়া লইয়া যায়। প্রেমের বন্ধনের টানে আর সমস্ত বন্ধন ছিঁড়িয়া যায়। বৃহৎ প্রেমের প্রভাবে ক্ষুদ্র প্রেমের সূত্রসকল টুটিয়া যায়। জগৎ তাই চলিতেছে নহিলে আপনার ভারে আপনি অচল হইয়া পড়িত।

পথিকেরা যখন চলে আমি বাতায়ন হইতে তাহাদের হাসি দেখি, কান্না শুনি। যে প্রেম কাঁদায় সেই প্রেমই আবার চোখের জল মুছাইয়া দেয়, হাসির আলো ফুটাইয়া তোলে। হাসিতে, অশ্রুতে, আলোতে বৃষ্টিতে আমাদের চারিদিকে সৌন্দর্য্যের উপবন প্রফুল্ল করিয়া রাখে। প্রেম কাহাকেও চিরদিন কাঁদিতে দেয় না। যে প্রেম একের বিরহে তোমাকে কাঁদায় সেই প্রেমই আর পাঁচকে তোমার কাছে আনিয়া দেয়— প্রেম বলে, "একবার ভালো করিয়া চাহিয়া দেখো, যে গেছে ইহারা তাহার অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নহে।" কিন্তু তুমি অশ্রুজলে অন্ধ, তুমি আর কাহাকেও দেখিতে পাও না তাই ভালোবাসিতে পারো না। তুমি তখন মরিতে চাও, সংসারের কাজ করিতে পারো না। তুমি পিছন ফিরিয়া বসিয়া থাকো, জগতে যাত্রা করিতে চাও না। কিন্তু অবশেষে প্রেমের জয় হয়, প্রেম তোমাকে টানিয়া লইয়া যায়, তুমি মৃত্যুর উপরে মুঁজিয়া চিরদিন পড়িয়া থাকিতে পারো না।

প্রভাতে যাহারা প্রফুল্ল হৃদয়ে যাত্রা করিয়া বাহির হয় তাহাদিগকে অনেক দূরে যাইতে হইবে। অনেক—অনেক দূর। পথের উপরে যদি

তাহাদের ভালোবাসা না থাকিত তবে তাহারা এ দীর্ঘপথ চলিতে পারিত না। পথ ভালোবাসে বলিয়াই প্রতিপদক্ষেপেই তাহাদের তৃপ্তি। এই, পথ ভালোবাসে বলিয়াই তাহারা চলে, আবার এই, পথ ভালোবাসে বলিয়াই তাহারা চলিতে চাহে না। তাহারা পা উঠাইতে চাহে না। প্রতিপদে তাহাদের ভ্রম হয়, "যেমন পাইয়াছি এমন আর পাইব না"— কিন্তু অগ্রসর হইয়াই আবার সমস্ত ভুলিয়া যায়। প্রতিপদে তাহারা শোক মুছিয়া মুছিয়া চলে। তাহারা আগেভাগে আশঙ্কা করিয়া বসে বলিয়াই কাঁদে, নহিলে কাঁদিবার কোনো কারণ নাই।

ঐ দেখো, কচি ছেলেটিকে বুকে করিয়া মা সংসারের পথে চলিয়াছে। ঐ ছেলেটির উপরে মাকে কে বাঁধিয়াছে। ঐ ছেলেটিকে দিয়া মাকে কে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। প্রেমের প্রভাবে পথের কাঁটা মায়ের পায়ের তলে কেমন ফুল হইয়া উঠিতেছে। ছেলেটিকে মায়ের কোলে দিয়া পথকে গৃহের মতো মধুর করিয়াছে কে?—কিন্তু হায়, মা ভুল বোঝে কেন? মা কেন মনে করে এই ছেলেটির মধ্যেই তাহার অনন্তের অবসান? অনন্তের পথে যেখানে পৃথিবীর সকল ছেলে মিলিয়া খেলা করে, একটি ছেলে মায়ের হাত ধরিয়া মাকে সেই ছেলের রাজ্যে লইয়া যায়—সেখানে শতকোটি সন্তান। সেখানে বিশ্বের কচি মুখগুলি ফুটিয়া একেবারে নন্দনবন করিয়া রাখিয়াছে। আকাশের চাঁদকে কাড়াকাড়ি করিয়া লইবার জন্য আগ্রহ। সেখানে স্খলিত মধুর ভাষার কল্লোল। আবার ওদিকে শোনো—সুকুমার অসহায়েরা কী কান্নাই কাঁদিতেছে। শিশুদেহে রোগ প্রবেশ করিয়া ফুলের পাপড়ির মতো কোমল তনুগুলি জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। কোমল কণ্ঠ হইতে স্বর বাহির হইতেছে না, ক্ষীণস্বরে কাঁদিতে চেষ্টা করিতেছে, কান্না কণ্ঠের মধ্যেই মিলাইয়া যাইতেছে। আর ঐ শিশুদের প্রতি বর্বর বয়স্কদের কত অত্যাচার!

একটিছেলে আসিয়া মাকে পৃথিবীর সকল ছেলের মা করিয়া

দেয়। যার ছেলে নাই, তাব কাছে অনন্ত স্বর্গের একটা দ্বার রুদ্ধ, ছেলেটি আসিয়া স্বর্গের সেই দ্বারটি খুলিয়া দেয়, তারপর তুমি চলিয়া যাও, সে-ও চলিয়া যাক্। তাব কাজ ফুরাইল, তার অন্য কাজ আছে।

প্রেম আমাদিগকে ভিতর হইতে বাহিরে লইয়া যায়, আপন হইতে অন্যেব দিকে লইয়া যায়, এক হইতে আরেকের দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়। এই জন্যই তাহাকে পথের আলো বলি—সে যদি আলেয়ার আলো হইত তবে সে পথ ভুলাইয়া ঘাড় ভাঙিয়া তোমাকে যা-হোক্ একটা-কিছুর মধ্যে ফেলিয়া দিত, আর সমস্ত রুদ্ধ কবিয়া দিত, সেই একটা-কিছুব মধ্যে পড়িয়াই তোমার অনন্তযাত্রার অবসান হইত—অন্য পথিকেবা তোমাকে মৃত বলিয়া চলিয়া যাইত। কিন্তু এখন সেটি হইবাব জো নাই। একটিকে ভালোবাসিলেই আরেকটিকে ভালোবাসিতে শিখিবে—অর্থাৎ একেকে অতিক্রম কবিবাব উদ্দেশেই একের দিকে ধাবমান হইতে হইবে।

পথ দেখাইবাব জন্যই সকলে আসিয়াছে, পথের বাধা হইবাব জন্য কেহ আসে নাই। এইজন্য কেহই ভিড় কবিয়া তোমাকে ঘিরিয়া থাকে না, সকলেই সরিয়া গিয়া তোমাকে পথ কবিয়া দেয়, সকলেই একে একে চলিয়া যায়। কেহই আপনাকে বা আর-কাহাকেও বদ্ধ করিয়া রাখিতে পাবে না। ইচ্ছা করিয়া যে ব্যক্তি নিজের চারিদিকে দেযাল গাঁথিয়া তোলে, কালের প্রবাহ ক্রমাগত আঘাত কবিয়া তাহাব সে দেয়াল এক-দিন-ভাঙিয়া দেয়, তাহাকে পথের মধ্যে বাহির কবিয়া দেয়। তখন সে আবরণেব অভাবে হি হি করিয়া কাঁপিতে থাকে, হায় হায় করিয়া কাঁদিয়া মরে। জগৎকে দ্বিধা হইতে বলে। ধূলিব মধ্যে আচ্ছন্ন হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে।

আমরা তো পথিক হইয়াই জন্মিয়াছি, অনন্ত শক্তিমান্ যদি এই অনন্ত পথের উপর দিয়া আমাদিগকে কেবলমাত্র বলপূর্ব্বক লইয়া

যাইতেন, প্রচণ্ড অদৃষ্ট যদি আমাদের চুলের মুঠি ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া লইয়া যাইত তবে আমরা দুর্ব্বলেরা কী করিতে পারিতাম। কিন্তু যাত্রার আরম্ভে শাসনের বজ্রধ্বনি শুনিতেছি না, প্রভাতের আশ্বাসবাণী শুনিতেছি। পথের মধ্যে কষ্ট আছে, দুঃখ আছে বটে, কিন্তু তবু আমরা ভালোবাসিয়া চলিতেছি। সকল সময়ে আমরা গ্রাহ্য করি না বটে, কিন্তু ভালোবাসা সহস্র দিক হইতে তাহার বাহু বাড়াইয়া আছে। সেই অবিশ্রাম ভালোবাসার আহ্বানই আমরা যেন শিরোধার্য্য করিয়া চলিতে শিখি—মোহে জড়াইয়া না পড়ি—অবশেষে অমোঘ শাসন আসিয়া আমাদিগকে যেন শৃঙ্খলে বাঁধিয়া না লইয়া যায়।

আমি এই সহস্র লোকের বিলাপ ও আনন্দধ্বনির ধারে বসিয়া আছি। আমি দেখিতেছি, ভাবিতেছি, ভালো বাসিতেছি। আমি পথিকদিগকে বলিতেছি, তোমাদের যাত্রা শুভ হউক। আমি আমার প্রেম তোমাদিগকে পাথেয় স্বরূপে দিতেছি। কারণ, পথ চলিতে আর কিছুর আবশ্যক নাই, কেবল প্রেমের আবশ্যক। সকলে যেন সকলকে সেই প্রেম দেয়। পথিক যেন পথিককে পথ চলিতে সাহায্য করে।

১২৯২

লাইব্রেরি

মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া-পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার

অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া দগ্ধ করিয়া একেবারে বাহির হইয়া আসে। হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা বাঁধা আছে, তেম্নি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানব-হৃদয়ের বন্যা কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

বিদ্যুৎকে মানুষ লোহার তার দিয়া বাঁধিয়াছে, কিন্তু কে জানিত মানুষ শব্দকে নিঃশব্দের মধ্যে বাঁধিতে পারিবে। কে জানিত সঙ্গীতকে, হৃদয়ের আশাকে, জাগ্রত আত্মার আনন্দ-ধ্বনিকে, আকাশের দৈববাণীকে সে কাগজে মুড়িয়া রাখিবে। কে জানিত মানুষ অতীতকে বর্ত্তমানে বন্দী করিবে! অতলস্পর্শ কাল-সমুদ্রের উপর কেবল এক-একখানি বই দিয়া সাঁকো বাঁধিয়া দিবে।

লাইব্রেরির মধ্যে আমরা সহস্র পথের চৌমাথার উপরে দাঁড়াইয়া আছি। কোনো পথ অনন্ত সমুদ্রে গিয়াছে, কোনো পথ অনন্ত শিখরে উঠিয়াছে, কোনো পথ মানব-হৃদয়ের অতলস্পর্শে নামিয়াছে। যে যে-দিকে ধাবমান হও, কোথাও বাধা পাইবে না। মানুষ আপনার পরিত্রাণকে এতটুকু জায়গার মধ্যে বাঁধাইয়া রাখিয়াছে।

শঙ্খের মধ্যে যেমন সমুদ্রের শব্দ শুনা যায়, তেম্নি এই লাইব্রেরির মধ্যে কি হৃদয়ের উত্থান পতনের শব্দ শুনিতেছ? এখানে জীবিত ও মৃত ব্যক্তির হৃদয় পাশাপাশি একপাড়ায় বাস করিতেছে। বাদ ও প্রতিবাদ এখানে দুই ভাইয়ের মতো এক সঙ্গে থাকে। সংশয় ও বিশ্বাস, সন্ধান ও আবিষ্কার এখানে দেহে দেহে লগ্ন হইয়া বাস করে। এখানে দীর্ঘ-প্রাণ স্বল্প-প্রাণ পরম ধৈর্য্য ও শান্তির সহিত জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, কেহ কাহাকেও উপেক্ষা করিতেছে না।

কত নদী সমুদ্র পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া মানবের কণ্ঠ এখানে আসিয়া

পৌঁছিয়াছে—কত শত বৎসরের প্রান্ত হইতে এই স্বর আসিতেছে। এসো এখানে এসো, এখানে আলোকের জন্মসঙ্গীত গান হইতেছে।

অমৃত লোক প্রথম আবিষ্কার করিয়া যে যে মহাপুরুষ যে-কোনোদিন আপনার চারিদিকে মানুষকে ডাক দিয়া বলিয়াছিলেন—তোমরা সকলে অমৃতের পুত্র, তোমরা দিব্যধামে বাস করিতেছ—সেই মহাপুরুষদের কণ্ঠই সহস্র ভাষায় সহস্র বৎসরের মধ্য দিয়া এই লাইব্রেরির মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

এই বঙ্গের প্রান্ত হইতে আমাদের কি কিছু বলিবার নাই? মানব-সমাজকে আমাদের কি কোনো সংবাদ দিবার নাই? জগতের একতান সঙ্গীতের মধ্যে বঙ্গদেশই কেবল নিস্তব্ধ হইয়া থাকিবে।

আমাদের পদপ্রান্তস্থিত সমুদ্র কি আমাদিগকে কিছু বলিতেছে না? আমাদের গঙ্গা কি হিমালয়ের শিখর হইতে কৈলাসের কোনো গান বহন করিয়া আনিতেছে না? আমাদের মাথার উপরে কি তবে অনন্ত নীলাকাশ নাই? সেখান হইতে অনন্তকালের চিরজ্যোতির্ময়ী নক্ষত্রলিপি কি কেহ মুছিয়া ফেলিয়াছে?

দেশ বিদেশ হইতে অতীত বর্তমান হইতে প্রতিদিন আমাদের কাছে মানবজাতির পত্র আসিতেছে, আমরা কি তাহার উত্তরে দুটি চারটি চটি চটি ইংরেজি খবরের কাগজ লিখিব। সকল দেশ অসীমকালের পটে নিজ নিজ নাম খুদিতেছে বাঙালির নাম কি কেবল দরখাস্তের দ্বিতীয় পাতেই লেখা থাকিবে। জড় অদৃষ্টের সহিত মানবাত্মার সংগ্রাম চলিতেছে, সৈনিকদিগকে আহ্বান করিয়া পৃথিবীর দিকে দিকে শৃঙ্গধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছে, আমরা কি কেবল আমাদের উঠানের মাচার উপরকার লাউকুমড়া লইয়া মকদ্দমা এবং আপীল চালাইতে থাকিব!

বহুবৎসর নীরব থাকিয়া বঙ্গদেশের প্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহাকে আপনার ভাষায় একবার আপনার কথাটি বলিতে দাও। বাঙালি কণ্ঠের সহিত মিলিয়া বিশ্বসঙ্গীত মধুরতর হইয়া উঠিবে।

১২৯২

অসম্ভব কথা

এক যে ছিল রাজা।

তখন ইহার বেশি কিছু জানিবার আবশ্যক ছিল না। কোথাকার রাজা, রাজার নাম কী, এ সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া গল্পের প্রবাহ রোধ করিতাম না। রাজার নাম শিলাদিত্য কি শালিবাহন, কাশী কাঞ্চি কনোজ কোশল অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের মধ্যে ঠিক কোন্‌খানটিতে তাঁহার রাজত্ব, এ সকল ইতিহাস-ভূগোলের তর্ক আমাদের কাছে নিতান্তই তুচ্ছ ছিল,—আসল যে কথাটি শুনিলে অন্তর পুলকিত হইয়া উঠিত এবং সমস্ত হৃদয় এক মুহূর্তের মধ্যে বিদ্যুদ্বেগে চুম্বকের মতো আকৃষ্ট হইত, সেটি হইতেছে—এক যে ছিল রাজা।

এখনকার পাঠক যেন একেবারে কোমর বাঁধিয়া বসে। গোড়াতেই ধরিয়া লয় লেখক মিথ্যা কথা বলিতেছে। সেইজন্য অত্যন্ত সেয়ানার মতো মুখ করিয়া জিজ্ঞাসা করে—"লেখক মহাশয়, তুমি যে বলিতেছ এক যে ছিল রাজা, আচ্ছা বলো দেখি, কে ছিল সেই রাজা।"

লেখকেরাও সেয়ানা হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা প্রকাণ্ড প্রত্নতত্ত্ব-

পণ্ডিতের মতো মুখমণ্ডল চতুর্গুণ মণ্ডলাকার করিয়া বলে, "এক যে ছিল রাজা, তাহার নাম ছিল অজাতশত্রু।"

পাঠক চোখ টিপিয়া জিজ্ঞাসা করে, "অজাতশত্রু? ভালো, কোন্ অজাতশত্রু বলো দেখি?"

লেখক অবিচলিত মুখভাব ধারণ করিয়া বলিয়া যায়, "অজাতশত্রু ছিল তিন জন। একজন খৃষ্টজন্মের তিন সহস্র বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়া দুই বৎসর আটমাস বয়ঃক্রম কালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার জীবনের বিস্তারিত বিবরণ কোনো গ্রন্থেই পাওয়া যায় না।" অবশেষে দ্বিতীয় অজাতশত্রু সম্বন্ধে দশজন ঐতিহাসিকের দশ বিভিন্ন মত সমালোচনা শেষ করিয়া যখন গ্রন্থের নায়ক তৃতীয় অজাত-শত্রু পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছায় তখন পাঠক বলিয়া উঠে, "ওরে বাস্‌রে, কী পাণ্ডিত্য! এক গল্প শুনিতে আসিয়া কত শিক্ষাই হইল! এ লোকটাকে আর অবিশ্বাস করা যাইতে পারে না! আচ্ছা লেখক মহাশয়, তার পরে কী হইল।"

হায়রে হায়, মানুষ ঠকিতেই চায়, ঠকিতেই ভালোবাসে, অথচ পাছে কেহ নির্বোধ মনে করে এ ভয়টুকুও ষোলো আনা আছে, এইজন্য প্রাণপণে সেয়ানা হইবার চেষ্টা করে। তাহার ফল হয় এই যে, সেই শেষকালটা ঠকে কিন্তু বিস্তর আড়ম্বর করিয়া ঠকে।

ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে, "প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়ো না, তাহা হইলে মিথ্যা জবাব শুনিতে হইবে না।" বালক সেটি বোঝে, সে কোনো প্রশ্ন করে না। এইজন্য রূপকথার সুন্দর মিথ্যাটুকু শিশুর মতো উলঙ্গ, সত্যের মতো সরল, সদ্য-উৎসারিত উৎসের মতো স্বচ্ছ—আর এখনকার দিনের সুচতুর মুখস্‌পরা মিথ্যা। কোথাও যদি তিলমাত্র ছিদ্র থাকে অমনি ভিতর হইতে সমস্ত ফাঁকি ধরা পড়ে, পাঠক বিমুখ হয়, লেখক পালাইবার পথ পায় না।

শিশুকালে আমরা যথার্থ বসজ্ঞ ছিলাম, এইজন্য যখন গল্প শুনিতে বসিয়াছি তখন জ্ঞানলাভ করিবার জন্য আমাদের তিলমাত্র আগ্রহ উপস্থিত হইত না, এবং অশিক্ষিত সরল হৃদয়টি ঠিক বুঝিত আসল কথাটি কোন্‌টুকু। আর এখনকার দিনে এত বাহুল্য কথাও বকিতে হয়, এত অনাবশ্যক কথারও আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু অবশেষে সেই আসল কথাটিতে গিয়া দাঁড়ায়—এক যে ছিল রাজা।

বেশ মনে আছে সেদিন সন্ধ্যাবেলা ঝড়বৃষ্টি হইতেছিল। কলিকাতা সহর একেবারে ভাসিয়া গিয়াছিল। গলির মধ্যে একহাঁটু জল। মনে একান্ত আশা ছিল, আজ আর মাষ্টার আসিবে না। কিন্তু তবু তাঁহার আসার নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত ভীতচিত্তে পথের দিকে চাহিয়া বারান্দায় চৌকি লইয়া বসিয়া আছি। যদি বৃষ্টি একটু ধরিয়া আসিবার উপক্রম হয়, তবে একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করি, হে দেবতা আর একটুখানি। কোনোমতে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পার করিয়া দাও। তখন মনে হইত, পৃথিবীতে বৃষ্টির আর কোনো আবশ্যক নাই কেবল একটিমাত্র সন্ধ্যায় নগরপ্রান্তের একটিমাত্র ব্যাকুল বালককে মাষ্টারের করাল হস্ত হইতে রক্ষা করা ছাড়া। পুরাকালে কোনো একটি নির্ব্বাসিত যক্ষও তো মনে করিয়াছিল, (আষাঢ়ে মেঘের বড়ো একটা কোনো কাজ নাই, অতএব রামগিরিশিখরের একটিমাত্র বিরহীর দুঃখকথা বিশ্বপার হইয়া অলকার সৌধ-বাতায়নে কোনো একটি বিরহিণীর কাছে লইয়া যাওয়া তাহার পক্ষে কিছুমাত্র গুরুতর নহে, বিশেষতঃ পথটি যখন এমন সুরম্য এবং তাহার হৃদয়বেদনা এমন দুঃসহ।)

বালকের প্রার্থনামতে না হোক, ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতের বিশেষ কোনো নিয়মানুসারে বৃষ্টি ছাড়িল না। কিন্তু হায় মাষ্টারও ছাড়িল না। গলির মোড়ে ঠিক সময়ে একটি পরিচিত ছাতা দেখা দিল—সমস্ত আশা-বাষ্প এক মুহূর্ত্তে ফাটিয়া বাহির হইয়া আমার বুকটি যেমন পাঁজরের মধ্যে

মিলাইয়া গেল। পরপীড়ন পাপের যদি যথোপযুক্ত শাস্তি থাকে তবে নিশ্চয় পরজন্মে আমি মাষ্টার হইয়া এবং আমার মাষ্টার মহাশয় ছাত্র হইয়া জন্মিবেন। তাহার বিরুদ্ধে একটি আপত্তি এই যে, আমাকে মাষ্টার মহাশয়ের মাষ্টার হইতে গেলে অতিশয় অকালে ইহসংসার হইতে বিদায় লইতে হয়—অতএব আমি তাঁহাকে অন্তরের সহিত মার্জনা করিলাম।

ছাতাটি দেখিবামাত্র ছুটিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। মা তখন দিদিমার সহিত মুখোমুখী বসিয়া প্রদীপালোকে বিস্তি খেলিতেছিলেন। ঝুপ করিয়া একপাশে শুইয়া পড়িলাম। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী হইয়াছে?" আমি মুখ হাঁড়ির মতো করিয়া কহিলাম, "আমার অসুখ করিয়াছে, আজ আর আমি মাষ্টারের কাছে পড়িতে যাইব না।"

আশা করি, অপ্রাপ্তবয়স্ক কেহ আমার এ লেখা পড়িবে না, এবং স্কুলের কোনো সিলেক্‌শন বহিতে আমার এ লেখা উদ্ধৃত হইবে না। কারণ, আমি যে কাজ করিয়াছিলাম তাহা নীতিবিরুদ্ধ এবং সেজন্য কোনো শাস্তিও পাই নাই। বরঞ্চ আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল।

মা চাকরকে বলিয়া দিলেন—"আজ তবে থাক্, মাষ্টারকে যেতে ব'লে দে।"

কিন্তু তিনি যেরূপ নিরুদ্বিগ্নচিত্তে বিস্তি খেলিতে লাগিলেন, তাহাতে বেশ বুঝা গেল যে, মা তাঁহার পুত্রের অসুখের উৎকট লক্ষণগুলি মিলাইয়া দেখিয়া মনে মনে হাসিলেন, আমিও মনের সুখে বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া খুব হাসিলাম—আমাদের উভয়ের মন উভয়ের কাছে অগোচর রহিল না।

কিন্তু সকলেই জানেন, এ প্রকারের অসুখ অধিকক্ষণ স্থায়ী করিয়া রাখা রোগীর পক্ষে বড়োই দুষ্কর। মিনিটখানেক না যাইতে যাইতে দিদিমাকে ধরিয়া পড়িলাম—দিদিমা একটা গল্প বলো। দুই চারিবার

কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। মা বলিলেন ; "রোস্ বাছা, খেলাটা আগে শেষ করি।"

আমি কহিলাম, "না মা, খেলা তুমি কাল শেষ কোরো, আজ দিদি-মাকে গল্প বল্‌তে বলো না।"

মা কাগজ ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, "যাও খুড়ি! উহার সঙ্গে এখন কে পারিবে।" মনে মনে হয়তো ভাবিলেন—আমার তো কাল মাষ্টার আসিবে না, আমি কালও খেলিতে পারিব।

আমি দিদিমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া একেবারে মশারির মধ্যে বিছানার উপরে গিয়া উঠিলাম। প্রথমে খানিকটা পাশ-বালিশ জড়াইয়া পা ছুঁড়িয়া নড়িয়াচড়িয়া মনের আনন্দ সম্বরণ করিতে গেল—তার পরে বলিলাম—গল্প বলো।

তখনো ঝুপ্‌ঝুপ্ করিয়া বাহিরে বৃষ্টি পড়িতেছিল—দিদিমা মৃদুস্বরে আরম্ভ করিলেন—এক যে ছিল রাজা।

তাহার এক রাণী। আঃ, বাঁচা গেল। সুয়ো এবং দুয়ো রাণী শুনিলেই বুকটা কাঁপিয়া উঠে—বুঝিতে পারি দুয়ো হতভাগিনীর বিপদের আর বড়ো বিলম্ব নাই। পূর্ব্ব হইতে মনে বিষম একটা উৎকণ্ঠা চাপিয়া থাকে।

যখন শোনা গেল আর কোনো চিন্তার বিষয় নাই, কেবল রাজার পুত্র-সন্তান হয় নাই বলিয়া রাজা ব্যাকুল হইয়া আছে এবং দেবতার নিকট প্রার্থনা করিয়া কঠিন তপস্যা করিবার জন্য বনগমনে উদ্যত হইয়াছে, তখন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। পুত্রসন্তান না হইলে যে, দুঃখের কোন কারণ আছে তাহা আমি বুঝিতাম না ; আমি জানিতাম যদি কিছুর জন্যে বনে যাইবার কখনো আবশ্যক হয় সে কেবল মাষ্টারের কাছ হইতে পালাইবার অভিপ্রায়ে।

রাণী এবং একটি বালিকা-কন্যা ঘরে ফেলিয়া রাজা তপস্যা করিতে

চলিয়া গেল। এক বৎসর দুই বৎসর করিয়া ক্রমে বারো বৎসর হইয়া যায়, তবু রাজার আর দেখা নাই।

এদিকে রাজকন্যা ষোড়শী হইয়া উঠিয়াছে। বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু রাজা ফিরিল না।

মেয়ের মুখের দিকে চায়, আর রাণীর মুখে অন্নজল রুচে না। আহা, আমার এমন সোনার মেয়ে কি চিরকাল আইবড়ো থাকিবে? ওগো আমি কী কপাল করিয়াছিলাম।

অবশেষে রাণী রাজাকে অনেক অনুনয় করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, আমি আর কিছু চাহি না, তুমি একদিন কেবল আমার ঘরে আসিয়া খাইয়া যাও।

রাজা বলিলেন, আচ্ছা।

রাণী তো সেদিন বহুযত্নে চৌষট্টি ব্যঞ্জন স্বহস্তে রাঁধিলেন এবং সমস্ত সোনার থালে ও রূপার বাটিতে সাজাইয়া চন্দন কাঠের পিঁড়ি পাতিয়া দিলেন। রাজকন্যা চামর হাতে করিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজা আজ বারো বৎসর পরে অন্তঃপুরে ফিরিয়া আসিয়া খাইতে বসিলেন। রাজকন্যা রূপে আলো করিয়া দাঁড়াইয়া চামর করিতে লাগিলেন।

মেয়ের মুখের দিকে চায় আর খাওয়া হয় না। শেষে রাণীর দিকে চাহিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁ গো রাণী, এমন সোনার প্রতিমা লক্ষ্মী-ঠাকুরুণটির মতো এ মেয়েটি কে গা? এ কাহাদের মেয়ে?

রাণী কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, হা আমার পোড়া কপাল। উহাকে চিনিতে পারিলে না? ও যে তোমারি মেয়ে।

রাজা বড়ো আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—আমার সেই সেদিনকার এতটুকু মেয়ে আজ এত বড়োটি হইয়াছে?

রাণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—তা আর হইবে না? বলো কি, আজ বারো বৎসর হইয়া গেল।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—মেয়ের বিবাহ দাও নাই?

রাণী কহিলেন—তুমি ঘরে নাই উহার বিবাহ কে দেয়? আমি কি নিজে পাত্র খুঁজিতে বাহির হইব?

রাজা শুনিয়া হঠাৎ ভারি শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলিলেন—বোসো, আমি কাল সকালে উঠিয়া রাজদ্বারে যাহার মুখ দেখিব তাহারই সহিত উহার বিবাহ দিয়া দিব।

রাজকন্যা চামর করিতে লাগিলেন। তাঁহার হাতের বালাতে চুড়িতে ঠুংঠাং শব্দ হইতে লাগিল। রাজার আহার হইয়া গেল।

পরদিন ঘুম হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিয়া রাজা দেখিলেন একটি ব্রাহ্মণের ছেলে রাজবাড়ির বাহিরে জঙ্গল হইতে শুক্‌না কাঠ সংগ্রহ করিতেছে। তাহার বয়স বছর সাত আট হইবে।

রাজা বলিলেন, ইহারই সহিত আমার মেয়ের বিবাহ দিব। রাজার হুকুম কে লঙ্ঘন করিতে পারে। তখনি ছেলেটিকে ধরিয়া তাহারি সহিত রাজকন্যার মালা বদল করিয়া দেওয়া হইল।

আমি এই জায়গাটাতে দিদিমার খুব কাছে ঘেঁষিয়া গিয়া নিরতিশয় ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম তার পরে? নিজেকে সেই সাত আট বৎসরের সৌভাগ্যবান্ কাঠকুড়ানে ব্রাহ্মণের ছেলের স্থলাভিষিক্ত করিতে কি একটুখানি ইচ্ছা যায় নাই? যখন সেই রাত্রে ঝুপ্‌ঝুপ্ বৃষ্টি পড়িতেছিল, মিটমিট্ করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছিল এবং গুন্‌গুন্ স্বরে দিদিমা মশারির মধ্যে গল্প বলিতেছিলেন, তখন কি বালকহৃদয়ের বিশ্বাসপরায়ণ রহস্যময় অনাবিষ্কৃত এক ক্ষুদ্র প্রান্তে এমন একটি সম্ভবপর ছবি জাগিয়া উঠে নাই যে, সে-ও একদিন সকাল বেলায় কোথায় এক রাজার দেশে রাজার দরজায় কাঠ কুড়াইতেছে, হঠাৎ একটি সোনার

প্রতিমা লক্ষ্মীঠাকরুণটির মতো রাজকন্যার সহিত তাহার মালা বদল হইয়া গেল ; মাথায় তাহার সিঁথি, কানে তাহার দুল, গলায় তাহার কণ্ঠী, হাতে তাহার কাঁকন, কটিতে তাহার চন্দ্রহার এবং আল্‌তাপরা দুটি পায় নূপুর ঝুম্‌ঝুম্‌ করিয়া বাজিতেছে !

কিন্তু আমার সেই দিদিমা যদি লেখকজন্ম ধারণ করিয়া আজ-কালকার সেয়ানা পাঠকদের কাছে এই গল্প বলিতেন তবে ইতিমধ্যে তাঁহাকে কত হিসাব দিতে হইত ? প্রথমতঃ রাজা যে বারো বৎসর বনে বসিয়া থাকে এবং ততদিন রাজকন্যার বিবাহ হয় না, একবাক্যে সকলেই বলিত ইহা অসম্ভব। সেটুকুও যদি কোনো গতিকে গোলেমালে পার হইয়া যাইত কিন্তু কন্যার বিবাহের জায়গায় বিষম একটা কলরব উঠিত। এক তো, এমন কখনো হয় না, দ্বিতীয়তঃ সকলেই আশঙ্কা করিত ব্রাহ্মণের ছেলের সহিত ক্ষত্রিয়-কন্যার বিবাহ ঘটাইয়া লেখক নিশ্চয়ই ফাঁকি দিয়া সমাজবিরুদ্ধ মত প্রচার করিতেছেন। কিন্তু পাঠকরা তেমন ছেলেই নয়, তাহারা তাঁহার নাতি নয় যে, সকল কথা চুপ করিয়া শুনিয়া যাইবে। তাহারা কাগজে সমালোচনা করিবে। অতএব একান্তমনে প্রার্থনা করি, দিদিমা যেন পুনর্ব্বার দিদিমা হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন, হতভাগ্য নাতিটার মতো তাঁহাকে গ্রহদোষে যেন লেখক হইতে না হয়।

আমি একেবারে পুলকিত কম্পান্বিত হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, তার পরে ?

দিদিমা বলিতে লাগিলেন—তার পরে রাজকন্যা মনের দুঃখে তাহার সেই ছোটো স্বামীটিকে লইয়া চলিয়া গেল।

অনেক দূরদেশে গিয়া একটি বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণের ছেলেটিকে আপনার সেই অতি ক্ষুদ্র স্বামীটিকে, বড়ো যত্নে মানুষ করিতে লাগিল।

—আমি একটুখানি নড়িয়া-চড়িয়া পাশবালিশ আর একটু সবলে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলাম, তার পরে ?

দিদিমা কহিলেন, তার পরে ছেলেটি পুঁথি-হাতে প্রতিদিন পাঠশালে যায়।

এমনি করিয়া গুরুমহাশয়ের কাছে নানা বিদ্যা শিখিয়া ছেলেটি ক্রমে যত বড়ো হইয়া উঠিতে লাগিল ততই তাহার সহপাঠীরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ঐ যে সাতমহল বাড়িতে তোমাকে লইয়া থাকে সেই মেয়েটি তোমার কে হয় ?

ব্রাহ্মণের ছেলে তো ভাবিয়া অস্থির—কিছুতেই ঠিক করিয়া বলিতে পারে না মেয়েটি তাহার কে হয়। একটু একটু মনে পড়ে একদিন সকালে রাজবাড়ির দ্বারের সম্মুখে শুক্‌না কাঠ কুড়াইতে গিয়াছিল—কিন্তু সেদিন কী একটা মস্ত গোলেমালে কাঠকুড়ানো হইল না। সে অনেক দিনের কথা, সে কি কিছু মনে আছে ? এমন করিয়া চারি-পাঁচ বৎসর যায়। ছেলেটিকে রোজই তাহার সঙ্গীরা জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা ঐ যে সাতমহলা বাড়িতে পরমারূপসী মেয়েটি থাকে ও তোমার কে হয় ?

ব্রাহ্মণ একদিন পাঠশালা হইতে মুখ বড়ো বিমর্ষ করিয়া আসিয়া রাজকন্যাকে কহিল, আমাকে আমার পাঠশালার পোড়োরা প্রতিদিন জিজ্ঞাসা করে—ঐ সাতমহলা বাড়িতে যে পরমা সুন্দরী মেয়েটি থাকে সে তোমার কে হয় ? আমি তাহার কোনো উত্তর দিতে পারি না। তুমি আমার কে হও বলো।

রাজকন্যা বলিল, আজিকার দিন থাক্ সে কথা আর এক দিন বলিব।

ব্রাহ্মণের ছেলে প্রতিদিন পাঠশালা হইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, তুমি আমার কে হও ?

রাজকন্যা প্রতিদিন উত্তর করে, সে কথা আজ থাক্ আর এক দিন বলিব। এম্‌নি করিয়া আরো চার পাঁচ বৎসর কাটিয়া যায়। শেষে ব্রাহ্মণ একদিন বড়ো রাগ করিয়া বলিল—আজ যদি তুমি না বলো তুমি আমার কে হও তবে আমি তোমার এই সাতমহলা বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।

তখন রাজকন্যা কহিলেন—আচ্ছা কাল নিশ্চয়ই বলিব।

পরদিন ব্রাহ্মণ-তনয় পাঠশালা হইতে ঘরে আসিয়াই রাজকন্যাকে বলিল—আজ বলিবে বলিয়াছিলে, তবে বলো ?

রাজকন্যা বলিলেন, আজ রাত্রে আহার করিয়া যখন তুমি শয়ন করিবে তখন বলিব।

ব্রাহ্মণ বলিল—আচ্ছা। বলিয়া সূর্য্যাস্তের অপেক্ষায় প্রহর গণিতে লাগিল। এদিকে রাজকন্যা সোনার পালঙ্কে একটি ধবধবে ফুলের বিছানা পাতিলেন,—ঘরে সোনার প্রদীপে সুগন্ধ তেল দিয়া বাতি জ্বালাইলেন, এবং চুলটি বাঁধিয়া নীলাম্বরী কাপড়টি পরিয়া সাজিয়া বসিয়া প্রহর গণিতে লাগিলেন, কখন রাত্রি আসে।

রাত্রে তাঁহার স্বামী কোনো মতে আহার শেষ করিয়া শয়নগৃহে সোনার পালঙ্কে ফুলের বিছানায় গিয়া শয়ন করিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, আজ শুনিতে পাইব এই সাতমহলা বাড়িতে যে সুন্দরীটি থাকে সে আমার কে হয়।

রাজকন্যা তাঁহার স্বামীর পাত্রে প্রসাদ খাইয়া ধীরে ধীরে শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। আজ বহুদিন পরে প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে এই সাতমহলা অট্টালিকার একমাত্র অধীশ্বরী আমি তোমার কে হই।

বলিতে গিয়া বিছানায় প্রবেশ করিয়া—কী দেখিলেন! ফুলের মধ্যে সাপ ছিল, তাঁহার স্বামীকে কখন দংশন করিয়াছে। স্বামীর মৃত দেহখানি মলিন হইয়া সোনার পালঙ্কে পুষ্পশয্যায় পড়িয়া আছে।

—আমার যেন বক্ষঃস্পন্দন হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। আমি রুদ্ধস্বরে বিবর্ণমুখে জিজ্ঞাসা করিলাম—তার পরে কী হইল।

দিদিমা বলিতে লাগিলেন—তার পরে—কিন্তু সে কথায় আর কাজ কী? সে যে আরো অসম্ভব। গল্পের প্রধান নায়ক সর্পাঘাতে মারা গেল, তবুও তার পরে? বালক তখন জানিত না, মৃত্যুর পরেও একটা তার পরে থাকিতে পারে বটে, কিন্তু সে তার-পরের উত্তর কোনো দিদিমার দিদিমাও দিতে পারে না। বিশ্বাসের বলে সাবিত্রী মৃত্যুরও অনুগমন করিয়াছিলেন। শিশুরও প্রবল বিশ্বাস, এই জন্য সে মৃত্যুর অঞ্চল ধরিয়া ফিরাইতে চায়, কিছুতেই মনে করিতে পারে না যে, তাহার মাষ্টারবিহীন একসন্ধ্যাবেলাকার এত সাধের গল্পটি হঠাৎ একটি সর্পাঘাতেই মারা গেল! কাজেই দিদিমাকে সেই মহাপরিণামের চিরনিরুদ্ধ গৃহ হইতে গল্পটিকে আবার ফিরাইয়া আনিতে হয়। কিন্তু এত সহজে সেটি সাধন করেন, এমন অনায়াসে,—কেবল হয়তো একটা কলার ভেলায় ভাসাইয়া দিয়া দুটি দুই মন্ত্র পড়িয়া মাত্র—যাহাতে সেই ঝুপ্ ঝুপ্ বৃষ্টির রাত্রে স্তিমিত প্রদীপে বালকের মনে মৃত্যুর মূর্তি অত্যন্ত অকঠোর হইয়া আসে, তাহাকে এক রাত্রের সুখনিদ্রার চেয়ে বেশি মনে হয় না। গল্প যখন ফুরাইয়া যায়, আরামে শ্রান্ত দুটি চক্ষু আপনি মুদিয়া আসে, তখনো তো শিশুর ক্ষুদ্র প্রাণটিকে একটি স্নিগ্ধ নিস্তব্ধ নিস্তরঙ্গ স্রোতের মধ্যে সুষুপ্তির ভেলায় করিয়া ভাসাইয়া দেওয়া হয়, তার পরে ভোরের বেলায় কে দুটি মায়ামন্ত্র পড়িয়া তাহাকে এই জগতের মধ্যে জাগ্রৎ করিয়া তোলে।

কিন্তু যাহার বিশ্বাস নাই, যে ভীরু এ সৌন্দর্য্যরসাস্বাদনের জন্যও এক ইঞ্চি পরিমাণ অসম্ভবকে লঙ্ঘন করিতে পরাঙ্মুখ হয়, তাহার কাছে কোনো কিছুর আর তার-পরে নাই, সমস্তই হঠাৎ অসময়ে এক অসমাপ্তিতে সমাপ্ত হইয়া গেছে। ছেলেবেলায় সাতসমুদ্র পার হইয়া

মৃত্যুকেও লঙ্ঘন করিয়া গল্পের যেখানে যথার্থ বিরাম, সেখানে স্নেহময় সুমিষ্টস্বরে শুনিতাম—

আমার কথাটি ফুরোলো,
নটে গাছটি মুড়োলো।

এখন বয়স হইয়াছে, এখন গল্পের ঠিক মাঝখানটাতে হঠাৎ থামিয়া গিয়া একটা নিষ্ঠুর কঠিন কণ্ঠে শুনিতে পাই—

আমার কথাটি ফুরোলো না,
নটে গাছটি মুড়োলো না।
কেনরে নটে মুড়োলি নে কেন,
তোর গরুতে —

দূর হোক গে, ঐ নিরীহ প্রাণীটির নাম করিয়া কাজ নাই, আবার কে কোন্ দিক হইতে গায়ে পাতিয়া লইবে।

১৩০০

নববর্ষা

যৌবনে নিজের অন্ত পাই নাই, সংসারেরও অন্ত ছিল না। আমি কী যে হইব, না হইব, কী করিতে পারি, না পারি, কাজে ভাবে অনুভাবে আমার প্রকৃতির দৌড় কতদূর, তাহা নির্দিষ্ট হয় নাই, সংসারও অনির্দিষ্ট রহস্যপূর্ণ ছিল। এখন নিজের সম্বন্ধে সকল সম্ভাবনার সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি, পৃথিবীও সেই সঙ্গে সঙ্কুচিত হইয়া গেছে। এখন ইহা আমারি আপিসঘর বৈঠকখানা, দরদালানের সামিল হইয়া পড়িয়াছে। সেই ভাবেই পৃথিবী এত বেশি অভ্যস্ত পরিচিত হইয়াছে যে, ভুলিয়া

গেছি এমন কত আপিসঘর, বৈঠকখানা, দবদালান, ছায়ার মতো এই পৃথিবীর উপর দিয়া গেল, ইহাতে চিহ্নও রাখিতে পারিল না। কত প্রৌঢ় নিজের মামলা-মোকদ্দমার মন্ত্রগৃহকেই পৃথিবীর ধ্রুব কেন্দ্রস্থল গণ্য করিয়া তাকিয়ার উপর ঠেসান্ দিয়া বসিয়াছিল, তাহাদের নাম তাহাদের ভস্মের সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে উড়িয়া গেছে, সে এখন আর খুঁজিয়া পাইবার জো নাই—তবু পৃথিবী সমান বেগে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলিতেছে।

কিন্তু আষাঢ়ের মেঘ প্রতি বৎসর যখনি আসে, তখনই আপন নূতনত্বে রসাক্রান্ত ও পুরাতনত্বে পুঞ্জীভূত হইয়া আসে। তাহাকে আমরা ভুল করি না, কারণ, সে আমাদের ব্যবহারের বাহিরে থাকে। আমার সঙ্কোচের সঙ্গে সে সঙ্কুচিত হয় না। যখন বন্ধুর দ্বারা বঞ্চিত, শত্রুর দ্বারা পীড়িত, দুরদৃষ্টের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছি, তখন যে কেবল হৃদয়ের মধ্যে বেদনার চিহ্ন লাগিয়াছে, ললাটের উপর বলি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা নহে, যে পৃথিবী আমার চারিদিকে স্থির প্রতিষ্ঠিত, আমার আঘাতের দাগ তাহার উপর পড়িয়াছে। তাহার জলস্থল আমার বেদনায় বিক্ষত, আমার দুশ্চিন্তায় চিহ্নিত। আমার উপর যখন অস্ত্র আসিয়া পড়িয়াছে, তখন আমার চারিদিকের পৃথিবী সরিয়া দাঁড়ায় নাই, শর আমাকে ভেদ করিয়া তাহাকে বিদ্ধ করিয়াছে। এমনি করিয়া বারংবার আমার সুখদুঃখের ছাপ লাগিয়া পৃথিবীটা আমারই বলিয়া চিহ্নিত হইয়া গেছে।

মেঘে আমার কোনো চিহ্ন নাই। সে পথিক আসে যায়, থাকে না। আমার জরা তাহাকে স্পর্শ করিবার অবকাশ পায় না। আমার আশানৈরাশ্য হইতে সে বহুদূরে।

এইজন্য, কালিদাস উজ্জয়িনীর প্রাসাদ-শিখর হইতে যে আষাঢ়ের মেঘ দেখিয়াছিলেন, আমরাও সেই মেঘ দেখিয়াছি, ইতিমধ্যে পরিবর্তমান মানুষের ইতিহাস তাহাকে স্পর্শ করে নাই। কিন্তু সে অবন্তী, সে

বিদিশা কোথায়? মেঘদূতের মেঘ প্রতিবৎসর চিরনূতন চিরপুরাতন হইয়া দেখা দেয়, বিক্রমাদিত্যের যে উজ্জয়িনী মেঘের চেয়ে দৃঢ় ছিল, বিনষ্ট স্বপ্নের মতো তাহাকে আর ইচ্ছা করিলে গড়িবার জো নাই।

মেঘ দেখিলে "সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ" সুখিলোকেরও আনমনা ভাব হয়, এইজন্যই। মেঘ মনুষ্যলোকের কোনো ধার ধারে না বলিয়া মানুষকে অভ্যস্ত গণ্ডীর বাহিরে লইয়া যায়। মেঘের সঙ্গে আমাদের প্রতিদিনের চিন্তা, চেষ্টা, কাজকর্ম্মের কোনো সম্বন্ধ নাই বলিয়া সে আমাদের মনকে ছুটি দেয়। মন তখন বাঁধন মানিতে চাহে না, প্রভুশাপে নির্ব্বাসিত যক্ষের বিরহ তখন উদ্দাম হইয়া উঠে। প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধ, সংসারের সম্বন্ধ; মেঘ সংসারের এই সকল প্রয়োজনীয় সম্বন্ধগুলাকে ভুলাইয়া দেয়, তখনি হৃদয় বাঁধ ভাঙিয়া আপনার পথ বাহির করিতে চেষ্টা করে।

মেঘ আপনার নিত্যনূতন চিত্রবিন্যাসে, অন্ধকারে, গর্জ্জনে, বর্ষণে, চেনা পৃথিবীর উপর একটা প্রকাণ্ড অচেনার আভাস নিক্ষেপ করে,—একটা বহুদূর কালের এবং বহুদূর দেশের নিবিড় ছায়া ঘনাইয়া তোলে,—তখন পরিচিত পৃথিবীর হিসাবে যাহা অসম্ভব ছিল, তাহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। কর্ম্মপাশবদ্ধ প্রিয়তম যে আসিতে পারে না, পথিকবধূ তখন এ কথা আর মানিতে চাহে না। সংসারের কঠিন নিয়ম সে জানে, কিন্তু জ্ঞানে জানে মাত্র, সে নিয়ম যে এখনো বলবান আছে, নিবিড় বর্ষার দিনে এ কথা তাহার হৃদয়ে প্রতীতি হয় না।

সেই কথাই ভাবিতেছিলাম, ভোগের দ্বারা এই বিপুল পৃথিবী—এই চিরকালের পৃথিবী, আমার কাছে খর্ব্ব হইয়া গেছে। আমি তাহাকে যতটুকু পাইয়াছি, তাহাকে ততটুকু বলিয়াই জানি, আমার ভোগের বাহিরে তাহার অস্তিত্ব আমি গণ্যই করি না। জীবন শক্ত হইয়া বাঁধিয়া গেছে, সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের আবশ্যক পৃথিবীটুকুকে টানিয়া আঁটিয়া

লইয়াছে। নিজের মধ্যে এবং নিজের পৃথিবীর মধ্যে এখন আর কোনো রহস্য দেখিতে পাই না বলিয়াই শান্ত হইয়া আছি; নিজেকে সম্পূর্ণ জানি মনে করি এবং নিজের পৃথিবীটুকুকেও সম্পূর্ণ জানিয়াছি বলিয়া স্থির করিয়াছি। এমন সময় পূর্ব্বদিগন্ত স্নিগ্ধ অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া কোথা হইতে সেই শত-শতাব্দী পূর্ব্বেকার কালিদাসের মেঘ আসিয়া উপস্থিত হয়! সে আমার নহে, আমার পৃথিবীটুকুর নহে, সে আমাকে কোন্ অলকা-পুরীতে, কোন্ চিরযৌবনের রাজ্যে, চিরবিচ্ছেদের বেদনায়, চিরমিলনের আশ্বাসে, চিরসৌন্দর্য্যের কৈলাসপুরীর পথচিহ্নহীন তীর্থাভিমুখে আকর্ষণ করিতে থাকে। তখন, পৃথিবীর যেটুকু জানি সেটুকু তুচ্ছ হইয়া যায়, যাহা জানিতে পারি নাই তাহাই বড়ো হইয়া উঠে, যাহা পাইলাম না তাহাকেই লব্ধ জিনিষের চেয়ে বেশি সত্য মনে হইতে থাকে। জানিতে পারি, আমার জীবনে, আমার শক্তিতে, অতি অল্পই অধিকার করিতে পারিয়াছি যাহা বৃহৎ তাহাকে স্পর্শও করি নাই।

আমার নিত্যকর্ম্মক্ষেত্রকে নিত্যপরিচিত সংসারকে আচ্ছন্ন করিয়া সজলমেঘ-মেদুর পরিপূর্ণ নববর্ষা আমাকে অজ্ঞাত ভাবলোকের মধ্যে সমস্ত বিধিবিধানের বাহিরে একেবারে একাকী দাঁড় করাইয়া দেয়, —পৃথিবীর এই কয়টা বৎসর কাড়িয়া লইয়া আমাকে একটি প্রকাণ্ড পরমায়ুর বিশালত্বের মাঝখানে স্থাপন করে, আমাকে রামগিরি আশ্রমের জনশূন্য শৈলশৃঙ্গের শিলাতলে সঙ্গিহীন ছাড়িয়া দেয়। সেই নির্জ্জন শিখর, এবং আমার কোনো এক চিরনিকেতন, অন্তরাত্মার চিরগম্যস্থান অলকাপুরীর মাঝখানে একটি সুবৃহৎ-সুন্দর-পৃথিবী পড়িয়া আছে মনে পড়ে;—নদীকলধ্বনিত, সানুমৎপর্ব্বতবন্ধুর, জম্বুকুঞ্জচ্ছায়ান্ধকার, নববারিসিঞ্চিত-যূথীসুগন্ধি একটি বিপুল পৃথিবী। হৃদয় সেই পৃথিবীর বনে বনে গ্রামে গ্রামে শৃঙ্গে শৃঙ্গে নদীর কূলে কূলে ফিরিতে ফিরিতে

অপরিচিত সুন্দরের পরিচয় লইতে লইতে, দীর্ঘ বিরহের শেষ মোক্ষ-স্থানে যাইবার জন্য মানসোৎক হংসের ন্যায় উৎসুক হইয়া উঠে।

মেঘদূত ছাড়া নববর্ষার কাব্য কোনো সাহিত্যে কোথাও নাই। ইহাতে বর্ষার সমস্ত অন্তর্বেদনা নিত্যকালের ভাষায় লিখিত হইয়া গেছে। প্রকৃতির সাংবৎসরিক মেঘোৎসবের অনির্ব্বচনীয় কবিত্বগাথা মানবের ভাষায় বাঁধা পড়িয়াছে।

পূর্ব্বমেঘে বৃহৎ-পৃথিবী আমাদের কল্পনার কাছে উদ্‌ঘাটিত। আমরা সম্পন্ন গৃহস্থটি হইয়া আরামে সন্তোষের অর্দ্ধনিমীলিতলোচনে যে গৃহটুকুর মধ্যে বাস করিতেছিলাম, কালিদাসের মেঘ "আষাঢ়স্য প্রথম-দিবসে" হঠাৎ আসিয়া আমাদিগকে সেখান হইতে ঘরছাড়া করিয়া দিল। আমাদের গোয়ালঘর-গোলাবাড়ির বহুদূরে যে আবর্ত্তচঞ্চলা নর্ম্মদা ভ্রূকুটি রচনা করিয়া চলিয়াছে, যে চিত্রকূটের পাদকুঞ্জ প্রফুল্ল নব নীপে বিকশিত, উদয়নকথাকোবিদ গ্রামবৃদ্ধদের দ্বারের নিকট যে চৈত্য-বট শুককাকলীতে মুখর, তাহাই আমাদের পরিচিত ক্ষুদ্র সংসারকে নিরস্ত করিয়া বিচিত্র-সৌন্দর্য্যের চিরসত্যে উদ্ভাসিত হইয়া দেখা দিয়াছে।

বিরহীর ব্যগ্রতাতেও কবি পথসংক্ষেপ করেন নাই। আষাঢ়ের নীলাভ-মেঘচ্ছায়াবৃত নগ-নদী-নগর-জনপদের উপর দিয়া রহিয়া রহিয়া ভাবাবিষ্ট অলসগমনে যাত্রা করিয়াছেন। যে তাঁহার মুগ্ধনয়নকে অভ্যর্থনা করিয়া ডাকিয়াছে, তিনি তাহাকে আর "না" বলিতে পারেন নাই। পাঠকের চিত্তকে কবি বিরহের বেগে বাহির করিয়াছেন, আবার পথের সৌন্দর্য্যে মন্থর করিয়া তুলিয়াছেন। যে চরম স্থানে মন ধাবিত হইতেছে, তাহার সুদীর্ঘ পথটিও মনোহর, সে পথকে উপেক্ষা করা যায় না।

বর্ষায় অভ্যস্ত পরিচিত সংসার হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া মন বাহিরের দিকে যাইতে চায়, পূর্ব্বমেঘে কবি আমাদের সেই আকাঙ্ক্ষাকে উদ্বেল

করিয়া তাহারই কলগান জাগাইয়াছেন—আমাদিগকে মেঘের সঙ্গী করিয়া অপবিচিত পৃথিবীর মাঝখান দিয়া লইয়া চলিয়াছেন। সে পৃথিবী 'অনাঘ্রাতং পুষ্পম্', তাহা আমাদের প্রাত্যহিক ভোগের দ্বারা কিছুমাত্র মলিন হয় নাই, সে পৃথিবীতে আমাদের পরিচয়েব প্রাচীবদ্বারা কল্পনা কোনোখানে বাধা পায় না। যেমন ঐ মেঘ, তেম্‌নি সেই পৃথিবী। আমাব সেই সুখদুঃখ-ক্লান্তি অবসাদের জীবন তাহাকে কোথাও স্পর্শ করে নাই। প্রৌঢবয়সের নিশ্চয়তা বেডা দিয়া ঘের দিয়া তাহাকে নিজের বাস্তবাগানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয় নাই।

অজ্ঞাত নিখিলের সহিত নবীন পবিচয়, এই হইল পূর্ব্বমেঘ। নব মেঘের আর একটি কাজ আছে। সে আমাদের চাবিদিকে একটি পরমনিভৃত পরিবেষ্টন রচনা করিযা, "জননান্তরসৌহৃদানি" মনে করাইয়া দেয়—অপরূপ সৌন্দর্য্যলোকেব মধ্যে কোনো একটি চিরজ্ঞাত চিরপ্রিয়ের জন্য মনকে উতলা করিনা তোলে।

পূর্ব্বমেঘে বহুবিচিত্রেব সহিত সৌন্দর্য্যের পরিচয় এবং উত্তবমেঘে সেই একেব সহিত আনন্দের সম্মিলন। পৃথিবীতে বহুব মধ্য দিয়া সেই সুখের যাত্রা, এবং স্বর্গলোকে একেব মধ্যে সেই অভিসারের পরিণাম।

নববর্ষার দিনে এই বিষয়কর্ম্মের ক্ষুদ্র সংসারকে কে না বলিবে নির্ব্বাসন। প্রভুর অভিশাপেই এখানে আট্‌কা পড়িয়া আছি। মেঘ আসিয়া বাহিবে যাত্রা কবিবার জন্য আহ্বান কবে, তাহাই পূর্ব্বমেঘেব গান এবং যাত্রাব অবসানে চিরমিলনের জন্য আশ্বাস দেয়, তাহাই উত্তর-মেঘেব সংবাদ।

সকল কবিব কাব্যেই গূঢ অভ্যন্তরে এই পূর্ব্বমেঘ ও উত্তরমেঘ আছে। সকল বড়ো কাব্যই আমাদিগকে বৃহতেব মধ্যে আহ্বান করিয়া প্রানে ও নিভৃতের দিকে নির্দ্দেশ করে। প্রথমে বন্ধন ছেদন করিয়া

বাহির করে, পথে একটি ভূমার সহিত বাঁধিয়া দেয়। প্রভাতে পথে লইয়া আসে, সন্ধ্যায় ঘরে লইয়া যায়। একবার তানের মধ্যে আকাশ-পাতাল ঘুরাইয়া সমের মধ্যে পূর্ণ আনন্দে দাঁড় করাইয়া দেয়।

যে কবির তান আছে, কিন্তু কোথাও সম নাই, যাহার মধ্যে কেবল উদ্যম আছে আশ্বাস নাই, তাহার কবিত্ব উচ্চকাব্যশ্রেণীতে স্থায়ী হইতে পারে না। শেষের দিকে একটা কোথাও পৌঁছাইয়া দিতে হইবে, এই ভরসাতেই আমরা আমাদের চিরাভ্যস্ত সংসারের বাহির হইয়া কবির সহিত যাত্রা করি,—পুষ্পিত পথের মধ্য দিয়া আনিয়া হঠাৎ একটা শূন্য-গহ্বরের ধারের কাছে ছাড়িয়া দিলে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। এইজন্য কোনো কবির কাব্য পড়িবার সময় আমরা এই দুটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, তাঁহার পূর্ব্বমেঘ আমাদিগকে কোথায় বাহির করে এবং উত্তরমেঘ কোন সিংহদ্বারের সম্মুখে আনিয়া উপনীত করে।

১৩০৮

কেকাধ্বনি

হঠাৎ গৃহপালিত ময়ূরের ডাক শুনিয়া আমার বন্ধু বলিয়া উঠিলেন—আমি ঐ ময়ূরের ডাক সহ্য করিতে পারি না, কবিরা কেকারবকে কেন যে তাঁদের কাব্যে স্থান দিয়াছেন, বুঝিবার জো নাই।

কবি যখন বসন্তের কুহুস্বর এবং বর্ষার কেকা—দুটাকেই সমান আদর দিয়াছেন, তখন হঠাৎ মনে হইতে পারে, কবির বুঝি কৈবল্যদশাপ্রাপ্তি হইয়াছে, তাঁহার কাছে ভালো ও মন্দ, ললিত কর্কশের ভেদ লুপ্ত।

কেবল কেকা কেন, ব্যাঙের ডাক এবং ঝিল্লির ঝঙ্কারকে কেহ মধুর

বলিতে পারে না। অথচ কবিরা এ শব্দগুলিকে উপেক্ষা করেন নাই। প্রেয়সীর কণ্ঠস্বরের সহিত ইহাদের তুলনা করিতে সাহস পান নাই, কিন্তু ষড়্‌ঋতুর মহাসঙ্গীতের প্রধান অঙ্গ বলিয়া তাঁহারা ইহাদিগকে সম্মান দিয়াছেন।

একপ্রকারের মিষ্টতা আছে, তাহা নিঃসংশয় মিষ্ট, নিতান্তই মিষ্ট। তাহা নিজের লালিত্য সপ্রমাণ করিতে মুহূর্ত্তমাত্র সময় লয় না। ইন্দ্রিয়ের অসন্দিগ্ধ সাক্ষ্য লইয়া, মন তাহার সৌন্দর্য্য স্বীকার করিতে কিছুমাত্র তর্ক করে না। তাহা আমাদের মনের নিজের আবিষ্কার নহে—ইন্দ্রিয়ের নিকট হইতে পাওয়া, এইজন্য মন তাহাকে অবজ্ঞা করে,—বলে, ও নিতান্তই মিষ্ট, কেবলি মিষ্ট। অর্থাৎ উহার মিষ্টতা বুঝিতে অন্তঃকরণের কোনো প্রয়োজন হয় না। কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই বোঝা যায়। যাহারা গানের সমজ্‌দার, এইজন্যই তাহারা অত্যন্ত উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া বলে, অমুক লোক মিষ্ট গান করে। ভাবটা এই যে, মিষ্ট গায়ক গানকে আমাদের ইন্দ্রিয়সভায় আনিয়া নিতান্ত সুলভ প্রশংসা দ্বারা অপমানিত করে, মার্জ্জিত রুচি ও শিক্ষিত মনের দরবারে সে প্রবেশ করে না। যে লোক পাটের অভিজ্ঞ যাচনদার সে রসসিক্ত পাট চায় না, সে বলে, আমাকে শুক্‌নো পাট দাও, তবেই আমি ঠিক ওজনটা বুঝিব। গানের উপযুক্ত সমজ্‌দার বলে, বাজে রস দিয়া গানের বাজে গৌরব বাড়াইয়ো না,—আমাকে শুক্‌নো মাল দাও, তবেই আমি ঠিক ওজনটি পাইব, আমি খুসি হইয়া ঠিক দামটি চুকাইয়া দিব। বাহিরের বাজে মিষ্টতায় আসল জিনিষের মূল্য নামাইয়া দেয়।

যাহা সহজেই মিষ্ট, তাহাতে অতি শীঘ্র মনের আলস্য আনে, বেশিক্ষণ মনোযোগ থাকে না। অবিলম্বেই তাহার সীমায় উত্তীর্ণ হইয়া মন বলে, আর কেন, ঢের হইয়াছে।

এইজন্য যে লোক যে বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা লাভ করিয়াছে, সে তাহার গোড়ার দিক্‌কার নিতান্ত সহজ ও ললিত অংশকে আর খাতির করে না। কারণ সেটুকুর সীমা সে জানিয়া লইয়াছে, সেটুকুর দৌড় যে বেশিদূর নহে, তাহা সে বোঝে, এইজন্যই তাহার অন্তঃকরণ তাহাতে জাগে না। অশিক্ষিত সেই সহজ অংশটুকুই বুঝিতে পারে, অথচ তখনো সে তাহার সীমা পায় না—এইজন্যই সেই অগভীর অংশেই তাহার একমাত্র আনন্দ। সমজ্‌দারের আনন্দকে সে একটা কিম্ভুতব্যাপার বলিয়া মনে করে, অনেক সময় তাহাকে কপটতার আড়ম্বর বলিয়াও গণ্য করিয়া থাকে।

এইজন্যই সর্ব্বপ্রকার কলাবিদ্যাসম্বন্ধে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের আনন্দ ভিন্ন ভিন্ন পথে যায়। তখন একপক্ষ বলে, তুমি কী বুঝিবে আর এক-পক্ষ রাগ করিয়া বলে, যাহা বুঝিবার তাহা কেবল তুমিই বোঝো, জগতে আর কেহ বুঝি বোঝে না।

একটি সুগভীর সামঞ্জস্যের আনন্দ, সংস্থান-সমাবেশের আনন্দ, দূর-বর্ত্তীর সহিত যোগ-সংযোগের আনন্দ, পার্শ্ববর্ত্তীর সহিত বৈচিত্র্য-সাধনের আনন্দ—এইগুলি মানসিক আনন্দ। ভিতরে প্রবেশ না করিলে, না বুঝিলে, এ আনন্দ ভোগ করিবার উপায় নাই। উপর হইতে চট্ করিয়া যে সুখ পাওয়া যায়, ইহা তাহা অপেক্ষা স্থায়ী ও গভীর।

এবং এক হিসাবে তাহা অপেক্ষা ব্যাপক। যাহা অগভীর, লোকের শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে, অভ্যাসের সঙ্গে ক্রমেই তাহা ক্ষয় হইয়া তাহার রিক্ততা বাহির হইয়া পড়ে। যাহা গম্ভীর, তাহা আপাতত বহুলোকের গম্য না হইলেও বহুকাল তাহার পরমায়ু থাকে—তাহার মধ্যে যে একটি শ্রেষ্ঠতার আদর্শ আছে, তাহা সহজে জীর্ণ হয় না।

জয়দেবের "ললিতলবঙ্গলতা" ভালো বটে, কিন্তু বেশিক্ষণ নহে। ইন্দ্রিয় তাহাকে মন মহারাজের কাছে নিবেদন করে, মন তাহাকে এক-বার স্পর্শ করিয়াই রাখিয়া দেয়—তখন তাহা ইন্দ্রিয়ের ভোগেই শেষ

হইয়া যায়। ললিতলবঙ্গলতার পার্শ্বে কুমারসম্ভবের একটা শ্লোক ধরিয়া দেখা যাক্।

আবর্জ্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং
বাসো বসানা তরুণার্করাগম্।
পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব।

ছন্দ আলুলায়িত নহে, কথাগুলি যুক্তাক্ষরবহুল,—তবু ভ্রম হয়, এই শ্লোক ললিতলবঙ্গলতার অপেক্ষা কানেও মিষ্ট শুনাইতেছে। কিন্তু তাহা ভ্রম। মন নিজের সৃজনশক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়সুখ পূরণ করিয়া দিতেছে। যেখানে লোলুপ ইন্দ্রিয়গণ ভিড় করিয়া না দাঁড়ায়, সেইখানেই মন এইরূপ সৃজনের অবসর পায়। "পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা"—ইহার মধ্যে লয়ের যে উত্থান আছে, কঠোরে কোমলে যথাযথরূপে মিশ্রিত হইয়া ছন্দকে যে দোলা দিয়াছে, তাহা জয়দেবী লয়ের মতো অতিপ্রত্যক্ষ নহে—তাহা নিগূঢ়, মন তাহা আলস্যভরে পড়িয়া পায় না, নিজে আবিষ্কার করিয়া লইয়া খুসি হয়। এই শ্লোকের মধ্যে যে একটি ভাবের সৌন্দর্য্য, তাহাও আমাদের মনের সহিত চক্রান্ত করিয়া অশ্রুতিগম্য একটি সঙ্গীত রচনা করে—সে সঙ্গীত সমস্ত শব্দসঙ্গীতকে ছাড়াইয়া চলিয়া যায়,—মনে হয়, যেন কান জুড়াইয়া গেল—কিন্তু কান জুড়াইবার কথা নহে, মানসী মায়ায় কানকে প্রতারিত করে।

আমাদের এই মায়াবী মনটিকে সৃজনের অবকাশ না দিলে, সে কোনো মিষ্টতাকেই বেশিক্ষণ মিষ্ট বলিয়া গণ্য করে না। সে উপযুক্ত উপকরণ পাইলে কঠোর ছন্দকে ললিত, কঠিন শব্দকে কোমল করিয়া তুলিতে পারে। সেই শক্তি খাটাইবার জন্য সে কবিদের কাছে অনুরোধ প্রেরণ করিতেছে।

কেকারব কানে শুনিতে মিষ্ট নহে, কিন্তু অবস্থাবিশেষে, সময়বিশেষে তাহাকে মিষ্ট করিয়া শুনিতে পারে, মনের সেই ক্ষমতা আছে। সেই

মিষ্টতার স্বরূপ, কুহুতানের মিষ্টতা হইতে স্বতন্ত্র, নববর্ষাগমে গিরিপাদ-মূলে লতাজটিল প্রাচীন মহারণ্যের যে মত্ততা উপস্থিত হয়, কেকারব তাহারি গান। আষাঢ়ে শ্যামায়মান তমাল-তালীবনের দ্বিগুণতর ঘনায়িত অন্ধকারে, মাতৃস্তন্যপিপাসু ঊর্ধ্ববাহু শতসহস্র শিশুর মতো অগণ্য শাখা-প্রশাখার আন্দোলিত মর্মরমুখর মহোল্লাসের মধ্যে রহিয়া রহিয়া কেকা তারস্বরে যে একটি কাংস্যক্রেঙ্কার ধ্বনি উত্থিত করে, তাহাতে প্রবীণ বনস্পতিমণ্ডলীর মধ্যে আরণ্য মহোৎসবের প্রাণ জাগিয়া উঠে। কবির কেকারব সেই বর্ষার গান,—কান তাহার মাধুর্য্য জানে না, মনই জানে। সেইজন্যই মন তাহাতে অধিক মুগ্ধ হয়। মন তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেকখানি পায়,—সমস্ত মেঘাবৃত আকাশ, ছায়াবৃত অরণ্য, নীলিমাচ্ছন্ন গিরিশিখর, বিপুল মূঢ় প্রকৃতির অব্যক্ত অন্ধ আনন্দরাশি।

বিরহিণীর বিরহবেদনার সঙ্গে কবির কেকারব এইজন্যই জড়িত। তাহা শ্রুতিমধুর বলিয়া পথিকবধূকে ব্যাকুল করে না—তাহা সমস্ত বর্ষার মর্মোদ্‌ঘাটন করিয়া দেয়। নরনারীর প্রেমের মধ্যে একটি অত্যন্ত আদিম প্রাথমিক ভাব আছে—তাহা বহিঃপ্রকৃতির অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী, তাহা জলস্থল আকাশের গায়ে গায়ে সংলগ্ন। ষড়্‌ঋতু আপন পুষ্পপর্য্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমকে নানারঙে রাঙাইয়া দিয়া যায়। যাহাতে পল্লবকে স্পন্দিত, নদীকে তরঙ্গিত, শস্য-শীর্ষকে হিল্লোলিত করে, তাহা ইহাকেও অপূর্ব্বচাঞ্চল্যে আন্দোলিত করিতে থাকে। পূর্ণিমার কোটাল ইহাকে স্ফীত করে এবং সন্ধ্যাভ্রের রক্তিমায় ইহাকে লজ্জামণ্ডিত বধূবেশ পরাইয়া দেয়। এক-একটি ঋতু যখন আপন সোনার কাঠি লইয়া প্রেমকে স্পর্শ করে, তখন সে রোমাঞ্চকলেবরে না জাগিয়া থাকিতে পারে না। সে অরণ্যের পুষ্প-পল্লবেরই মতো প্রকৃতির নিগূঢ়স্পর্শাধীন। সেইজন্য যৌবনাবেশবিধুর কালিদাস ছয় ঋতুর ছয় তারে নরনারীর প্রেম কী কী সুরে বাজিতে থাকে, তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন—তিনি বুঝিয়াছেন

জগতে ঋতু আবর্ত্তনের সর্ব্বপ্রধান কাজ প্রেম-জাগানো,—ফুল-ফুটানো প্রভৃতি অন্য সমস্তই তাহার আনুষঙ্গিক। তাই যে কেকারব বর্ষাঋতুর নিখাদ সুর, তাহার আঘাত বিরহবেদনার ঠিক উপরে গিয়াই পড়ে।

বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন—

মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া।

এই ব্যাঙের ডাক নববর্ষার মত্তভাবের সঙ্গে নহে, ঘনবর্ষার নিবিড় ভাবের সঙ্গে বড়ো চমৎকার খাপ খায়। মেঘের মধ্যে আজ কোনো বর্ণ বৈচিত্র্য নাই, স্তরবিন্যাস নাই,—শচীর কোনো প্রাচীন কিঙ্করী আকাশের প্রাঙ্গণ মেঘ দিয়া সমান করিয়া লেপিয়া দিয়াছে, সমস্তই কৃষ্ণধূসর বর্ণ। নানা-শস্য-বিচিত্রা পৃথিবীর উপরে উজ্জ্বল আলোকের তুলিকা পড়ে নাই বলিয়া বৈচিত্র্য ফুটিয়া ওঠে নাই। ধানের কোমল মসৃণ সবুজ, পাটের গাঢ় বর্ণ এবং ইক্ষুর হরিদ্রাভা একটি বিশ্বব্যাপি-কালিমায় মিশিয়া আছে। বাতাস নাই। আসন্ন-বৃষ্টির আশঙ্কায় পঙ্কিল পথে লোক বাহির হয় নাই। মাঠে বহুদিন পূর্ব্বে ক্ষেতের কাজ সমস্ত শেষ হইয়া গেছে। পুকুরে পাড়ির সমান জল। এইরূপ জ্যোতির্হীন, গতিহীন, কর্ম্মহীন, বৈচিত্র্যহীন, কালিমালিপ্ত একাকারের দিনে ব্যাঙের ডাক ঠিক সুরটি লাগাইয়া থাকে। তাহার সুর ঐ বর্ণহীন মেঘের মতো, এই দীপ্তিশূন্য আলোকের মতো, নিস্তব্ধ নিবিড় বর্ষাকে ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে, বর্ষার গণ্ডীকে আরো ঘন করিয়া চারিদিকে টানিয়া দিতেছে। তাহা নীরবতার অপেক্ষাও একঘেয়ে। তাহা নিভৃত কোলাহল। ইহার সঙ্গে ঝিল্লীরব ভালোরূপ মেশে; কারণ যেমন মেঘ, যেমন ছায়া তেমনি ঝিল্লীরবও আরএকটা আচ্ছাদনবিশেষ; তাহা স্বরমণ্ডলে অন্ধকারের প্রতিরূপ, তাহা বর্ষা-নিশীথিনীকে সম্পূর্ণতা দান করে।
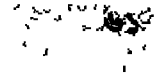
বাজে কথা

অন্য খরচের চেয়ে বাজে খরচেই মানুষকে যথার্থ চেনা যায়। কারণ, মানুষ ব্যয় করে বাঁধা নিয়ম অনুসারে, অপব্যয় করে নিজের খেয়ালে।

যেমন বাজে খরচ, তেমনি বাজে কথা। বাজে কথাতেই মানুষ আপনাকে ধরা দেয়। উপদেশের কথা যে-রাস্তা দিয়া চলে, মনুর আমল হইতে তাহা বাঁধা, কাজের কথা যে-পথে আপনার গো-যান টানিয়া আনে, সে পথ কেজো সম্প্রদায়ের পায়ে পায়ে তৃণপুষ্পশূন্য চিহ্নিত হইয়া গেছে। বাজে কথা নিজের মতো করিয়াই বলিতে হয়।

এইজন্য চাণক্য ব্যক্তিবিশেষকে যে একেবারেই চুপ করিয়া যাইতে বলিয়াছেন, সেই কঠোর বিধানের কিছু পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে; আমাদের বিবেচনায় চাণক্যকথিত উক্ত ভদ্রলোক 'তাবচ্চ শোভতে' যাবৎ তিনি উচ্চ অঙ্গের কথা বলেন, যাবৎ তিনি আবহমান কালের পরীক্ষিত সর্ব্বজনবিদিত সত্য ঘোষণায় প্রবৃত্ত থাকেন—কিন্তু তখনি তাঁহার বিপদ, যখনি তিনি সহজ কথা নিজের ভাষায় বলিবার চেষ্টা করেন।

যে-লোক একটা বলিবার বিশেষ কথা না থাকিলে কোনো কথাই বলিতে পারে না, হয় বেদবাক্য বলে, নয় চুপ করিয়া থাকে, হে চতুরানন, তাহার কুটুম্বিতা, তাহার সাহচর্য্য, তাহার প্রতিবেশ—

শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ।

পৃথিবীতে জিনিষমাত্রই প্রকাশধর্ম্মী নয়। কয়লা আগুন না পাইলে জ্বলে না, স্ফটিক অকারণে ঝক্‌ঝক্ করে। কয়লায় বিস্তর কল চলে, স্ফটিক হার গাঁথিয়া প্রিয়জনের গলায় পরাইবার জন্য। কয়লা আবশ্যক, স্ফটিক মূল্যবান।

এক-একটি দুর্লভ মানুষ এইরূপ স্ফটিকের মতো অকারণ ঝল্‌মল্‌ করিতে পারে। সে সহজেই আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকে—তাহার কোনো বিশেষ উপলক্ষ্যের আবশ্যক হয় না। তাহার নিকট হইতে কোনো বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া লইবার গরজ কাহারো থাকে না —সে অনায়াসে আপনাকে আপনি দেদীপ্যমান করে, ইহা দেখিয়াই আনন্দ। মানুষ প্রকাশ এত ভালোবাসে, আলোক তাহার এত প্রিয় যে, আবশ্যককে বিসর্জ্জন দিয়া, পেটের অন্ন ফেলিয়াও উজ্জ্বলতার জন্য লালায়িত হইয়া উঠে। এই গুণটি দেখিলে, মানুষ যে পতঙ্গশ্রেষ্ঠ, সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। উজ্জ্বল চক্ষু দেখিয়া যে জাতি অকারণে প্রাণ দিতে পারে, তাহার পরিচয় বিস্তারিত করিয়া দেওয়া বাহুল্য।

কিন্তু সকলেই পতঙ্গের ডানা লইয়া জন্মায় নাই। জ্যোতির মোহ সকলের নাই। অনেকেই বুদ্ধিমান, বিবেচক। গুণ দেখিলে তাঁহারা গভীরতার মধ্যে তলাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু আলো দেখিলে উপরে উড়িবার ব্যর্থ উদ্যমমাত্রও করেন না। কাব্য দেখিলে ইঁহারা প্রশ্ন করেন ইহার মধ্যে লাভ করিবার বিষয় কী আছে, গল্প শুনিলে অষ্টাদশ সংহিতার সহিত মিলাইয়া ইঁহারা ভূয়সী গবেষণার সহিত বিশুদ্ধ ধর্ম্মমতে দুয়ো বা বাহবা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসেন। যাহা অকারণ, যাহা অনাবশ্যক, তাহার প্রতি ইঁহাদের কোনো লোভ নাই।

যাহারা আলোক-উপাসক, তাহারা এই সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে নাই। তাহারা ইঁহাদিগকে যে সকল নামে অভিহিত করিয়াছে, আমরা তাহার অনুমোদন করি না। বররুচি ইঁহাদিগকে অরসিক বলিয়াছেন, আমাদের মতে ইহা রুচিগর্হিত। আমরা ইঁহা-দিগকে যাহা মনে করি, তাহা মনেই রাখিয়া দিই। কিন্তু প্রাচীনেরা মুখ সামলাইয়া কথা কহিতেন না—তাহার পরিচয় একটি সংস্কৃতশ্লোকে পাই। তাহাতে বলা হইতেছে, সিংহনখরের দ্বারা উৎপাটিত একটি গজমুক্তা

বনের মধ্যে পড়িয়াছিল, কোনো ভীলরমণী দূর হইতে দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহা তুলিয়া লইল—যখন টিপিয়া দেখিল তাহা পাকা কুল নহে, তাহা মুক্তামাত্র তখন দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিল। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, প্রয়োজনীয়তা-বিবেচনায় যাঁহারা সকল জিনিষের মূল্যনির্দ্ধারণ করেন, শুদ্ধমাত্র সৌন্দর্য্য ও উজ্জ্বলতার বিকাশ যাঁহাদিগকে লেশমাত্র বিচলিত করিতে পারে না, কবি বর্ব্বরনারীর সহিত তাঁহাদের তুলনা দিতেছেন। আমাদের বিবেচনায় কবি ইঁহাদের সম্বন্ধে নীরব থাকিলেই ভালো করিতেন—কারণ, ইঁহারা ক্ষমতাশালী লোক, বিশেষত, বিচারের ভার প্রায় ইঁহাদেরই হাতে। ইঁহারা গুরুমহাশয়ের কাজ করেন। যাঁহারা সরস্বতীর কাব্যকমলবনে বাস করেন, তাঁহারা তটবর্ত্তী বেত্রবনবাসীদিগকে উত্তেজিত না করুন, এই আমার প্রার্থনা।

সাহিত্যের যথার্থ বাজে রচনাগুলি কোনো বিশেষ কথা বলিবার স্পর্দ্ধা রাখে না। সংস্কৃতসাহিত্যে মেঘদূত তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাহা ধর্ম্মের কথা নহে, কর্ম্মের কথা নহে, পুরাণ নহে, ইতিহাস নহে। যে অবস্থায় মানুষের চেতন-অচেতনের বিচার লোপ পাইয়া যায়, ইহা সেই অবস্থার প্রলাপ। ইহাকে যদি কেহ বদরীফল মনে করিয়া পেট ভরাইবার আশ্বাসে তুলিয়া লন, তবে তখনি ফেলিয়া দিবেন। ইহাতে প্রয়োজনের কথা কিছুই নাই। ইহা নিটোল মুক্তা, এবং ইহাতে বিরহীর বিদীর্ণ হৃদয়ের রক্তচিহ্ন কিছু লাগিয়াছে, কিন্তু সেটুকু মুছিয়া ফেলিলেও ইহার মূল্য কমিবে না।

ইহার কোনো উদ্দেশ্য নাই বলিয়াই এ কাব্যখানি এমন স্বচ্ছ, এমন উজ্জ্বল। ইহা একটি মায়াতরী ;—কল্পনার হাওয়ায় ইহার সজল মেঘ-নির্ম্মিত পাল ফুলিয়া উঠিয়াছে এবং একটি বিরহীর হৃদয়ের কামনা বহন করিয়া ইহা অবারিতবেগে একটি অপরূপ নিরুদ্দেশের অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে—আর-কোনো বোঝা ইহাতে নাই।

টেনিসন্ যে idle tears, যে অকারণ অশ্রুবিন্দুর কথা বলিয়াছেন, মেঘদূত সেই বাজে চোখের জলের বাক্য। এই কথা শুনিয়া অনেকে আমার সঙ্গে তর্ক করিতে উদ্যত হইবেন। অনেকে বলিবেন, যক্ষ যখন প্রভুশাপে তাহার প্রেয়সীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তখন মেঘদূতের অশ্রুধারাকে অকারণ বলিতেছেন কেন? আমি তর্ক করিতে চাই না—এ সকল কথার আমি কোনো উত্তর দিব না। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, ঐ যে যক্ষের নির্ব্বাসন প্রভৃতি ব্যাপার, ও সমস্তই কালিদাসের বানানো,—বাক্যরচনার ও একটা উপলক্ষ্যমাত্র। ঐ ভারা বাঁধিয়া তিনি এই ইমারত গড়িয়াছেন—এখন আমরা ঐ ভারাটা ফেলিয়া দিব। আসল কথা, "রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্" মন অকারণ বিরহে বিকল হইয়া উঠে, কালিদাস অন্যত্র তাহা স্বীকার করিয়াছেন,—আষাঢ়ের প্রথমদিনে অকস্মাৎ ঘনমেঘের ঘটা দেখিলে আমাদের মনে এক সৃষ্টিছাড়া বিরহ জাগিয়া উঠে, মেঘদূত সেই অকারণ বিরহের অমূলক প্রলাপ। তা যদি না হইত, তবে বিরহী মেঘকে ছাড়িয়া বিদ্যুৎকে দূত পাঠাইত। তবে পূর্ব্বমেঘ এত রহিয়া-বসিয়া, এত ঘুরিয়া ফিরিয়া, এত যূথীবন প্রফুল্ল করিয়া, এত জনপদবধূর উৎক্ষিপ্ত দৃষ্টির কটাক্ষপাত লুটিয়া লইয়া চলিত না।

কাব্য পড়িবার সময়ও যদি হিসাবের খাতা খুলিয়া রাখিতেই হয়, যদি কী লাভ করিলাম, হাতে হাতে তাহার নিকাশ চুকাইয়া লইতেই হয় তবে স্বীকার করিব মেঘদূত হইতে আমরা একটি তথ্য লাভ করিয়া পুলকিত হইয়াছি। সেটি এই যে, তখনো মানুষ ছিল এবং তখনো আষাঢ়ের প্রথম দিন যথানিয়মে আসিত।

কিন্তু অসহিষ্ণু বররুচি যাঁহাদের প্রতি অশিষ্ট বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন তাঁহারা কি এরূপ লাভকে লাভ বলিয়াই গণ্য করিবেন? ইহাতে কি জ্ঞানের বিস্তার, দেশের উন্নতি, চরিত্রের সংশোধন ঘটিবে? অতএব

যাহা অকারণ যাহা অনাবশ্যক, হে চতুরানন, তাহা রসের কাব্যে রসিক-দের জন্যই ঢাকা থাকুক—যাহা আবশ্যক, যাহা হিতকর, তাহার ঘোষণার বিরতি ও তাহার খবিদ্দারের অভাব হইবে না।

১৩০৯

মা ভৈঃ

মৃত্যু একটা প্রকাণ্ড কালো কঠিন কষ্টিপাথরের মতো। ইহারই গায়ে কষিয়া সংসারের সমস্ত খাঁটি সোনার পরীক্ষা হইয়া থাকে।

এমন একটা বিশ্বব্যাপী সার্ব্বজনীন ভয় পৃথিবীর মাথার উপরে যদি না ঝুলিত, তবে সত্য-মিথ্যাকে, ছোটো-বড়ো-মাঝারিকে বিশুদ্ধভাবে তুলা করিয়া দেখিবার কোনো উপায় থাকিত না।

এই মৃত্যুর তুলায় যে-সব জাতির তৌল হইয়া গেছে, তাহারা পাস্‌মার্কা পাইয়াছে। তাহারা আপনাদিগকে প্রমাণ করিয়াছে, নিজের কাছে ও পরের কাছে তাহাদের আর কিছুতেই কুণ্ঠিত হইবার কোনো কারণ নাই। মৃত্যুর দ্বারাই তাহাদের জীবন পরীক্ষিত। ধনার যথার্থ পরীক্ষা দানে, যাহার প্রাণ আছে, তাহার যথার্থ পরীক্ষা প্রাণ দিবার শক্তিতে। যাহার প্রাণ নাই বলিলেই হয়, সেই মরিতে কৃপণতা করে।

যে মরিতে জানে সুখের অধিকার তাহারই, যে জয় করে, ভোগ

করা তাহাকেই সাজে। যে লোক জীবনের সঙ্গে সুখকে, বিলাসকে, দুই হাতে আঁকড়িয়া থাকে, সুখ তাহার সেই ঘৃণিত ক্রীতদাসের কাছে নিজের সমস্ত ভাণ্ডার খুলিয়া দেয় না, তাহাকে উচ্ছিষ্টমাত্র দিয়া দ্বারে ফেলিয়া রাখে। আর মৃত্যুর আহ্বানমাত্র যাহারা তুড়ি মারিয়া চলিয়া যায়, চির আদৃত সুখের দিকে একবার পিছন ফিরিয়া তাকায় না, সুখ তাহাদিগকে চায়, সুখ তাহারাই জানে। যাহারা সবলে ত্যাগ করিতে পারে, তাহারাই প্রবলভাবে ভোগ করিতে পারে। যাহারা মরিতে জানে না, তাহাদের ভোগবিলাসের দীনতা-কৃশতা-ঘৃণ্যতা গাড়িজুড়ি এবং তক্‌মা-চাপরাশের দ্বারা ঢাকা পড়ে না। ত্যাগের বিলাসবিরল কঠোরতার মধ্যে পৌরুষ আছে। যদি স্বেচ্ছায় তাহা বরণ করি, তবে নিজেকে লজ্জা হইতে বাঁচাইতে পারিব।

এই দুই রাস্তা আছে—এক ক্ষত্রিয়ের রাস্তা, আর এক ব্রাহ্মণের রাস্তা। যাহারা মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করে, পৃথিবীর সুখসম্পদ তাহাদেরি। যাহারা জীবনের সুখকে অগ্রাহ্য করিতে পারে, তাহাদের আনন্দ মুক্তির। এই দুয়েতেই পৌরুষ।

প্রাণটা দিব, এ কথা বলা যেমন শক্ত—সুখটা চাই না, এ কথা বলা তাহা অপেক্ষা কম শক্ত নয়। পৃথিবীতে যদি মনুষ্যত্বের গৌরবে মাথা তুলিয়া চলিতে চাই, তবে এই দুয়ের একটা কথা যেন বলিতে পারি। হয় বীর্য্যের সঙ্গে বলিতে হইবে—"চাই।" নয়, বীর্য্যেরই সঙ্গে বলিতে হইবে—"চাই না।" "চাই" বলিয়া কাঁদিব, অথচ লইবার শক্তি নাই, "চাই না" বলিয়া পড়িয়া থাকিব, কারণ চাহিবার উদ্যম নাই,—এমন ধিক্কার বহন করিয়াও যাহারা বাঁচে, যম তাহাদিগকে নিজগুণে দয়া করিয়া না সরাইয়া লইলে তাহাদের মরণের আর উপায় নাই।

বাঙালি আজকাল লোকসমাজে বাহির হইয়াছে। মুস্কিল এই যে,

জগতের মৃত্যুশালা হইতে তাহার কোনো পাস নাই। সুতরাং তাহার কথাবার্ত্তা যতই বড়ো হোক্, কাহারো কাছে সে খাতির দাবী করিতে পারে না। এইজন্য তাহার আস্ফালনের কথায় অত্যন্ত বেসুর লাগে। না মরিলে সেটা সংশোধন হওয়া শক্ত।

পিতামহের বিরুদ্ধে আমাদের এইটেই সব চেয়ে বড়ো অভিযোগ। সেই তো আজ তাঁহারা নাই, তবে ভালো-মন্দ কোনো-একটা অবসরে তাঁহারা রীতিমতো মরিলেন না কেন? তাঁহারা যদি মরিতেন, তবে উত্তরাধিকারসূত্রে আমরাও নিজেদের মরিবার শক্তিসম্বন্ধে আস্থা রাখিতে পারিতাম। তাঁহারা নিজে না খাইয়াও ছেলেদের অন্নের সঙ্গতি রাখিয়া গেছেন, শুধু মৃত্যুর সঙ্গতি রাখিয়া যান নাই। এত-বড়ো দুর্ভাগ্য, এত-বড়ো দীনতা আর কী হইতে পারে।

ইংরেজ আমাদের দেশের যোদ্ধৃজাতিকে ডাকিয়া বলেন, "তোমরা লড়াই করিয়াছ—প্রাণ দিতে জানো, যাহারা কখনো লড়াই করে নাই, কেবল বকিতে জানে, তাহাদের দলে ভিড়িয়া তোমরা কন্‌গ্রেস্ করিতে যাইবে।"

তর্ক করিয়া ইহার উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তর্কের দ্বারা লজ্জা যায় না। বিশ্বকর্ম্মা নৈয়ায়িক ছিলেন না, সেইজন্য পৃথিবীতে অযৌক্তিক ব্যাপার পদে পদে দেখিতে পাই। সেইজন্য যাহারা মরিতে জানে না, তাহারা শুধু যুদ্ধের সময়ে নহে, শান্তির সময়েও পরস্পর ঠিক সমানভাবে মিশিতে পারে না, যুক্তিশাস্ত্রে ইহা অসঙ্গত, অর্থহীন, কিন্তু পৃথিবীতে ইহা সত্য।

অথচ যখন ভাবিয়া দেখি—আমাদের পিতামহীরা স্বামীর সহিত সহমরণে মরিয়াছেন, তখন আশা হয়—মরাটা তেমন কঠিন হয় না। অবশ্য, তাঁহারা সকলেই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মরেন নাই। কিন্তু অনেকেই যে মৃত্যুকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বরণ করিয়াছেন, বিদেশীরাও তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন।

কোনো দেশেই লোক নির্ব্বিশেষে নির্ভয়ে ও স্বেচ্ছায় মরে না। কেবল স্বল্প একদল মৃত্যুকে যথার্থভাবে বরণ করিতে পারে—বাকি সকলে কেহ বা দলে ভিড়িয়া মরে, কেহ বা লজ্জায় পড়িয়া মরে, কেহ বা দস্তুরের তাড়নায় জড়ভাবে মরে।

মন হইতে ভয় একেবারে যায় না। কিন্তু ভয় পাইতে নিজের কাছে ও পরের কাছে লজ্জা করা চাই। শিশুকাল হইতে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া উচিত, যাহাতে ভয় পাইলেই তাহারা অনায়াসে অকপটে স্বীকার না করিতে পারে। এমন শিক্ষা পাইলে লোক লজ্জায় পড়িয়া সাহস করে। যদি মিথ্যা গর্ব্ব করিতে হয়, তবে আমার সাহস আছে, এই মিথ্যাগর্ব্বই সব চেয়ে মার্জ্জনীয়। কারণ, দৈন্যই বলো, অজ্ঞতাই বলো, মূঢ়তাই বলো, মনুষ্যচরিত্রে ভয়ের মতো এত ছোটো আর কিছুই নাই। ভয় নাই বলিয়া যে লোক মিথ্যা অহঙ্কারও করে, অন্তত তাহার লজ্জা আছে, এই সদ্‌গুণটারও প্রমাণ হয়।

নির্ভীকতা যেখানে নাই, সেখানে এই লজ্জার চর্চ্চা করিলেও কাজে লাগে। সাহসের ন্যায় লজ্জাও লোককে বল দেয়। লোকলজ্জায় প্রাণবিসর্জ্জন করা কিছুই অসম্ভব নয়।

অতএব আমাদের পিতামহীরা কেহ কেহ লোকলজ্জাতেও প্রাণ দিয়াছিলেন, এ কথা স্বীকার করা যাইতে পারে। প্রাণ দিবার শক্তি তাঁহাদের ছিল,—লজ্জায় হোক্‌, প্রেমে হোক্‌, ধর্ম্মোৎসাহে হোক্‌, প্রাণ তাঁহারা দিয়াছিলেন, এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে।

বস্তুত দল বাঁধিয়া মরা সহজ। একাকিনী চিতাগ্নিতে আরোহণ করিবার মতো বীরত্ব যুদ্ধক্ষেত্রে বিরল।

বাংলার সেই প্রাণবিসর্জ্জনপরায়ণা পিতামহীকে আজ আমরা প্রণাম করি। তিনি যে জাতিকে স্তন দিয়াছেন, স্বর্গে গিয়া তাহাকে বিস্মৃত হইবেন না। হে আর্য্যে, তুমি তোমার সন্তানদিগকে সংসারের

চরমভয় হইতে উত্তীর্ণ করিয়া দাও। তুমি কখনো স্বপ্নেও জানো নাই যে, তোমার আত্মবিস্মৃত বীরত্ব দ্বারা তুমি পৃথিবীর বীরপুরুষদিগকেও লজ্জিত করিতেছ। তুমি যেমন দিবাবসানে সংসারের কাজ শেষ করিয়া নিঃশব্দে পতির পালঙ্কে আরোহণ করিতে,—দাম্পত্যলীলার অবসানদিনে সংসারের কার্য্যক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া তেমনি সহজে বধূবেশে সীমন্তে মঙ্গলসিন্দূর পরিয়া পতির চিতায় আরোহণ করিয়াছ। মৃত্যুকে তুমি সুন্দর করিয়াছ, শুভ করিয়াছ, পবিত্র করিয়াছ—চিতাকে তুমি বিবাহশয্যার ন্যায় আনন্দময়, কল্যাণময় করিয়াছ। বাংলাদেশে পাবক তোমারই পবিত্র জীবনাহুতিদ্বারা পূত হইয়াছে—আজ হইতে এই কথা আমরা স্মরণ করিব। আমাদের ইতিহাস নীরব, কিন্তু অগ্নি আমাদের ঘরে ঘরে তোমার বাণী বহন করিতেছে। তোমার অক্ষয়-অমর স্মরণনিলয় বলিয়া সেই অগ্নিকে, তোমার সেই অন্তিমবিবাহের জ্যোতিঃ-সূত্রময় অনন্ত পট্টবসনখানিকে আমরা প্রত্যহ প্রণাম করিব। সেই অগ্নিশিখা তোমার উদ্যত বাহুরূপে আমাদের প্রত্যেককে আশীর্ব্বাদ করুক। মৃত্যু যে কত সহজ, কত উজ্জ্বল, কত উন্নত, হে চিরনীরব স্বর্গবাসিনী, অগ্নি আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে তোমার নিকট হইতে সেই বার্ত্তা বহন করিয়া অভয়ঘোষণা করুক্।

১৩০৯

পরনিন্দা

পরনিন্দা পৃথিবীতে এত প্রাচীন এবং এত ব্যাপক যে, সহসা ইহার বিরুদ্ধে একটা যে-সে মত প্রকাশ করা ধৃষ্টতা হইয়া পড়ে।

নোনা জল পানের পক্ষে উপযোগী নহে, এ কথা শিশুও জানে—কিন্তু যখন দেখি সাত সমুদ্রের জল নুনে পরিপূর্ণ; যখন দেখি, এই নোনা জল সমস্ত পৃথিবীকে বেড়িয়া আছে, তখন এ কথা বলিতে কোনোমতেই সাহস হয় না যে, সমুদ্রের জলে নুন না থাকিলেই ভালো হইত। নিশ্চয়ই ভালো হইত না—হয়তো লবণজলের অভাবে সমস্ত পৃথিবী পচিয়া উঠিত।

তেম্‌নি, পরনিন্দা সমাজের কণায় কণায় যদি মিশিয়া না থাকিত, তবে নিশ্চয়ই একটা বড়ো রকমের অনর্থ ঘটিত। উহা লবণের মতো সমস্ত সংসারকে বিকার হইতে রক্ষা করিতেছে।

পাঠক বলিবেন, "বুঝিয়াছি। তুমি যাহা বলিতে চাও, তাহা অত্যন্ত পুরাতন। অর্থাৎ নিন্দার ভয়ে সমাজ প্রকৃতিস্থ হইয়া আছে।"

এ কথা যদি পুরাতন হয়, তবে আনন্দের বিষয়। আমি তো বলিয়াছি, যাহা পুরাতন, তাহা বিশ্বাসের যোগ্য।

বস্তুত নিন্দা না থাকিলে পৃথিবীতে জীবনের গৌরব কি থাকিত? একটা ভালো কাজে হাত দিলাম, তাহার নিন্দা কেহ করে না—সে ভালো কাজের দাম কী! একটা ভালো কিছু লিখিলাম, তাহার নিন্দুক কেহ নাই, ভালো গ্রন্থের পক্ষে এমন মর্ম্মান্তিক অনাদর কী হইতে পারে! জীবনকে ধর্ম্মচর্চ্চায় উৎসর্গ করিলাম, যদি কোনো লোক তাহার মধ্যে

গূঢ় মন্দ অভিপ্রায় না দেখিল, তবে সাধুতা যে নিতান্তই সহজ হইয়া পড়িল।

মহত্বকে পদে পদে নিন্দার কাঁটা মাড়াইয়া চলিতে হয়। ইহাতে যে হার মানে, বীরের সদ্গতি সে লাভ করে না। পৃথিবীতে নিন্দা দোষীকে সংশোধন করিবার জন্য আছে তাহা নহে, মহত্বকে গৌরব দেওয়া তাহার একটা মস্ত কাজ।

নিন্দা বিরোধ গায়ে বাজে না, এমন কথা অল্প লোকেই বলিতে পারে। কোনো সহৃদয় লোক তো বলিতে পারে না। যাহার হৃদয় বেশি তাহার ব্যথা পাইবার শক্তিও বেশি। যাহার হৃদয় আছে, সংসারে সেই লোকই কাজের মতো কাজে হাত দেয়। আবার লোকের মতো লোক দেখিলেই নিন্দার ধার চারগুণ শাণিত হইয়া উঠে। ইহাতেই দেখা যায়, বিধাতা যেখানে অধিকার বেশি দিয়াছেন, সেইখানেই দুঃখ এবং পরীক্ষা অত্যন্ত কঠিন করিয়াছেন। বিধাতার সেই বিধানই জয়ী হউক। নিন্দা, দুঃখ, বিরোধ যেন ভালো লোকের, গুণী লোকের ভাগ্যেই বেশি করিয়া জোটে। যে যথার্থরূপে ব্যথা ভোগ করিতে জানে, সেই যেন ব্যথা পায়। অযোগ্য ক্ষুদ্র ব্যক্তির উপরে যেন নিন্দাবেদনার অনাবশ্যক অপব্যয় না হয়।

সরলহৃদয় পাঠক পুনশ্চ বলিবেন,—"জানি নিন্দায় উপকার আছে। যে লোক দোষ করে, তাহার দোষকে ঘোষণা করা ভালো, কিন্তু যে করে না, তাহার নিন্দায় সংসারে ভালো হইতেই পারে না। মিথ্যা জিনিষটা কোনো অবস্থাতেই ভালো নয়।"

এ হইলে তো নিন্দা টিঁকে না। প্রমাণ লইয়া দোষীকে দোষী সাব্যস্ত করা, সে তো হইল বিচার। সে গুরুভার কয়জন লইতে পারে, এবং এত সময়ই বা কাহার হাতে আছে? তাহা ছাড়া পরের সম্বন্ধে এত অতিরিক্ত মাত্রায় কাহারো গরজ নাই। যদি থাকিত, তবে পরের

পক্ষে তাহা একেবারেই অসহ্য হইত। নিন্দুককে সহ্য করা যায়, কারণ, তাহার নিন্দুকতাকে নিন্দা করিবার সুখ আমারো হাতে আছে, কিন্তু বিচারককে সহ্য করিবে কে?

বস্তুত আমরা অতি সামান্য প্রমাণেই নিন্দা করিয়া থাকি, নিন্দার সেই লাঘবতাটুকু না থাকিলে সমাজের হাড় গুঁড়া হইয়া যাইত। নিন্দার রায় চূড়ান্ত রায় নহে—নিন্দিত ব্যক্তি ইচ্ছা করিলেই তাহার প্রতিবাদ না করিতেও পারে। এমন কি, নিন্দাবাক্য হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়াই সুবুদ্ধি বলিয়া গণ্য। কিন্তু নিন্দা যদি বিচারকের রায় হইত, তবে সুবুদ্ধিকে উকিল-মোক্তারের শরণ লইতে হইত। যাঁহারা জানেন, তাঁহারা স্বীকার করিবেন, উকিল-মোক্তারের সহিত কারবার হাসির কথা নহে। অতএব দেখা যাইতেছে, সংসারের প্রয়োজনহিসাবে নিন্দার যতটুকু গুরুত্ব আবশ্যক তাহাও আছে, যতটুকু লঘুত্ব থাকা উচিত তাহারো অভাব নাই।

পূর্ব্বে যে পাঠকটি আমার কথায় অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই বলিবেন—"তুচ্ছ অনুমানের উপরেই হউক বা নিশ্চিত প্রমাণের উপরেই হউক্, নিন্দা যদি করিতেই হয় তবে ব্যথার সহিত করা উচিত—নিন্দায় সুখ পাওয়া উচিত নহে।"

এমন কথা যিনি বলিবেন, তিনি নিশ্চয়ই সহৃদয় ব্যক্তি। সুতরাং তাঁহার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত—নিন্দায় নিন্দিত ব্যক্তি ব্যথা পায় আবার নিন্দুকও যদি বেদনা বোধ করে, তবে সংসারে দুঃখবেদনার পরিমাণ কিরূপ অপরিমিতরূপে বাড়িয়া উঠে। তাহা হইলে নিমন্ত্রণসভা নিস্তব্ধ, বন্ধুসভা বিষাদে ম্রিয়মাণ, সমালোচকের চক্ষু অশ্রুপ্লুত এবং তাঁহার পাঠকগণের হৃদ্‌গহ্বর হইতে উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ঘনঘন উচ্ছ্বসিত হইত। আশা করি, শনিগ্রহের অধিবাসীদেরও এমন দশা নয়।

তা ছাড়া সুখও পাইব না অথচ নিন্দাও করিব, এমন ভয়ঙ্কর নিন্দুক

মনুষ্যজাতিও নহে। মানুষকে বিধাতা এতই সৌখীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন যে, যখন সে নিজের পেট ভরাইয়া প্রাণরক্ষা করিতে যাইতেছে, তখনও ক্ষুধানিবৃত্তি ও রুচিপরিতৃপ্তির যে সুখ, সেটুকুও তাহার চাই—সেই মানুষ ট্রামভাড়া করিয়া বন্ধুর বাড়ি গিয়া পরের নিন্দা করিয়া আসিবে অথচ তাহাতে সুখ পাইবে না, যে ধর্মনীতি এমন অসম্ভব প্রত্যাশা করে তাহা পূজনীয়, কিন্তু পালনীয় নহে।

আবিষ্কারমাত্রেরই মধ্যে সুখের অংশ আছে। শিকার কিছুমাত্র সুখের হইত না, যদি মৃগ যেখানে-সেখানে থাকিত এবং ব্যাধকে দেখিয়া পলাইয়া না যাইত। মৃগের উপরেই আমাদের আক্রোশ আছে বলিয়াই যে তাহাকে মারি তাহা নহে, সে বেচারা গহন বনে থাকে এবং সে পলায়নপটু বলিয়া তাহাকে কাজেই মারিতে হয়।

মানুষের চরিত্র, বিশেষত তাহার দোষগুলি, ঝোপঝাপের মধ্যেই থাকে এবং পায়ের শব্দ শুনিলেই দৌড় মারিতে চায়, এইজন্যই নিন্দার এত সুখ। আমি নাড়ী-নক্ষত্র জানি, আমার কাছে কিছুই গোপন নাই, নিন্দুকের মুখে এ কথা শুনিলেই বোঝা যায়, সে ব্যক্তি জাত-শিকারী। তুমি তোমার যে অংশটা দেখাইতে চাও না, আমি সেইটাকেই তাড়াইয়া ধরিয়াছি। জলের মাছকে আমি ছিপ ফেলিয়া ধরি; আকাশের পাখীকে বাণ মারিয়া পাড়ি, বনের পশুকে জাল পাতিয়া বাঁধি—ইহা কত সুখের। যাহা লুকায় তাহাকে বাহির করা, যাহা পালায় তাহাকে বাঁধা, ইহার জন্যে মানুষ কী না করে।

দুর্লভতার প্রতি মানুষের একটা মোহ আছে। সে মনে করে, যাহা সুলভ তাহা খাঁটি নহে, যাহা উপরে আছে তাহা আবরণমাত্র, যাহা লুকাইয়া আছে তাহাই আসল। এইজন্যই গোপনের পরিচয় পাইলে সে আর কিছু বিচার না করিয়া প্রকৃতের পরিচয় পাইলাম বলিয়া হঠাৎ খুসি হইয়া উঠে। এ কথা সে মনে করে না যে উপরের সত্যের চেয়ে

নিচের সত্য যে বেশি সত্য তাহা নহে,—এ কথা তাহাকে বোঝানো শক্ত যে, সত্য যদি বাহিরে থাকে তবুও তাহা সত্য, এবং ভিতরে যেটা সেটা যদি সত্য না হয়, তবে তাহা অসত্য। এই মোহবশতই কাব্যের সরল সৌন্দর্য্য অপেক্ষা তাহার গভীর তত্ত্বকে পাঠক অধিক সত্য বলিয়া মনে করিতে ভালোবাসে এবং বিজ্ঞ লোকেরা নিশাচর পাপকে আলোক-চর সাধুতার অপেক্ষা বেশি বাস্তব বলিয়া তাহার গুরুত্ব অনুভব করে। এইজন্য মানুষের নিন্দা শুনিলেই মনে হয় তাহার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া গেল। পৃথিবীতে অতি অল্প লোকের সঙ্গেই আমাকে ঘরকন্না করিতে হয়, অথচ এত-শত লোকের প্রকৃত পরিচয় লইয়া আমার লাভটা কী? কিন্তু প্রকৃত পরিচয়ের জন্য ব্যগ্রতা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম—সেটা মনুষ্যত্বের প্রধান অঙ্গ—অতএব তাহার সঙ্গে বিবাদ করা চলে না,—কেবল যখন দুঃখ করিবার দীর্ঘ অবকাশ পাওয়া যায়, তখন এই ভাবি যে, যাহা সুন্দর, যাহা সম্পূর্ণ, যাহা ফুলের মতো বাহিরে বিকশিত হইয়া দেখা দেয়, তাহা বাহিরে আসে বলিয়াই বুদ্ধিমান্ মানুষ ঠকিবার ভয়ে তাহাকে বিশ্বাস করিয়া তাহাতে সম্পূর্ণ আনন্দ ভোগ করিতে সাহস করে না। ঠকাই কি সংসারের চরম ঠকা! না-ঠকাই কি চরম লাভ!

কিন্তু এ সকল বিষয়ের ভার আমার উপরে নাই,—মনুষ্যচরিত্র আমি জন্মিবার বহুপূর্ব্বেই তৈরি হইয়া গেছে। কেবল এই কথাটা আমি বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টায় ছিলাম যে, সাধারণত মানুষ নিন্দা করিয়া যে সুখ পায়, তাহা বিদ্বেষের সুখ নহে। বিদ্বেষ কখনই সাধারণভাবে সুখকর হইতে পারে না এবং বিদ্বেষ সমস্ত সমাজের স্তরে স্তরে পরিব্যাপ্ত হইলে সে বিষ হজম করা সমাজের অসাধ্য। আমরা বিস্তর ভালোলোককে নিরীহলোককেও নিন্দা করিতে শুনিয়াছি, তাহার কারণ এমন নহে যে, সংসারে ভালোলোক, নিরীহলোক নাই; তাহার কারণ এই যে, সাধারণত নিন্দার মূল প্রস্রবণটা মন্দভাব নয়।

কিন্তু বিদ্বেষমূলক নিন্দা সংসারে একেবারে নাই, এ কথা লিখিতে গেলে সত্যযুগের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। তবে সে নিন্দা সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার নাই। কেবল প্রার্থনা এই যে, এরূপ নিন্দা যাহার স্বভাবসিদ্ধ, সেই দুর্ভাগাকে যেন দয়া করিতে পারি।

১৩০৯

রঙ্গমঞ্চ

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাট্যমঞ্চের বর্ণনা আছে। তাহাতে দৃশ্যপটের কোনো উল্লেখ দেখিতে পাই না। তাহাতে যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল, এরূপ আমি বোধ করি না।

কলাবিদ্যা যেখানে একেশ্বরী, সেইখানেই তাহার পূর্ণগৌরব। সতীনের সঙ্গে ঘর করিতে গেলে তাহাকে খাটো হইতেই হইবে। বিশেষত সতীন যদি প্রবল হয়। রামায়ণকে যদি সুর করিয়া পড়িতে হয়, তবে আদিকাণ্ড হইতে উত্তরকাণ্ড পর্য্যন্ত সে সুরকে চিরকাল সমান একঘেয়ে হইয়া থাকিতে হয়, রাগিণী-হিসাবে সে বেচারার কোনোকালে পদোন্নতি ঘটে না। যাহা উচ্চদরের কাব্য, তাহা আপনার সঙ্গীত আপনার নিয়মেই জোগাইয়া থাকে, বাহিরের সঙ্গীতের সাহায্য অবজ্ঞার সঙ্গে উপেক্ষা করে। যাহা উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীত, তাহা আপনার কথা আপনার নিয়মেই বলে, তাহা কথার জন্য কালিদাস-মিল্টনের মুখাপেক্ষা করে না—তাহা নিতান্ত তুচ্ছ তোম্-তানা-নানা লইয়াই চমৎকার কাজ চালাইয়া দেয়। ছবিতে, গানেতে, কথায় মিশাইয়া ললিতকলার একটা বারোয়ারি ব্যাপার করা যাইতে পারে—কিন্তু সে কতকটা খেলা-

হিসাবে—তাহা হাটের জিনিষ—তাহাকে রাজকীয় উৎসবের উচ্চ আসন দেওয়া যাইতে পারে না।

কিন্তু শ্রাব্যকাব্যের চেয়ে দৃশ্যকাব্য স্বভাবতই কতকটা পরাধীন বটে। বাহিরের সাহায্যেই নিজেকে সার্থক করিবার জন্য সে বিশেষভাবে সৃষ্ট। সে যে অভিনয়ের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে, এ কথা তাহাকে স্বীকার করিতেই হয়।

আমরা এ কথা স্বীকার করি না। সাধ্বী স্ত্রী যেমন স্বামীকে ছাড়া আর কাহাকেও চায় না, ভালো কাব্য তেমনি ভাবুক ছাড়া আর কাহারো অপেক্ষা করে না। সাহিত্য পাঠ করিবার সময় আমরা সকলেই মনে মনে অভিনয় করিয়া থাকি—সে অভিনয়ে যে কাব্যের সৌন্দর্য্য খোলে না সে কাব্য কোনো কবিকে যশস্বী করে নাই।

বরঞ্চ এ কথা বলিতে পারো যে, অভিনয়বিদ্যা নিতান্ত পরাশ্রিতা। সে অনাথা নাটকের জন্য পথ চাহিয়া বসিয়া থাকে। নাটকের গৌরব অবলম্বন করিয়াই সে আপনার গৌরব দেখাইতে পারে।

স্ত্রৈণ স্বামী যেমন লোকের কাছে উপহাস পায়, নাটক তেমনি যদি অভিনয়ের অপেক্ষা করিয়া আপনাকে নানাদিকে খর্ব্ব করে, তবে সে-ও সেইরূপ উপহাসের যোগ্য হইয়া উঠে। নাটকের ভাবখানা এইরূপ হওয়া উচিত যে,—"আমার যদি অভিনয় হয় তো হউক্, না হয় তো অভিনয়ের পোড়াকপাল—আমার কোনোই ক্ষতি নাই।"

যাহাই হউক, অভিনয়কে কাব্যের অধীনতা স্বীকার করিতেই হয়। কিন্তু তাই বলিয়া সকল কলাবিদ্যারই গোলামি তাহাকে করিতে হইবে, এমন কী কথা আছে। যদি সে আপনার গৌরব রাখিতে চায়, তবে যেটুকু অধীনতা তাহার আত্মপ্রকাশের জন্য নিতান্তই না হইলে নয়, সেইটুকুই সে যেন গ্রহণ করে,—তাহার বেশি যাহা কিছু অবলম্বন করে, তাহাতে তাহার নিজের অবমাননা হয়।

ইহা বলা বাহুল্য, নাট্যোক্ত কথাগুলি অভিনেতার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। কবি তাহাকে যে হাসিব কথাটি জোগান, তাহা লইয়াই তাহাকে হাসিতে হয়; কবি তাহাকে যে কান্নার অবসর দেন, তাহা লইয়াই কাঁদিয়া সে দর্শকেব চোখে জল টানিয়া আনে। কিন্তু ছবিটা কেন? তাহা অভিনেতার পশ্চাতে ঝুলিতে থাকে—অভিনেতা তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তোলে না, তাহা আঁকামাত্র,—আমাব মতে তাহাতে অভিনেতার অক্ষমতা, কাপুরুষতা প্রকাশ পায়। এইরূপে যে উপায়ে দর্শকদের মনে বিভ্রম উৎপাদন করিয়া সে নিজের কাজকে সহজ করিয়া তোলে, তাহা চিত্রকরেব কাছ হইতে ভিক্ষা কবিয়া আনা।

তা ছাড়া যে দর্শক তোমার অভিনয় দেখিতে আসিয়াছে, তাহার কি নিজের সম্বল কাণা-কড়াও নাই? সে কি শিশু? বিশ্বাস করিয়া তাহার উপরে কি কোনো বিষয়েই নির্ভর করিবার জো নাই? যদি তাহা সত্য হয়, তবে ডবল্ দাম দিলেও এমন সকল লোককে টিকিট্ বেচিতে নাই।

এ তো আদালতের কাছে সাক্ষ্য দেওয়া নয় যে, প্রত্যেক কথাটাকে হলফ করিয়া প্রমাণ কবিতে হইবে? যাহারা বিশ্বাস করিবার জন্য—আনন্দ করিবাব জন্য আসিয়াছে, তাহাদিগকে এত ঠকাইবার আয়োজন কেন? তাহাবা নিজেব কল্পনাশক্তি বাড়িতে চাবি বন্ধ করিয়া আসে নাই। কতক তুমি বোঝাইবে, কতক তাহারা বুঝিবে. তোমাব সহিত তাহাদেব এইরূপ আপোষেব সম্বন্ধ।

দুষ্মন্ত গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়াইয়া সখীদেব সহিত শকুন্তলার কথাবার্ত্তা শুনিতেছেন। অতি উত্তম। কথাবার্ত্তা বেশ রসে জমাইয়া বলিয়া যাও! আস্ত গাছেব গুঁড়িটা আমার সম্মুখে উপস্থিত না থাকিলেও সেটা আমি ধরিয়া লইতে পারি—এতটুকু সৃজনশক্তি আমার আছে। দুষ্মন্ত-শকুন্তলা অনসূয়া-প্রিয়ংবদাব চবিত্রানুরূপ প্রত্যেক হাবভাব এবং কণ্ঠস্বরের প্রত্যেক ভঙ্গী একেবারে প্রত্যক্ষবৎ অনুমান কবিয়া লওয়া

শক্ত—সুতরাং সেগুলি যখন প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান দেখিতে পাই, তখন হৃদয় রসে অভিষিক্ত হয়—কিন্তু দুটো গাছ বা একটা ঘর বা একটা নদী কল্পনা করিয়া লওয়া কিছুই শক্ত নয়, সেটাও আমাদের হাতে না রাখিয়া চিত্রের দ্বারা উপস্থিত করিলে আমাদের প্রতি ঘোরতর অবিশ্বাস প্রকাশ করা হয়।

আমাদের দেশের যাত্রা আমার ঐজন্য ভালো লাগে। যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই। পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকূল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া উঠে। কাব্যরস, যেটা আসল জিনিষ, সেইটেই অভিনয়ের সাহায্যে ফোয়ারার মতো চারিদিকে দর্শকদের পুলকিত চিত্তের উপর ছড়াইয়া পড়ে। মালিনী যখন তাহার পুষ্পবিরল বাগানে ফুল খুঁজিয়া বেলা করিয়া দিতেছে, তখন সেটাকে সপ্রমাণ করিবার জন্য আসরের মধ্যে আস্ত আস্ত গাছ আনিয়া ফেলিবার কি দরকার আছে? একা মালিনীর মধ্যে সমস্ত বাগান আপনি জাগিয়া উঠে। তাই যদি না হইবে, তবে মালিনীরই বা কী গুণ, আর দর্শকগুলোই বা কাঠের মূর্ত্তির মতো কী করিতে বসিয়া আছে?

শকুন্তলার কবিকে যদি রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপটের কথা ভাবিতে হইত, তবে তিনি গোড়াতেই মৃগের পশ্চাতে রথ ছোটানো বন্ধ করিতেন। অবশ্য, তিনি বড়ো কবি—রথ বন্ধ হইলেই যে তাঁহার কলম বন্ধ হইত, তাহা নহে—কিন্তু আমি বলিতেছি, যেটা তুচ্ছ তাহার জন্য যাহা বড়ো তাহা কেন নিজেকে কোনো অংশে খর্ব্ব করিতে যাইবে? ভাবুকের চিত্তের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ আছে, সে রঙ্গমঞ্চে স্থানাভাব নাই। সেখানে যাদুকরের হাতে দৃশ্যপট আপনি রচিত হইতে থাকে। সেই মঞ্চ, সেই পটই নাট্যকরের লক্ষ্যস্থল, কোনো কৃত্রিম মঞ্চ ও কৃত্রিম পট কবিকল্পনার উপযুক্ত হইতে পারে না।

অতএব যখন দুষ্মন্ত ও সারথি একই স্থানে স্থির দাঁড়াইয়া বর্ণনা ও অভিনয়ের দ্বারা রথবেগের আলোচনা করেন, সেখানে দর্শক এই অতি সামান্য কথাটুকু অনায়াসেই ধরিয়া লন যে, মঞ্চ ছোটো, কিন্তু কাব্য ছোটো নয়,—অতএব কাব্যের খাতিরে মঞ্চের এই অনিবার্য ক্রটিকে প্রসন্নচিত্তে তাঁহারা মার্জ্জনা করেন এবং নিজের চিত্তক্ষেত্রকে সেই ক্ষুদ্রায়তনের মধ্যে প্রসারিত করিয়া দিয়া মঞ্চকেই মহীয়ান করিয়া তোলেন। কিন্তু মঞ্চের খাতিরে কাব্যকে যদি খাটো হইতে হইত, তবে ঐ কয়েকটা হতভাগ্য কাষ্ঠখণ্ডকে কে মাপ করিতে পারিত!

শকুন্তলা-নাটক বাহিরের চিত্রপটের কোনো অপেক্ষা রাখে নাই বলিয়া আপনার চিত্রপটগুলিকে আপনি সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। তাহার কণ্বাশ্রম, তাহার স্বর্গপথের মেঘলোক, তাহার মারীচের তপোবনের জন্য সে আর কাহারো উপর কোনো বরাত দেয় নাই। সে নিজেকে নিজে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। কী চরিত্রসৃজনে, কী স্বভাবচিত্রে নিজের কাব্যসম্পদের উপরেই তাহার একমাত্র নির্ভর।

আমরা অন্য প্রবন্ধে বলিয়াছি, য়ুরোপীয়ের বাস্তব সত্য নহিলে নয়। কল্পনা যে কেবল তাহাদের চিত্তরঞ্জন করিবে তাহা নয়, কাল্পনিককে অবিকল বাস্তবিকের মতো করিয়া বালকের মতো তাহাদিগকে ভুলাইবে। কেবল কাব্যরসের প্রাণদায়িনী বিশল্যকরণীটুকু হইলে চলিবে না, তাহার সঙ্গে বাস্তবিকতার আস্ত গন্ধমাদনটা পর্য্যন্ত চাই। এখন কলিযুগ, সুতরাং গন্ধমাদন টানিয়া আনিতে এঞ্জিনিয়ারিং চাই। তাহার ব্যয়ও সামান্য নহে। বিলাতের ষ্টেজে শুদ্ধমাত্র এই খেলার জন্য যে বাজে খরচ হয়, ভারতবর্ষের কত অভ্রভেদী দুর্ভিক্ষ তাহার মধ্যে তলাইয়া যাইতে পারে।

প্রাচ্যদেশের ক্রিয়া-কর্ম্ম খেলা-আনন্দ সমস্ত সরল-সহজ। কলাপাতায় আমাদের ভোজ সম্পন্ন হয় বলিয়া ভোজের যাহা প্রকৃততম আনন্দ—

অর্থাৎ বিশ্বকে অবাধিতভাবে নিজের ঘরটুকুর মধ্যে আমন্ত্রণ করিয়া আনা—সম্ভবপর হয়। আয়োজনের ভার যদি জটিল ও অতিরিক্ত হইত, তবে আসল জিনিষটাই মারা যাইত।

বিলাতের নকলে আমরা যে থিয়েটার করিয়াছি, তাহা ভারাক্রান্ত একটা স্ফীত পদার্থ। তাহাকে নড়ানো শক্ত, তাহাকে আপামর সকলের দ্বারের কাছে আনিয়া দেওয়া দুঃসাধ্য,—তাহাতে লক্ষ্মীর পেঁচাই সরস্বতীর পদ্মকে প্রায় আচ্ছন্ন করিয়া আছে। তাহাতে কবি ও গুণীর প্রতিভার চেয়ে ধনীর মূলধন ঢের বেশি থাকা চাই। দর্শক যদি বিলাতি ছেলে-মানুষিতে দীক্ষিত না হইয়া থাকে এবং অভিনেতার যদি নিজের প্রতি ও কাব্যের প্রতি যথার্থ বিশ্বাস থাকে, তবে অভিনয়ের চারিদিক্ হইতে তাহার বহুমূল্য বাজে জঞ্জালগুলো ঝাঁট দিয়া ফেলিয়া তাহাকে মুক্তিদান ও গৌরবদান করিলেই সহৃদয় হিন্দুসন্তানের মতো কাজ হয়। বাগানকে যে অবিকল বাগান আঁকিয়াই খাড়া করিতে হইবে এবং স্ত্রী-চরিত্র অকৃত্রিম স্ত্রীলোককে দিয়াই অভিনয় করাইতে হইবে, এইরূপ অত্যন্ত স্থূল বিলাতি বর্ব্বরতা পরিহার করিবার সময় আসিয়াছে।

মোটের উপরে বলা যাইতে পারে যে, জটিলতা অক্ষমতারই পরিচয়, বাস্তবিকতা কাঁচপোকার মতো আর্টের মধ্যে প্রবেশ করিলে তেলা-পোকার মতো তাহার অন্তরের সমস্ত রস নিঃশেষ করিয়া ফেলে এবং যেখানে অজীর্ণবশত যথার্থ রসের ক্ষুধার অভাব, সেখানে বহুমূল্য বাহ্য প্রাচুর্য্য ক্রমশই ভীষণ রূপে বাড়িয়া চলে—অবশেষে অন্নকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া চাটনিই স্তূপাকার হইয়া উঠে।

১৩০৯

পনেরো-আনা

যে লোক ধনী, ঘরের চেয়ে তাহার বাগান বড়ো হইয়া থাকে। ঘর অত্যাবশ্যক, বাগান অতিরিক্ত—না হইলেও চলে। সম্পদের উদারতা অনাবশ্যকেই আপনাকে সপ্রমাণ করে। ছাগলের যতটুকু শিং আছে, তাহাতে তাহার কাজ চলিয়া যায়, কিন্তু হরিণের শিঙের পনেরো আনা অনাবশ্যকতা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়া থাকি। ময়ূরের লেজ যে কেবল রঙচঙে জিতিয়াছে, তাহা নহে—তাহার বাহুল্যগৌরবে শালিক-খঞ্জন ফিঙার পুচ্ছ লজ্জায় অহরহ অস্থির।

যে মানুষ আপনার জীবনকে নিঃশেষে অত্যাবশ্যক করিয়া তুলিয়াছে, সে ব্যক্তি আদর্শপুরুষ সন্দেহ নাই, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহার আদর্শ অধিক লোকে অনুসরণ করে না,—যদি করিত তবে মনুষ্যসমাজ এমন একটি ফলের মতো হইয়া উঠিত, যাহার বীচিই সমস্তটা, শাঁস একেবারেই নাই। কেবলই যে লোক উপকার করে, তাহাকে ভালো না বলিয়া থাকিবার জো নাই, কিন্তু যে লোকটা বাহুল্য, মানুষ তাহাকে ভালোবাসে।

কারণ, বাহুল্যমানুষটি সর্ব্বতোভাবেই আপনাকে দিতে পারে। পৃথিবীর উপকারী মানুষ কেবল উপকারের সঙ্কীর্ণ দিক্ দিয়াই আমাদের একটা অংশকে স্পর্শ করে,—সে আপনার উপকারিতার মহৎ প্রাচীরের দ্বারা আর-সকল দিকেই ঘেরা, কেবল একটি দরজা খোলা, সেখানে আমরা হাত পাতি, সে দান করে। আর, আমাদের বাহুল্যলোকটি কোনো কাজের নহে, তাই তাহার কোনো প্রাচীর নাই। সে আমাদের

সহায় নহে, সে আমাদের সঙ্গীমাত্র। উপকারী লোকটির কাছ হইতে আমরা অর্জন করিয়া আনি, এবং বাহুল্যলোকটির সঙ্গে মিলিয়া আমরা খরচ করিয়া থাকি। যে আমাদের খরচ করিবার সঙ্গী, সেই আমাদের বন্ধু।

বিধাতার প্রসাদে হরিণের শিং ও ময়ূরের পুচ্ছের মতো সংসারে আমরা অধিকাংশ লোকই বাহুল্য, আমাদের অধিকাংশেরই জীবন জীবনচরিত লিখিবার যোগ্য নহে, এবং সৌভাগ্যক্রমে আমাদের অধিকাংশেরই মৃত্যুর পরে পাথরের মূর্ত্তি গড়িবার নিষ্ফল চেষ্টায় চাঁদার খাতা দ্বারে-দ্বারে কাঁদিয়া ফিরিবে না।

মরার পরে অল্প লোকেই অমর হইয়া থাকেন, সেইজন্যই পৃথিবীটা বাসযোগ্য হইয়াছে। ট্রেণের সব গাড়িই যদি রিজার্ভ গাড়ি হইত, তাহা হইলে সাধারণ প্যাসেঞ্জারদের গতি কী হইত? একে তো বড়ো লোকেরা একাই একশো—অর্থাৎ যতদিন বাঁচিয়া থাকেন, ততদিন অন্তত তাঁহাদের ভক্ত ও নিন্দুকের হৃদয়ক্ষেত্রে শতাধিক লোকের জায়গা জুড়িয়া থাকেন—তাহার পরে, আবার, মরিয়াও তাঁহারা স্থান ছাড়েন না। ছাড়া দূরে যাক্, অনেকে মরার সুযোগ লইয়া অধিকার বিস্তার করিয়াই থাকেন। আমাদের একমাত্র রক্ষা এই যে, ইঁহাদের সংখ্যা অল্প। নহিলে কেবল সমাধিস্তম্ভে সামান্য ব্যক্তিদের কুটীরের স্থান থাকিত না। পৃথিবী এত সঙ্কীর্ণ যে, জীবিতের সঙ্গে জীবিতকে জায়গার জন্যে লড়িতে হয়। জমির মধ্যেই হউক্ বা হৃদয়ের মধ্যেই হউক্, অন্য পাঁচজনের চেয়ে একটুখানি ফলাও অধিকার পাইবার জন্য কত লোকে জালজালিয়াতি করিয়া ইহকাল-পরকাল খোয়াইতে উদ্যত। এই যে জীবিতে-জীবিতে লড়াই, ইহা সমকক্ষের লড়াই, কিন্তু মৃতের সঙ্গে জীবিতের লড়াই বড়ো কঠিন। তাহারা এখন সমস্ত দুর্ব্বলতা, সমস্ত খণ্ডতার অতীত, তাহারা কল্পলোকবিহারী—আমরা মাধ্যাকর্ষণ, কৈশিকাকর্ষণ, এবং বহুবিধ

আকর্ষণবিকর্ষণের দ্বারা পীড়িত মর্ত্ত্যমানুষ, আমরা পারিয়া উঠিব কেন ? এইজন্যই বিধাতা অধিকাংশ মৃতকেই বিস্মৃতিলোকে নির্ব্বাসন দিয়া থাকেন,—সেখানে কাহারো স্থানাভাব নাই। বিধাতা যদি বড়ো-বড়ো মৃতের আওতায় আমাদের মতো ছোটো-ছোটো জীবিতকে নিতান্ত বিমর্ষ-মলিন, নিতান্তই কোণঘেঁষা করিয়া রাখিবেন, তবে পৃথিবীকে এমন উজ্জ্বল সুন্দর করিলেন কেন, মানুষের হৃদয়টুকু মানুষের কাছে এমন একান্তলোভনীয় হইল কী কারণে ?

নীতিজ্ঞেরা আমাদিগকে নিন্দা করেন। বলেন, আমাদের জীবন বৃথা গেল। তাঁহারা আমাদিগকে তাড়না করিয়া বলিতেছেন—ওঠো, জাগো, কাজ করো, সময় নষ্ট করিয়ো না।

কাজ না করিয়া অনেকে সময় নষ্ট করে সন্দেহ নাই—কিন্তু কাজ করিয়া যাহারা সময় নষ্ট করে, তাহারা কাজও নষ্ট করে, সময়ও নষ্ট করে। তাহাদের পদভারে পৃথিবী কম্পান্বিত এবং তাহাদেরই সচেষ্টতার হাত হইতে অসহায় সংসারকে রক্ষা করিবার জন্য বলিয়াছেন—"সম্ভবামি যুগে যুগে।"

জীবন বৃথা গেল। বৃথা যাইতে দাও। অধিকাংশ জীবন বৃথা যাইবার জন্য হইয়াছে। এই পনেরো-আনা অনাবশ্যক জীবনই বিধাতার ঐশ্বর্য্য সপ্রমাণ করিতেছে। তাঁহার জীবনভাণ্ডারে যে দৈন্য নাই, ব্যর্থ প্রাণ আমরাই তাহার অগণ্য সাক্ষী। আমাদের অফুরাণ অজস্রতা, আমাদের অহেতুক বাহুল্য দেখিয়া বিধাতার মহিমা স্মরণ করো। বাঁশি যেমন আপন শূন্যতার ভিতর দিয়া সঙ্গীত প্রচার করে, আমরা সংসারের পনেরো-আনা আমাদের ব্যর্থতার দ্বারা বিধাতার গৌরব ঘোষণা করিতেছি। বুদ্ধ আমাদের জন্যই সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, খৃষ্ট আমাদের জন্য প্রাণ দিয়াছেন, ঋষিরা আমাদের জন্য তপস্যা করিয়াছেন, এবং সাধুরা আমাদের জন্য জাগ্রত রহিয়াছেন।

জীবন বৃথা গেল। যাইতে দাও। কারণ, যাওয়া চাই। যাওয়াটাই একটা সার্থকতা। নদী চলিতেছে—তাহার সকল জলই আমাদের স্নানে এবং পানে এবং আমন ধানের ক্ষেতে ব্যবহার হইয়া যায় না। তাহার অধিকাংশ জলই কেবল প্রবাহ রাখিতেছে। আর কোনো কাজ না করিয়া কেবল প্রবাহরক্ষা করিবার একটা বৃহৎ-সার্থকতা আছে। তাহার যে জল আমরা খাল কাটিয়া পুকুরে আনি, তাহাতে স্নান করা চলে, কিন্তু তাহা পান করি না, তাহার যে জল ঘটে করিয়া আনিয়া আমরা জালায় ভরিয়া রাখি, তাহা পান করা চলে, কিন্তু তাহার উপরে আলো-ছায়ার উৎসব হয় না। উপকারকেই একমাত্র সাফল্য বলিয়া জ্ঞান করা কৃপণতার কথা, উদ্দেশ্যকেই একমাত্র পরিণাম বলিয়া গণ্য করা দীনতার পরিচয়।

আমরা সাধারণ পনেরো-আনা, আমরা নিজেদের যেন হেয় বলিয়া না জ্ঞান করি। আমরাই সংসারের গতি। পৃথিবীতে, মানুষের হৃদয়ে আমাদের জীবনস্বত্ব। আমরা কিছুতেই দখল রাখি না, আঁকড়িয়া থাকি না, আমরা চলিয়া যাই। সংসারের সমস্ত কলগান আমাদের দ্বারা ধ্বনিত, সমস্ত ছায়ালোক আমাদের উপরেই স্পন্দমান। আমরা যে হাসি, কাঁদি, ভালোবাসি, বন্ধুর সঙ্গে অকারণ খেলা করি; স্বজনের সঙ্গে অনাবশ্যক আলাপ করি, দিনের অধিকাংশ সময়ই চারিপাশের লোকের সহিত উদ্দেশ্যহীনভাবে যাপন করি, তার পরে ধুম করিয়া ছেলের বিবাহ দিয়া তাহাকে আপিসে প্রবেশ করাইয়া পৃথিবীতে কোনো খ্যাতি না রাখিয়া মরিয়া-পুড়িয়া ছাই হইয়া যাই—আমরা বিপুল সংসারের বিচিত্র তরঙ্গলীলার অঙ্গ, আমাদের ছোটোখাটো হাসি-কৌতুকেই সমস্ত জনপ্রবাহ ঝল্‌মল্‌ করিতেছে, আমাদের ছোটোখাটো আলাপে-বিলাপে সমস্ত সমাজ মুখরিত।

আমরা যাহাকে ব্যর্থ বলি, প্রকৃতির অধিকাংশই তাই। সূর্য্য-

কিরণের বেশির ভাগ শূন্যে বিকীর্ণ হয়, গাছের মুকুল অতি অল্পই ফল পর্য্যন্ত টিঁকে। কিন্তু সে যাঁহার ধন তিনিই বুঝিবেন। সে ব্যয় অপব্যয় কি না, বিশ্বকর্ম্মার খাতা না দেখিলে তাহার বিচার করিতে পারি না। আমরাও তেম্নি অধিকাংশই পরস্পরকে সঙ্গদান ও গতিদান ছাড়া আর কোনো কাজে লাগি না, সেজন্য নিজেকে ও অন্যকে কোনো দোষ না দিয়া, ছট্‌ফট্‌ না করিয়া, প্রফুল্ল হাস্যে ও প্রসন্নগানে সহজেই অখ্যাত অবসানের মধ্যে যদি শান্তিলাভ করি, তাহা হইলেই সেই উদ্দেশ্যহীনতার মধ্যেই যথার্থভাবে জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারি।

বিধাতা যদি আমাকে ব্যর্থ করিয়াই সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে আমি ধন্য; কিন্তু যদি উপদেষ্টার তাড়নায় আমি মনে করি আমাকে উপকার করিতেই হইবে, কাজে লাগিতেই হইবে, তবে যে উৎকট ব্যর্থতার সৃষ্টি করি, তাহা আমার স্বকৃত। তাহার জবাবদিহী আমাকে করিতে হইবে। পরের উপকার করিতে সকলেই জন্মাই নাই—অতএব উপকার না করিলে লজ্জা নাই। মিশনারী হইয়া চীন উদ্ধার করিতে না-ই গেলাম,—দেশে থাকিয়া শেয়াল শিকার করিয়া ও ঘোড়দৌড়ে জুয়া খেলিয়া দিন-কাটানোকে যদি ব্যর্থতা বলো, তবে তাহা চীন-উদ্ধারচেষ্টার মতো এমন লোমহর্ষক নিদারুণ ব্যর্থতা নহে।

সকল ঘাস ধান হয় না। পৃথিবীতে ঘাসই প্রায় সমস্ত, ধান অল্পই। কিন্তু ঘাস যেন আপনার স্বাভাবিক নিষ্ফলতা লইয়া বিলাপ না করে—সে যেন স্মরণ করে যে, পৃথিবীর শুষ্কধূলিকে সে শ্যামলতার দ্বারা আচ্ছন্ন করিতেছে, রৌদ্রতাপকে সে চিরপ্রসন্ন স্নিগ্ধতার দ্বারা কোমল করিয়া লইতেছে। বোধ করি ঘাসজাতির মধ্যে কুশতৃণ গায়ের জোরে ধান্য হইবার চেষ্টা করিয়াছিল—বোধ করি সামান্য ঘাস হইয়া না থাকিবার জন্য, পরের প্রতি একান্ত মনোনিবেশ করিয়া জীবনকে সার্থক করিবার জন্য তাহার মধ্যে অনেক উত্তেজনা জন্মিয়াছিল—তবু সে ধান্য হইল না।

কিন্তু সর্ব্বদা পরের প্রতি তাহার তীক্ষ্ণলক্ষ্য নিবিষ্ট করিবার একাগ্র চেষ্টা কিরূপ, তাহা পরই বুঝিতেছে। মোটের উপর এ কথা বলা যাইতে পারে যে, এরূপ উগ্র পরপরায়ণতা বিধাতার অভিপ্রেত নহে। ইহা অপেক্ষা সাধারণ তৃণের খ্যাতিহীন, স্নিগ্ধ-সুন্দর, বিনম্র-কোমল নিষ্ফলতা ভালো।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে মানুষ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—পনেরো-আনা এবং বাকী এক-আনা। পনেরো-আনা শান্ত এবং এক-আনা অশান্ত। পনেরো-আনা অনাবশ্যক এবং এক-আনা আবশ্যক। বাতাসে চলনশীল জ্বলনধর্ম্মী অক্সিজেনের পরিমাণ অল্প, স্থির শান্ত নাইট্রোজেনই অনেক। যদি তাহার উল্টা হয়, তবে পৃথিবী জ্বলিয়া ছাই হয়। তেমনি সংসারে যদি কোনো-একদল পনেরো-আনা, এক আনার মতোই অশান্ত ও আবশ্যক হইয়া উঠিবার উপক্রম করে, তখন জগতে আর কল্যাণ নাই, তখন যাহাদের অদৃষ্টে মরণ আছে, তাহাদিগকে মরিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

১৩০৯।

বসন্তযাপন

এই মাঠের পরে শালবনের নূতন কচিপাতার মধ্য দিয়া বসন্তের হাওয়া দিয়াছে।

অভিব্যক্তির ইতিহাসে মানুষের একটা অংশ তো গাছপালার সঙ্গে জড়ানো আছে। কোনো এক সময়ে আমরা যে শাখামৃগ ছিলাম, আমাদের প্রকৃতিতে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাহারও

অনেক আগে কোনো এক আদিযুগে আমরা নিশ্চয়ই শাখী ছিলাম, তাহা কি ভুলিতে পারিয়াছি? সেই আদিকালের জনহীন মধ্যাহ্নে আমাদের ডালপালার মধ্যে বসন্তের বাতাস কাহাকেও কোনো খবর না দিয়া যখন হঠাৎ হুহু করিয়া আসিয়া পড়িত, তখন কি আমরা প্রবন্ধ লিখিয়াছি, না, দেশের উপকার করিতে বাহির হইয়াছি? তখন আমরা সমস্ত দিন খাড়া দাঁড়াইয়া মূকের মতো মূঢ়ের মতো কাঁপিয়াছি—আমাদের সর্ব্বাঙ্গ ঝর্‌ঝর্ মর্‌মর্ করিয়া পাগলের মতো গান গাহিয়াছে—আমাদের শিকড় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রশাখাগুলির কচি-ডগা পর্য্যন্ত রসপ্রবাহে ভিতরে ভিতরে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সেই আদিকালের ফাল্গুন-চৈত্র এম্‌নি-তরো রসে-ভরা আলস্যে এবং অর্থহীন প্রলাপেই কাটিয়া যাইত। সেজন্য কাহারো কাছে কোনো জবাবদিহি ছিল না।

যদি বলো, অনুতাপের দিন তাহার পরে আসিত—বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের খরা চুপ করিয়া মাথা পাতিয়া লইতে হইত—সে কথা মানি। যে-দিনকার যাহা, সেদিনকার তাহা এম্‌নি করিয়াই গ্রহণ করিতে হয়। রসের দিনে ভোগ, দাহের দিনে ধৈর্য্য যদি সহজে আশ্রয় করা যায়, তবে সান্ত্বনার বর্ষাধারা যখন দশদিক্ পূর্ণ করিয়া ঝরিতে আরম্ভ করে, তখন তাহা মজ্জায় মজ্জায় পূরাপূরি টানিয়া লইবার সামর্থ্য থাকে।

কিন্তু এ-সব কথা বলিবার অভিপ্রায় আমার ছিল না। লোকে সন্দেহ করিতে পারে, রূপক আশ্রয় করিয়া আমি উপদেশ দিতে বসিয়াছি। সন্দেহ একেবারেই অমূলক বলা যায় না। অভ্যাস খারাপ হইয়া গেছে।

আমি এই বলিতেছিলাম যে, অভিব্যক্তির শেষ কোঠায় আসিয়া পড়াতে মানুষের মধ্যে অনেক ভাগ ঘটিয়াছে। জড়ভাগ, উদ্ভিদ্‌ভাগ, পশুভাগ, বর্ব্বরভাগ, সভ্যভাগ, দেবভাগ ইত্যাদি। এই ভিন্ন ভিন্ন ভাগের এক-একটা বিশেষ জন্মঋতু আছে। কোন্ ঋতুতে কোন্ ভাগ পড়ে, তাহা

নির্ণয় করিবার ভার আমি লইব না। একটা সিদ্ধান্তকে শেষ পর্য্যন্ত মিলাইয়া দিব পণ করিলে বিস্তর মিথ্যা বলিতে হয়। বলিতে রাজি আছি, কিন্তু এত পরিশ্রম আজ পারিব না।

আজ, পড়িয়া-পড়িয়া, সমুখে চাহিয়া-চাহিয়া যেটুকু সহজে মনে আসিতেছে, সেইটুকুই লিখিতে বসিয়াছি।

দীর্ঘ শীতের পর আজ মধ্যাহ্নে প্রান্তরের মধ্যে নববসন্ত নিশ্বসিত হইয়া উঠিতেই নিজের মধ্যে মনুষ্যজীবনের ভারি একটা অসামঞ্জস্য অনুভব করিতেছি। বিপুলের সহিত, সমগ্রের সহিত তাহার সুর মিলিতেছে না। শীতকালে আমার উপরে পৃথিবীর যে সমস্ত তাগিদ্ ছিল, আজও ঠিক সেই সব তাগিদ্ই চলিতেছে। ঋতু বিচিত্র, কিন্তু কাজ সেই একই। মনটাকে ঋতুপরিবর্ত্তনের উপরে জয়ী করিয়া তাহাকে অসাড় করিয়া যেন মস্ত একটা কী বাহাদুরী আছে। মন মস্ত লোক—সে কী না পারে। সে দক্ষিণে হাওয়াকেও সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া হনহন করিয়া বড়োবাজারে ছুটিয়া চলিয়া যাইতে পারে। পারে স্বীকার করিলাম, কিন্তু তাই বলিয়াই কি সেটা তাহাকে করিতেই হইবে। তাহাতে দক্ষিণে বাতাস বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবে না, কিন্তু ক্ষতিটা কাহার হইবে?

এই তো অল্পদিন হইল, আমাদের আমলকী-মণ্ডপ ও শালের ডাল হইতে খস্‌খস্ করিয়া কেবলি পাতা খসিয়া পড়িতেছিল—ফাল্গুন দূরাগত পথিকের মতো যেম্‌নি দ্বারের কাছে আসিয়া একটা হাঁপ ছাড়িয়া বসিয়াছে মাত্র, অম্‌নি আমাদের বনশ্রেণী পাতাখসানোর কাজ বন্ধ করিয়া দিয়া একেবারে রাতারাতিই কিসলয় গজাইতে সুরু করিয়া দিয়াছে।

আমরা মানুষ, আমাদের সেটি হইবার জো নাই। বাহিরে চারিদিকেই যখন হাওয়া বদল, পাতা বদল, রং বদল, আমরা তখনও

গরুর গাড়ির বাহনটার মতো পশ্চাতে পুরাতনের ভারাক্রান্ত জের সমান-ভাবে টানিয়া লইয়া একটানা রাস্তায় ধুলা উড়াইয়া চলিয়াছি। বাহক তখনো যে লড়ি লইয়া পাঁজরে ঠেলিতেছিল, এখনো সেই লড়ি।

হাতের কাছে পঞ্জিকা নাই—অনুমানে বোধ হইতেছে, আজ ফাল্গুনের প্রায় ১৫ই কি ১৬ই হইবে—বসন্তলক্ষ্মী আজ ষোড়শী কিশোরী। কিন্তু তবু আজও হপ্তায় হপ্তায় খবরের কাগজ বাহির হইতেছে—পড়িয়া দেখি, আমাদের কর্তৃপক্ষ আমাদের হিতের জন্য আইন তৈরি করিতে সমানই ব্যস্ত এবং অপর পক্ষ তাহারই তন্নতন্ন বিচারে প্রবৃত্ত। বিশ্বজগতে এইগুলাই যে সর্ব্বোচ্চ ব্যাপার নয়—বড়োলাট-ছোটোলাট, সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের উৎকট ব্যস্ততাকে কিছুমাত্র গণ্য না করিয়া দক্ষিণসমুদ্রের তরঙ্গোৎসবসভা হইতে প্রতি-বৎসরের সেই চিরন্তন বার্ত্তাবহ নবজীবনের আনন্দসমাচার লইয়া ধরাতলে অক্ষয় প্রাণের আশ্বাস নূতন করিয়া প্রচার করিতে বাহির হয়, এটা মানুষের পক্ষে কম কথা নয়, কিন্তু এ-সব কথা ভাবিবার জন্য আমাদের ছুটি নাই।

সেকালে আমাদের মেঘ ডাকিলে অনধ্যায় ছিল,—বর্ষার সময় প্রবাসীরা বাড়ি ফিরিয়া আসিতেন। বাদলার দিনে যে পড়া যায় না, বা বর্ষার সময় বিদেশে কাজ করা অসম্ভব, এ কথা বলিতে পারি না—মানুষ স্বাধীন স্বতন্ত্র, মানুষ জড়প্রকৃতির আঁচলধরা নয়। কিন্তু জোর আছে বলিয়াই বিপুল প্রকৃতির সঙ্গে ক্রমাগত বিদ্রোহ করিয়াই চলিতে হইবে, এমন কী কথা আছে। বিশ্বের সহিত মানুষ নিজের কুটুম্বিতা স্বীকার করিলে, আকাশে নবনীলাঞ্জন মেঘোদয়ের খাতিরে পড়া বন্ধ ও কাজ বন্ধ করিলে, দক্ষিণ হাওয়ার প্রতি একটুখানি শ্রদ্ধা রক্ষা করিয়া আইনের সমালোচনা বন্ধ রাখিলে মানুষ জগৎচরাচরের মধ্যে একটা

আলেখ্যের দ্বারা মন্দিরকে বেষ্টন করিয়া আছে। এই ছবিগুলির মধ্যে আর কোনো উদ্দেশ্য দেখি না, কেবল এই সংসার যেমনভাবে চলিতেছে, তাহাই আঁকিবার চেষ্টা। সুতরাং চিত্রশ্রেণীর ভিতরে এমন অনেক জিনিষ চোখে পড়ে, যাহা দেবালয়ে অঙ্কনযোগ্য বলিয়া হঠাৎ মনে হয় না। ইহার মধ্যে বাছাবাছি কিছুই নাই—তুচ্ছ এবং মহৎ, গোপনীয় এবং ঘোষণীয়, সমস্তই আছে।

কোনো গির্জ্জার মধ্যে গিয়া যদি দেখিতাম, সেখানে দেয়ালে ইংরেজ-সমাজের প্রতিদিনের ছবি ঝুলিতেছে:—কেহ খানা খাইতেছে, কেহ ডগ্‌কার্ট হাঁকাইতেছে, কেহ হুইষ্ট্ খেলিতেছে, কেহ পিয়ানো বাজাইতেছে, কেহ সঙ্গিনীকে বাহুপাশে বেষ্টন করিয়া পল্কা নাচিতেছে, তবে হতবুদ্ধি হইয়া ভাবিতাম, বুঝি বা স্বপ্ন দেখিতেছি—কারণ গির্জ্জা সংসারকে সর্ব্বতোভাবে মুছিয়া-ফেলিয়া আপন স্বর্গীয়তা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। মানুষ সেখানে লোকালয়ের বাহিরে আসে—তাহা যেন যথাসম্ভব মর্ত্ত্যসংস্পর্শবিহীন দেবলোকের আদর্শ।

তাই, ভুবনেশ্বর-মন্দিরের চিত্রাবলীতে প্রথমে মনে বিস্ময়ের আঘাত লাগে। স্বভাবত হয়তো লাগিত না, কিন্তু আশৈশব শিক্ষায় আমরা স্বর্গমর্ত্ত্যকে মনে মনে ভাগ করিয়া রাখিয়াছি। সর্ব্বদাই সন্তর্পণে ছিলাম, পাছে দেব-আদর্শে মানবভাবের কোনো আঁচ লাগে, পাছে দেবমানবের মধ্যে যে পরমপবিত্র সুদূর ব্যবধান, ক্ষুদ্র মানব তাহা লেশমাত্র লঙ্ঘন করে।

এখানে মানুষ দেবতার একেবারে যেন গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে—তাও যে ধূলা ঝাড়িয়া আসিয়াছে, তাও নয়। গতিশীল, কর্ম্মরত, ধূলিলিপ্ত সংসারের প্রতিকৃতি নিঃসঙ্কোচে সমুচ্চ হইয়া উঠিয়া দেবতার প্রতিমূর্ত্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে।

মন্দিরের ভিতরে গেলাম—সেখানে একটিও চিত্র নাই, আলোক

নাই, অনলঙ্কৃত নিভৃত অস্ফুটতার মধ্যে দেবমূর্ত্তি নিস্তব্ধ বিরাজ করিতেছে।

ইহার একটি বৃহৎ অর্থ মনে উদয় না হইয়া থাকিতে পারে না। মানুষ এই প্রস্তরের ভাষায় যাহা বলিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহা সেই বহু দূরকাল হইতে আমার মনের মধ্যে ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

সে কথা এই—দেবতা দূরে নাই, গির্জ্জায় নাই, তিনি আমাদের মধ্যেই আছেন। তিনি জন্মমৃত্যু, সুখদুঃখ, পাপপুণ্য, মিলনবিচ্ছেদের মাঝখানে স্তব্ধভাবে বিরাজমান। এই সংসারই তাঁহার চিরন্তন মন্দির। এই সজীব-সচেতন বিপুল দেবালয় অহরহ বিচিত্র হইয়া রচিত হইয়া উঠিতেছে। ইহা কোনোকালে নূতন নহে, কোনোকালে পুরাতন হয় না। ইহার কিছুই স্থির নহে, সমস্তই নিয়ত পরিবর্ত্তমান—অথচ ইহার মহৎ ঐক্য, ইহার সত্যতা, ইহার নিত্যতা নষ্ট হয় না, কারণ এই চঞ্চল বিচিত্রের মধ্যে এক নিত্যসত্য প্রকাশ পাইতেছেন।

ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব মানবকে বড়ো করিয়াছিলেন। তিনি জাতি মানেন নাই, যাগযজ্ঞের অবলম্বন হইতে মানুষকে মুক্তি দিয়াছিলেন, দেবতাকে মানুষের লক্ষ্য হইতে অপসৃত করিয়াছিলেন। তিনি মানুষের আত্মশক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। দয়া এবং কল্যাণ তিনি স্বর্গ হইতে প্রার্থনা করেন নাই, মানুষের অন্তর হইতে তাহা তিনি আহ্বান করিয়াছিলেন।

এম্‌নি করিয়া শ্রদ্ধার দ্বারা, ভক্তির দ্বারা মানুষের অন্তরের জ্ঞান, শক্তি ও উদ্যমকে তিনি মহীয়ান্ করিয়া তুলিলেন। মানুষ যে দীন দৈবাধীন হীনপদার্থ নহে, তাহা তিনি ঘোষণা করিলেন।

এমন সময় হিন্দুর চিত্ত জাগ্রত হইয়া কহিল—সে কথা যথার্থ—মানুষ দীন নহে, হীন নহে; কারণ, মানুষের যে শক্তি—যে শক্তি মানুষের মুখে ভাষা দিয়াছে, মনে ধী দিয়াছে, বাহুতে নৈপুণ্য দিয়াছে,

যাহা সমাজকে গঠিত করিতেছে, সংসারকে চালনা করিতেছে, তাহাই দৈবী শক্তি।

বুদ্ধদেব যে অভ্রভেদী মন্দির রচনা করিলেন, নবপ্রবুদ্ধ হিন্দু তাহারই মধ্যে তাঁহার দেবতাকে লাভ করিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত হইয়া গেল। মানবের মধ্যে দেবতার প্রকাশ, সংসারের মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠা, আমাদের প্রতিমুহূর্ত্তের সুখদুঃখের মধ্যে দেবতার সঞ্চার, ইহাই নবহিন্দুধর্ম্মের মর্ম্মকথা হইয়া উঠিল। শাক্তের শক্তি, বৈষ্ণবের প্রেম ঘরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল—মানুষের ক্ষুদ্র কাজেকর্ম্মে শক্তির প্রত্যক্ষ হাত, মানুষের স্নেহপ্রীতির সম্বন্ধের মধ্যে দিব্যপ্রেমের প্রত্যক্ষ লীলা অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখা দিল। এই দেবতার আবির্ভাবে ছোটো-বড়োর ভেদ ঘুচিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সমাজে যাহারা ঘৃণিত ছিল, তাহারাও দৈবশক্তির অধিকারী বলিয়া অভিমান করিল—প্রাকৃত পুরাণগুলিতে তাহার ইতিহাস রহিয়াছে।

উপনিষদে একটি মন্ত্র আছে—

"বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ—"

যিনি এক, তিনি আকাশে বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া আছেন। ভুবনেশ্বরের মন্দির সেই মন্ত্রকেই আর একটু বিশেষভাবে এই বলিয়া উচ্চারণ করিতেছে—যিনি এক, তিনি এই মানবসংসারের মধ্যে স্তব্ধ হইয়া আছেন। জন্মমৃত্যুর যাতায়াত আমাদের চোখের উপর দিয়া কেবলি আবর্ত্তিত হইতেছে, সুখদুঃখ উঠিতেছে-পড়িতেছে, পাপ-পুণ্য আলোকে ছায়ায় সংসারভিত্তি খচিত করিয়া দিতেছে, সমস্ত বিচিত্র—সমস্ত চঞ্চল, —ইহারই অন্তরে নিরলঙ্কার নিভৃত, সেখানে যিনি এক, তিনিই বর্ত্তমান। এই অস্থির-সমুদয়, যিনি স্থির তাঁহারই শান্তিনিকেতন,—এই পরিবর্ত্তনপরম্পরা, যিনি নিত্য তাঁহারই চিরপ্রকাশ। দেবমানব, স্বর্গমর্ত্ত্য, বন্ধন ও মুক্তির এই অনন্ত সামঞ্জস্য—ইহাই প্রস্তরের ভাষায় ধ্বনিত।

উপনিষদ্‌ এইরূপ কথাই একটি উপমায় প্রকাশ করিয়াছেন—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥"

দুই সুন্দর পক্ষী একত্র সংযুক্ত হইয়া একবৃক্ষে বাস করিতেছে। তাহার মধ্যে একটি স্বাদু পিপ্পল আহার করিতেছে, অপরটি অনশনে থাকিয়া তাহা দেখিতেছে।

জীবাত্মা-পরমাত্মার এরূপ সাযুজ্য, এরূপ সারূপ্য, এরূপ সালোক্য এত অনায়াসে, এত সহজ উপমায়, এমন সরল সাহসের সহিত আর কোথায় বলা হইয়াছে। জীবের সহিত ভগবানের সুন্দর সাম্য যেন কেহ প্রত্যক্ষ চোখের উপর দেখিয়া কথা কহিয়া উঠিয়াছে—সেইজন্য তাহাকে উপমার জন্য আকাশ-পাতাল হাতড়াইতে হয় নাই।—অরণ্যচারী কবি বনের দুটি সুন্দর ডানাওয়ালা পাখীর মতো করিয়া সসীমকে ও অসীমকে গায়ে-গায়ে মিলাইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছেন, কোনো প্রকাণ্ড উপমার ঘটা করিয়া এই নিগূঢ় তত্ত্বকে বৃহৎ করিয়া তুলিবার চেষ্টামাত্র করেন নাই। দুটি ছোটো পাখী যেমন স্পষ্টরূপে গোচর, যেমন সুন্দরভাবে দৃশ্যমান, তাহার মধ্যে নিত্য পরিচয়ের সরলতা যেমন একান্ত, কোনো বৃহৎ উপমায় এমনটি থাকিত না। উপমাটি ক্ষুদ্র হইয়াই সত্যটিকে বৃহৎ করিয়া প্রকাশ করিয়াছে—বৃহৎ সত্য-দ্রষ্টার যে নিশ্চিন্ত সাহস, তাহা ক্ষুদ্র সরল উপমাতেই যথার্থভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

ইহারা দুটি পাখী, ডানায়-ডানায় সংযুক্ত হইয়া আছে—ইহারা সখা, ইহারা একবৃক্ষেই পরিষক্ত—ইহার মধ্যে একজন ভোক্তা, আর একজন সাক্ষী, একজন চঞ্চল, আর একজন স্তব্ধ।

ভুবনেশ্বরের মন্দিরও যেন এই মন্ত্র বহন করিতেছে—তাহা দেবালয়

হইতে মানবত্বকে মুছিয়া ফেলে নাই—তাহা দুই পাখীকে একত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

কিন্তু ভুবনেশ্বরের মন্দিরে আরো যেন একটু বিশেষত্ব আছে। ঋষিকবির উপমার মধ্যে নিভৃত অরণ্যের একান্ত নির্জ্জনতার ভাবটুকু রহিয়া গেছে। এই উপমার দৃষ্টিতে প্রত্যেক জীবাত্মা যেন একাকিরূপেই পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত। ইহাতে যে ধ্যানচ্ছবি মনে আনে, তাহাতে দেখিতে পাই যে, যে-আমি ভোগ করিতেছি, ভ্রমণ করিতেছি সেই-আমির মধ্যে শান্তং শিবমদ্বৈতম স্তব্ধভাবে আবির্ভূত।

কিন্তু এই একের-সহিত-একের সংযোগ ভুবনেশ্বরের-মন্দিরে লিখিত নহে। সেখানে সমস্ত মানুষ তাহার সমস্ত কর্ম্ম, সমস্ত ভোগ লইয়া, তাহার তুচ্ছবৃহৎ সমস্ত ইতিহাস বহন করিয়া, সমগ্রভাবে এক হইয়া আপনার মাঝখানে অন্তরতররূপে, সাক্ষিরূপে, ভগবান্‌কে প্রকাশ করিতেছে। নির্জ্জনে নহে—যোগে নহে—সজনে কর্ম্মের মধ্যে। তাহা সংসারকে, লোকালয়কে দেবালয় করিয়া ব্যক্ত করিয়াছে—তাহা সমষ্টিরূপে মানবকে দেবত্বে অভিষিক্ত করিয়াছে। তাহা প্রথমত ছোটো-বড়ো সমস্ত মানবকে আপনার প্রস্তরপটে এক করিয়া সাজাইয়াছে, তাহার পর দেখাইয়াছে, পরম ঐক্যটি কোন্‌খানে, তিনি কে। এই ভূমা ঐক্যের অন্তরতর আবির্ভাবে প্রত্যেক মানব সমগ্র মানবের সহিত মিলিত হইয়া মহীয়ান্‌। পিতার সহিত পুত্র, ভ্রাতার সহিত ভ্রাতা, পুরুষের সহিত স্ত্রী, প্রতিবেশীর সহিত প্রতিবেশী, এক জাতির সহিত অন্য জাতি, এককালের সহিত অন্য কাল, এক ইতিহাসের সহিত অন্য ইতিহাস দেবতাত্মাদ্বারা একাত্ম হইয়া উঠিয়াছে।

১৩১০

পাগল

পশ্চিমের একটি ছোটো শহর। সম্মুখে বড়োরাস্তার পরপ্রান্তে খোড়ো চালগুলার উপরে পাঁচ-ছয়টা তালগাছ বোবার ইঙ্গিতের মতো আকাশে উঠিয়াছে, এবং পোড়ো বাড়ির ধারে প্রাচীন তেঁতুলগাছ তাহার লঘুচিক্কণ ঘন পল্লবভার, সবুজ মেঘের মতো, স্তূপে স্তূপে স্ফীত করিয়া রহিয়াছে। চালশূন্য ভাঙা ভিটার উপরে ছাগলছানা চরিতেছে। পশ্চাতে মধ্যাহ্ন-আকাশের দিগন্তরেখা পর্য্যন্ত বনশ্রেণীর শ্যামলতা।

আজ এই শহরটির মাথার উপর হইতে বর্ষা হঠাৎ তাহার কালো অবগুণ্ঠন একেবারে অপসারিত করিয়া দিয়াছে।

আমার অনেক জরুরী লেখা পড়িয়া আছে—তাহারা পড়িয়াই রহিল। জানি, তাহা ভবিষ্যতে পরিতাপের কারণ হইবে, তা হউক্, সেটুকু স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। পূর্ণতা কোন্ মূর্ত্তি ধরিয়া হঠাৎ কখন আপনার আভাস দিয়া যায়, তাহা তো আগে হইতে কেহ জানিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিতে পারে না—কিন্তু যখন সে দেখা দিল, তখন তাহাকে শুধুহাতে অভ্যর্থনা করা যায় না। তখন লাভক্ষতির আলোচনা যে করিতে পারে, সে খুব হিসাবী লোক—সংসারে তাহার উন্নতি হইতে থাকিবে—কিন্তু হে নিবিড় আষাঢ়ের মাঝখানে একদিনের জ্যোতির্ম্ময় অবকাশ, তোমার শুভ্র মেঘমাল্যখচিত ক্ষণিক অভ্যুদয়ের কাছে আমার সমস্ত জরুরী কাজ আমি মাটি করিলাম—আজ আমি ভবিষ্যতের হিসাব করিলাম না—আজ আমি বর্ত্তমানের কাছে বিকাইলাম!

দিনের পর দিন আসে, আমার কাছে তাহারা বিশেষ কিছুই দাবী করে না ;—তখন হিসাবের অঙ্কে ভুল হয় না, তখন সকল কাজই সহজে করা যায়। জীবনটা তখন একদিনের সঙ্গে আর-একদিন, এক কাজের সঙ্গে আর-এক কাজ দিয়া গাঁথিয়া-গাঁথিয়া অগ্রসর হয়, সমস্ত বেশ সমান ভাবে চলিতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ কোনো খবর না দিয়া একটা বিশেষ দিন সাতসমুদ্রপারের রাজপুত্রের মতো আসিয়া উপস্থিত হয়, প্রতিদিনের সঙ্গে তাহার কোনো মিল হয় না—তখন মুহূর্তের মধ্যে এতদিনকার সমস্ত 'খেই' হারাইয়া যায়—তখন বাঁধা-কাজের পক্ষে বড়োই মুস্কিল ঘটে।

কিন্তু এই দিনই আমাদের বড়োদিন, এই অনিয়মের দিন, এই কাজ নষ্ট করিবার দিন। যে দিনটা আসিয়া আমাদের প্রতিদিনকে বিপর্যস্ত করিয়া দেয়—সেই দিন আমাদের আনন্দ। অন্যদিনগুলো বুদ্ধিমানের দিন, সাবধানের দিন,—আর এক-একটা দিন পুরা পাগলামির কাছে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ-করা।

পাগলশব্দটা আমাদের কাছে ঘৃণার শব্দ নহে। ক্ষ্যাপা নিমাইকে আমরা ক্ষ্যাপা বলিয়া ভক্তি করি—আমাদের ক্ষ্যাপা-দেবতা মহেশ্বর। প্রতিভা ক্ষ্যাপামির একপ্রকার বিকাশ কিনা, এ কথা লইয়া য়ুরোপে বাদানুবাদ চলিতেছে—কিন্তু আমরা এ কথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হই না। প্রতিভা ক্ষ্যাপামি বই কি, তাহা নিয়মের ব্যতিক্রম, তাহা উলট্‌-পালট্ করিতেই আসে—তাহা আজিকার এই খাপ্‌ছাড়া, সৃষ্টিছাড়া দিনের মতো হঠাৎ আসিয়া যত কাজের লোকের কাজ নষ্ট করিয়া দিয়া যায়—কেহ বা তাহাকে গালি পাড়িতে থাকে, কেহ বা তাহাকে লইয়া নাচিয়া-কাঁদিয়া অস্থির হইয়া উঠে।

ভোলানাথ, যিনি আমাদের শাস্ত্রে আনন্দময়, তিনি সকল দেবতার মধ্যে এমন খাপছাড়া। সেই পাগল দিগম্বরকে আমি আজিকার এই ধৌত

নীলাকাশের রৌদ্রপ্লাবনের মধ্যে দেখিতেছি। এই নিবিড় মধ্যাহ্নের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে তাঁহার ডিমিডিমি ডমরু বাজিতেছে। আজ মৃত্যুর উলঙ্গ শুভ্রমূর্ত্তি এই কর্ম্মনিরত সংসারের মাঝখানে কেমন নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।—সুন্দর শান্তচ্ছবি।

ভোলানাথ, আমি জানি, তুমি অদ্ভুত। জীবনে ক্ষণেক্ষণে অদ্ভুত রূপেই তুমি তোমার ভিক্ষার ঝুলি লইয়া দাঁড়াইয়াছ। একেবারে হিসাব কিতাব নাস্তানাবুদ করিয়া দিয়াছ। তোমার নন্দিভৃঙ্গির সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। আজ তাহারা তোমার সিদ্ধির প্রসাদ যে একফোঁটা আমাকে দেয় নাই, তাহা বলিতে পারি না—ইহাতে আমার নেশা ধরিয়াছে, সমস্ত ভণ্ডুল হইয়া গেছে—আজ আমার কিছুই গোছালো নাই।

আমি জানি, সুখ প্রতিদিনের সামগ্রী, আনন্দ প্রত্যহের অতীত। সুখ শরীরের কোথাও পাছে ধূলা লাগে বলিয়া সঙ্কুচিত, আনন্দ ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া নিখিলের সঙ্গে আপনার ব্যবধান ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দেয়—এইজন্য সুখের পক্ষে ধূলা হেয়, আনন্দের পক্ষে ধূলা ভূষণ। সুখ, কিছু পাছে হারায় বলিয়া ভীত, আনন্দ, যথাসর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়া পরিতৃপ্ত; এইজন্য সুখের পক্ষে রিক্ততা দারিদ্র্য, আনন্দের পক্ষে দারিদ্র্যই ঐশ্বর্য্য। সুখ, ব্যবস্থার বন্ধনের মধ্যে আপনার শ্রীটুকুকে সতর্কভাবে রক্ষা করে, আনন্দ, সংহারের মুক্তির মধ্যে আপন সৌন্দর্য্যকে উদারভাবে প্রকাশ করে. এইজন্য সুখ বাহিরের নিয়মে বদ্ধ, আনন্দ সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনার নিয়ম আপনিই সৃষ্টি করে। সুখ, সুধাটুকুর জন্য তাকাইয়া বসিয়া থাকে. আনন্দ, দুঃখের বিষকে অনায়াসে পরিপাক করিয়া ফেলে,—এইজন্য, কেবল ভালোটুকুর দিকেই সুখের পক্ষপাত—আর, আনন্দের পক্ষে ভালোমন্দ দুইই সমান।

এই সৃষ্টির মধ্যে একটি পাগল আছেন, যাহা-কিছু অভাবনীয়, তাহা

খামখা তিনিই আনিয়া উপস্থিত করেন। তিনি কেন্দ্রাতিগ, "সেণ্ট্রিফ্যুগল্"—তিনি কেবলি নিখিলকে নিয়মের বাহিরের দিকে টানিতেছেন। নিয়মের দেবতা সংসারের সমস্ত পথকে পরিপূর্ণ চক্রপথ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন, আর এই পাগল তাহাকে আক্ষিপ্ত করিয়া কুণ্ডলী আকার করিয়া তুলিতেছেন। এই পাগল আপনার খেয়ালে সরীসৃপের বংশে পাখী এবং বানরের বংশে মানুষ উদ্ভাবিত করিতেছেন। যাহা হইয়াছে, যাহা আছে, তাহাকেই চিরস্থায়িরূপে রক্ষা করিবার জন্য সংসারের একটা বিষম চেষ্টা রহিয়াছে—ইনি সেটাকে ছারখার করিয়া-দিয়া, যাহা নাই, তাহারই জন্য পথ করিয়া দিতেছেন। ইঁহার হাতে বাঁশি নাই, সামঞ্জস্য সুর ইঁহার নহে, পিনাক ঝঙ্কৃত হয়, বিধিবিহিত যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যায়, এবং কোথা হইতে একটি অপূর্ব্বতা উড়িয়া-আসিয়া জুড়িয়া বসে। পাগলও ইঁহারি কীর্ত্তি এবং প্রতিভাও ইঁহারি কীর্ত্তি। ইঁহার টানে যাহার তার ছিঁড়িয়া যায়, সে হয় উন্মাদ আর যাহার তার অশ্রুতপূর্ব্ব সুরে বাজিয়া উঠে, সে হইল প্রতিভাবান্। পাগলও দশের বাহিরে, প্রতিভাবানও তাই—কিন্তু পাগল বাহিরেই থাকিয়া যায়, আর প্রতিভাবান্ দশকে একাদশের কোঠায় টানিয়া-আনিয়া দশের অধিকার বাড়াইয়া দেন।

শুধু পাগল নয়, শুধু প্রতিভাবান্ নয়, আমাদের প্রতিদিনের একরঙা তুচ্ছতার মধ্যে হঠাৎ ভয়ঙ্কর, তাহার জ্বলজ্জটাকলাপ লইয়া দেখা দেয়। সেই ভয়ঙ্কর, প্রকৃতির মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত উৎপাত, মানুষের মধ্যে একটা অসাধারণ পাপ আকারে জাগিয়া উঠে। তখন কত সুখমিলনের জাল লণ্ডভণ্ড, কত হৃদয়ের সম্বন্ধ ছারখার হইয়া যায়। হে রুদ্র, তোমার ললাটের যে ধ্বকধ্বক অগ্নিশিখার স্ফুলিঙ্গমাত্রে অন্ধকারে গৃহের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে—সেই শিখাতেই লোকালয়ে সহস্রের হাহাধ্বনিতে নিশীথ-রাত্রে গৃহদাহ উপস্থিত হয়। হায়, শম্ভু,

তোমার নৃত্যে, তোমার দক্ষিণ ও বাম পদক্ষেপে সংসারে মহাপুণ্য ও মহাপাপ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। সংসারের উপরে প্রতিদিনের জড়-হস্তক্ষেপে যে একটা সামান্যতার একটানা আবরণ পড়িয়া যায়, ভালোমন্দ দুয়েরই প্রবল আঘাতে তুমি তাহাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিতে থাকো ও প্রাণের প্রবাহকে অপ্রত্যাশিতের উত্তেজনায় ক্রমাগত তরঙ্গিত করিয়া শক্তির নব নব লীলা ও সৃষ্টির নব নব মূর্তি প্রকাশ করিয়া তোলো। পাগল, তোমার এই রুদ্র আনন্দে যোগ দিতে আমার ভীত হৃদয় যেন পরাঙ্মুখ না হয়। সংহারের রক্তআকাশের মাঝখানে তোমার রবিকরোদ্দীপ্ত তৃতীয়নেত্র যেন ধ্রুবজ্যোতিতে আমার অন্তরের অন্তরকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে। নৃত্য করো, হে উন্মাদ, নৃত্য করো। সেই নৃত্যের ঘূর্ণবেগে আকাশের লক্ষকোটিযোজনব্যাপী উজ্জ্বলিত নীহারিকা যখন ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকিবে—তখন আমার বক্ষের মধ্যে ভয়ের আক্ষেপে যেন এই রুদ্রসঙ্গীতের তাল কাটিয়া না যায়। হে মৃত্যুঞ্জয়, আমাদের সমস্ত ভালো এবং সমস্ত মন্দের মধ্যে তোমারই জয় হউক্।

আমাদের এই ক্ষ্যাপাদেবতার আবির্ভাব যে ক্ষণে ক্ষণে, তাহা নহে —সৃষ্টির মধ্যে ইঁহার পাগলামি অহরহ লাগিয়াই আছে—আমরা ক্ষণে ক্ষণে তাহার পরিচয় পাই মাত্র। অহরহই জীবনকে মৃত্যু নবীন করিতেছে, ভালোকে মন্দ উজ্জ্বল করিতেছে, তুচ্ছকে অভাবনীয় মূল্যবান করিতেছে। যখন পরিচয় পাই, তখনি রূপের মধ্যে অপরূপ, বন্ধনের মধ্যে মুক্তির প্রকাশ আমাদের কাছে জাগিয়া উঠে।

আজিকার এই মেঘোন্মুক্ত আলোকের মধ্যে আমার কাছে সেই অপরূপের মূর্তি জাগিয়াছে। সম্মুখের ঐ রাস্তা, ঐ খোড়োচাল-দেওয়া মুদির দোকান, ঐ ভাঙা ভিটা, ঐ সরু গলি, ঐ গাছপালাগুলিকে প্রতি-দিনের পরিচয়ের মধ্যে অত্যন্ত তুচ্ছ করিয়া দেখিয়াছিলাম। এইজন্য উহারা আমাকে বদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল—রোজ এই ক'টা জিনিষের

মধ্যেই নজরবন্দি করিয়া রাখিয়াছিল। আজ হঠাৎ তুচ্ছতা একেবারে চলিয়া গেছে। আজ দেখিতেছি, চির-অপরিচিতকে এতদিন পরিচিত বলিয়া দেখিতেছিলাম, ভালো করিয়া দেখিতে ছিলামই না। আজ এই যাহা-কিছু, সমস্তকেই দেখিয়া শেষ করিতে পারিতেছি না। আজ সেই সমস্তই আমার চারিদিকে আছে, অথচ তাহারা আমাকে আটক করিয়া রাখে নাই—তাহারা প্রত্যেকেই আমাকে পথ ছাড়িয়া দিয়াছে। আমার পাগল এইখানেই ছিলেন,—সেই অপূর্ব্ব, অপরিচিত, অপরূপ, এই মুদির দোকানের খোড়োচালের শ্রেণীকে অবজ্ঞা করেন নাই—কেবল, যে-আলোকে তাঁহাকে দেখা যায়, সে-আলোক আমার চোখের উপরে ছিল না। আজ আশ্চর্য্য এই যে, ঐ সম্মুখের দৃশ্য, ঐ কাছের জিনিষ আমার কাছে একটি বহুসুদূরের মহিমা লাভ করিয়াছে। উহার সঙ্গে গৌরীশঙ্করের তুষারবেষ্টিত দুর্গমতা, মহাসমুদ্রের তরঙ্গচঞ্চল দুস্তরতা আপনাদের সজাতিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে।

এমনি করিয়া হঠাৎ একদিন জানিতে পারা যায়, যাহার সঙ্গে অত্যন্ত ঘরকন্না পাতাইয়া বসিয়াছিলাম, সে আমার ঘরকন্নার বাহিরে। আমি যাহাকে প্রতিমুহূর্ত্তের বাঁধা-বরাদ্দ বলিয়া নিতান্ত নিশ্চিন্ত হইয়া ছিলাম, তাহার মতো দুর্লভ দুরায়ত্ত জিনিষ কিছুই নাই। আমি যাহাকে ভালোরূপ জানি মনে করিয়া তাহার চারিদিকে সীমানা আঁকিয়া-দিয়া খাতিরজমা হইয়া বসিয়া ছিলাম, সে দেখি, কখন্ একমুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত সীমানা পার হইয়া অপূর্ব্বরহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে। যাহাকে নিয়মের দিক্ দিয়া, স্থিতির দিক দিয়া বেশ ছোটোখাটো, বেশ দস্তুর-সঙ্গত, বেশ আপনার বলিয়াই বোধ হইয়াছিল, তাহাকে ভাঙনের দিক্ হইতে, ঐ শ্মশানচারী পাগলের তরফ হইতে হঠাৎ দেখিতে পাইলে মুখে আর বাক্য সরে না—আশ্চর্য্য! ও কে! যাহাকে চিরদিন জানিয়াছি, সেই এ কে! যে একদিকে ঘরের, সে আর একদিকে অন্তরের,

যে একদিকে কাজের সে আর-একদিকে সমস্ত আবশ্যকের বাহিরে, যাহাকে একদিকে স্পর্শ করিতেছি, সে আর একদিকে সমস্ত আয়ত্তের অতীত—যে একদিকে সকলের সঙ্গে বেশ খাপ্ খাইয়া গিয়াছে, সে আর-একদিকে ভয়ংকর খাপ্‌ছাড়া, আপনাতে আপনি!

প্রতিদিন যাঁহাকে দেখি নাই, আজ তাঁহাকে দেখিলাম, প্রতিদিনের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বাঁচিলাম। আমি ভাবিতেছিলাম, চারিদিকে পরিচিতের বেড়ার মধ্যে প্রাত্যহিক নিয়মের দ্বারা আমি বাঁধা—আজ দেখিতেছি, মহা অপূর্বের কোলের মধ্যে চিরদিন আমি খেলা করিতেছি। আমি ভাবিয়াছিলাম, আপিসের বড়ো সাহেবের মতো অত্যন্ত সুগম্ভীর হিসাবী লোকের হাতে পড়িয়া সংসারে প্রত্যহ আঁক পাড়িয়া যাইতেছি—আজ সেই বড়ো সাহেবের চেয়ে যিনি বড়ো, সেই মস্ত বেহিসাবী পাগলের বিপুল উদার অট্টহাস্য জলে-স্থলে-আকাশে সপ্তলোক ভেদ করিয়া ধ্বনিত শুনিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আমার খাতাপত্র সমস্ত রহিল। আমার জরুরি-কাজের বোঝা ঐ সৃষ্টিছাড়ার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিলাম—তাঁহার তাণ্ডবনৃত্যের আঘাতে তাহা চূর্ণচূর্ণ হইয়া ধূলি হইয়া উড়িয়া যাক্।

১৩১১

আষাঢ়

ঋতুতে ঋতুতে যে ভেদ সে কেবল বর্ণের ভেদ নহে, বৃত্তিরও ভেদ বটে। মাঝে মাঝে বর্ণসঙ্কর দেখা দেয়—জ্যৈষ্ঠের পিঙ্গল জটা শ্রাবণের মেঘস্তূপে নীল হইয়া উঠে, ফাল্গুনের শ্যামলতায় বৃদ্ধ পৌষ আপনার পীত রেখা পুনরায় চালাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রকৃতির ধর্ম্মরাজ্যে এ সমস্ত বিপর্য্যয় টেঁকে না।

গ্রীষ্মকে ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে। সমস্ত রসবাহুল্য দমন করিয়া জঞ্জাল মারিয়া তপস্যার আগুন জ্বালিয়া সে নিবৃত্তিমার্গের মন্ত্রসাধন করে। সাবিত্রী-মন্ত্র জপ করিতে করিতে কখনো বা সে নিশ্বাস ধারণ করিয়া রাখে, তখন গুমটে গাছের পাতা নড়ে না, আবার যখন সে রুদ্ধ নিশ্বাস ছাড়িয়া দেয় তখন পৃথিবী কাঁপিয়া উঠে। ইহার আহারের আয়োজনটা প্রধানত ফলাহার।

বর্ষাকে ক্ষত্রিয় বলিলে দোষ হয় না। তাহার নকীব আগে আগে গুরুগুরু শব্দে দামামা বাজাইতে বাজাইতে আসে,—মেঘের পাগড়ি পরিয়া পশ্চাতে সে নিজে আসিয়া দেখা দেয়। অল্পে তাহার সন্তোষ নাই। দিগ্বিজয় করাই তাহার কাজ। লড়াই করিয়া সমস্ত আকাশটা দখল করিয়া সে দিক্‌চক্রবর্ত্তী হইয়া বসে। তমালতালী-বনরাজির নীলতম প্রান্ত হইতে তাহার রথের ঘর্ঘরধ্বনি শোনা যায়, তাহার বাঁকা তলোয়ারখানা ক্ষণে ক্ষণে কোষ হইতে বাহির হইয়া দিগ্বক্ষ বিদীর্ণ করিতে থাকে, আর তাহার তূণ হইতে বরুণ-বাণ আর নিঃশেষ হইতে চায় না। এদিকে তাহার পাদপীঠের উপর সবুজ কিংখাবের আস্তরণ বিছানো, মাথার উপরে ঘনপল্লবশ্যামল চন্দ্রাতপে সোনার কদম্বের ঝালর

ঝুলিতেছে, আর বন্দিনী পূর্ব্বদিগ্বধূ পাশে দাঁড়াইয়া অশ্রুনয়নে তাহাকে কেতকীগন্ধবারিসিক্ত পাখা বীজন করিবার সময় আপন বিদ্যুন্মণিজড়িত কঙ্কণখানি ঝলকিয়া তুলিতেছে।

আর শীতটা বৈশ্য। তাহার পাকা ধান কাটাই-মাড়াইয়ের আয়োজনে চারিটি প্রহর ব্যস্ত, কলাই যব ছোলার প্রচুর আশ্বাসে ধরণীর ডালা পরিপূর্ণ। প্রাঙ্গণে গোলা ভরিয়া উঠিয়াছে, গোষ্ঠে গরুর পাল রোমন্থ করিতেছে, ঘাটে ঘাটে নৌকা বোঝাই হইল, পথে পথে ভারে মন্থর হইয়া গাড়ি চলিয়াছে, আর ঘরে ঘরে নবান্ন এবং পিঠাপার্ব্বণের উদ্যোগে ঢেঁকিশালা মুখরিত।

এই তিনটেই প্রধান বর্ণ। আর শূদ্র যদি বলো সে শরৎ ও বসন্ত। একজন শীতের, আর একজন গ্রীষ্মের তল্পি বহিয়া আনে। মানুষের সঙ্গে এইখানে প্রকৃতির তফাৎ। প্রকৃতির ব্যবস্থায় যেখানে সেবা সেইখানেই সৌন্দর্য্য, যেখানে নম্রতা সেইখানেই গৌরব। তাহার সভায় শূদ্র যে, সে ক্ষুদ্র নহে, ভার যে বহন করে সমস্ত আভরণ তাহারই। তাই তো শরতের নীল পাগ্‌ড়ির উপরে সোনার কল্‌কা, বসন্তের সুগন্ধ পীত উত্তরীয়খানি ফুলকাটা। ইহারা যে পাদুকা পরিয়া ধরণী-পথে বিচরণ করে তাহা রং-বেরঙের সূত্রশিল্পে বুটিদার, ইহাদের অঙ্গদে কুণ্ডলে অঙ্গুরীয়ে জহরতের সীমা নাই।

এই তো পাঁচটার হিসাব পাওয়া গেল। লোকে কিন্তু ছয়টা ঋতুর কথাই বলিয়া থাকে। ওটা নেহাৎ জোড় মিলাইবার জন্য। তাহারা জানে না বেজোড় লইয়াই প্রকৃতির যত বাহার। ৩৬৫ দিনকে দুই দিয়া ভাগ করো—৩৬ পর্য্যন্ত বেশ মেলে কিন্তু সব-শেষের ঐ ছোট্টো পাঁচ-টি কিছুতেই বাগ মানিতে চায় না। দুইয়ে দুইয়ে মিল হইয়া গেলে সে মিল থামিয়া যায়, অলস হইয়া পড়ে। এই জন্য কোথা হইতে একটা তিন আসিয়া সেটাকে নাড়া দিয়া তাহার যত রকম সঙ্গীত সমস্তটা বাজাইয়া তোলে।

বিশ্বসভায় অমিল-সয়তানটা এই কাজ করিবার জন্যই আছে,—সে মিলের স্বর্গপুরীকে কোনোমতেই ঘুমাইয়া পড়িতে দিবে না ;—সেই তো নৃত্যপরা উর্ব্বশীর নূপুরে ক্ষণে ক্ষণে তাল কাটাইয়া দেয়—সেই বেতালটি সামলাইবার সময়েই সুরসভায় তালের রস-উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

ছয় ঋতু গণনার একটা কারণ আছে। বৈশ্যকে তিন বর্ণের মধ্যে সব নিচে ফেলিলেও উহারই পরিমাণ বেশি। সমাজের নিচের বড়ো ভিত্তি ঐ বৈশ্য। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে সম্বৎসরের প্রধান বিভাগ শরৎ হইতে শীত। বৎসরের পূর্ণ পরিণতি ঐখানে। ফসলের গোপন আয়োজন সকল-ঋতুতেই কিন্তু ফসলের প্রকাশ হয় ঐ সময়েই। এই জন্য বৎসরের এই ভাগটাকে মানুষ বিস্তারিত করিয়া দেখে। এই অংশেই বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্যের তিন মূর্ত্তিতে বৎসরের সফলতা মানুষের কাছে প্রত্যক্ষ হয়। শরতে তাহা চোখ জুড়াইয়া নবীন বেশে দেখা দেয়, হেমন্তে তাহা মাঠ ভরিয়া প্রবীণ শোভায় পাকে, আর শীতে তাহা ঘর ভরিয়া পরিণতি রূপে সঞ্চিত হয়।

শরৎ হেমন্ত শীতকে মানুষ এক বলিয়া ধরিতে পারিত কিন্তু আপনার লাভটাকে সে থাকে-থাকে ভাগ করিয়া দেখিতে ভালোবাসে। তাহার স্পৃহনীয় জিনিষ একটি হইলেও সেটাকে অনেকখানি করিয়া নাড়াচাড়া করাতেই সুখ। একখানা নোটে কেবলমাত্র সুবিধা, কিন্তু সাবিনদী তোড়ায় যথার্থ মনের তৃপ্তি। এই জন্য ঋতুর যে অংশে তাহার লাভ সেই অংশে মানুষ ভাগ বাড়াইয়াছে। শরৎ-হেমন্ত-শীতে মানুষের ফসলের ভাণ্ডার, সেইজন্য সেখানে তাহার তিন মহল, ঐখানে তাহার গৃহলক্ষ্মী। আর যেখানে আছেন বনলক্ষ্মী সেখানে দুই মহল,—বসন্ত ও গ্রীষ্ম। ঐখানে তাহার ফলের ভাণ্ডার, বনভোজনের ব্যবস্থা। ফাল্গুনে বোল ধরিল, জ্যৈষ্ঠে তাহা পাকিয়া উঠিল। বসন্তে ঘ্রাণ গ্রহণ, আর গ্রীষ্মে স্বাদ গ্রহণ।

ঋতুর মধ্যে বর্ষাই কেবল একা একমাত্র। তাহার জুড়ি নাই। গ্রীষ্মের সঙ্গে তাহার মিল হয় না,—গ্রীষ্ম দরিদ্র, সে ধনী। শরতের সঙ্গেও তাহার মিল হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। কেননা শরৎ তাহারি সমস্ত সম্পত্তি নীলাম করাইয়া নিজের নদীনালা মাঠঘাটে বেনামী করিয়া রাখিয়াছে। যে ঋণী সে কৃতজ্ঞ নহে।

মানুষ বর্ষাকে খণ্ড করিয়া দেখে নাই, কেননা বর্ষা-ঋতুটা মানুষের সংসারব্যবস্থার সঙ্গে কোনোদিক দিয়া জড়াইয়া পড়ে নাই। তাহার দাক্ষিণ্যের উপর সমস্ত বছরের ফল ফসল নির্ভর করে কিন্তু সে ধনী তেমন নয় যে নিজের দানের কথাটা রটনা করিয়া দিবে। শরতের মতো মাঠে ঘাটে পত্রে পত্রে সে আপনার বদান্যতা ঘোষণা করে না। প্রত্যক্ষভাবে দেনা-পাওনার সম্পর্ক নাই বলিয়া মানুষ ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া বর্ষার সঙ্গে ব্যবহার করিয়া থাকে। বস্তুত বর্ষার যা-কিছু প্রধান ফল তাহা গ্রীষ্মেরই ফলাহার ভাণ্ডারের উদ্বৃত্ত।

এই জন্য বর্ষা-ঋতুটা বিশেষভাবে কবির ঋতু। কেননা কবি গীতার উপদেশকে ছাড়াইয়া গেছে। তাহার কর্ম্মেও অধিকার নাই, ফলেও অধিকার নাই। তাহার কেবলমাত্র অধিকার ছুটিতে,—কর্ম্ম হইতে ছুটি ফল হইতে ছুটি।

বর্ষা ঋতুটাতে ফলের চেষ্টা অল্প এবং বর্ষার সমস্ত ব্যবস্থা কর্ম্মের প্রতিকূল। এই জন্য বর্ষায় হৃদয়টা ছাড়া পায়। ব্যাকরণে হৃদয় যে লিঙ্গই হউক, আমাদের প্রকৃতির মধ্যে সে যে স্ত্রী জাতীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। এই জন্য কাজ-কর্ম্মের আপিসে বা লাভ-লোকসানের বাজারে সে আপনার পাল্কীর বাহির হইতে পারে না। সেখানে সে পর্দ্দা-নসিন।

বাবুরা যখন পূজার ছুটিতে আপনাদের কাজের সংসার হইতে দূরে পশ্চিমে হাওয়া খাইতে যান, তখন ঘরের বধূর পর্দ্দা উঠিয়া যায়। বর্ষায়

আমাদের হৃদয়-বধূর পর্দা থাকে না। বাদলার কর্ম্মহীন বেলায় সে যে কোথায় বাহির হইয়া পড়ে তাহাকে ধরিয়া রাখা দায় হয়। একদিন পয়লা আষাঢ়ে উজ্জয়িনীর কবি তাহাকে রামগিরি হইতে অলকায়, মর্ত্ত্য হইতে কৈলাস পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়াছেন।

বর্ষায় হৃদয়ের বাধা-ব্যবধান চলিয়া যায় বলিয়াই সে সময়টা বিরহী বিরহিণীর পক্ষে বড়ো সহজ সময় নয়। তখন হৃদয় আপনার সমস্ত বেদনার দাবী লইয়া সম্মুখে আসে। এদিক-ওদিকে আপিসের পেয়াদা থাকিলে সে অনেকটা চুপ করিয়া থাকে কিন্তু এখন তাহাকে থামাইয়া রাখে কে?

বিশ্বব্যাপারে মস্ত একটা ডিপার্ট্‌মেন্ট্ আছে, সেটা বিনা কাজের। সেটা পাব্লিক্ ওয়ার্কস্ ডিপার্ট্‌মেন্টের বিপরীত। সেখানে যে-সমস্ত কাণ্ড ঘটে সে একেবারে বেহিসাবী। সরকারী হিসাব পরিদর্শক হতাশ হইয়া সেখানকার খাতাপত্র পরীক্ষা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে। মনে করো, খামখা এত বড়ো আকাশটার আগাগোড়া নীল তুলি বুলাইবার কোনো দরকার ছিল না—এই শব্দহীন শূন্যটাকে বর্ণহীন করিয়া রাখিলে সে তো কোনো নালিশ চালাইত না। তাহার পরে, অরণ্যে প্রান্তরে লক্ষ লক্ষ ফুল একবেলা ফুটিয়া আর-একবেলা ঝরিয়া যাইতেছে, তাহাদের বোঁটা হইতে পাতার ডগা পর্য্যন্ত এত যে কারিগরি সেই অজস্র অপব্যয়ের জন্য কাহারো কাছে কি কোনো জবাবদিহি নাই? আমাদের শক্তির পক্ষে এ সমস্তই ছেলেখেলা, কোনো ব্যবহারে লাগে না; আমাদের বুদ্ধির পক্ষে এ সমস্তই মায়া, ইহার মধ্যে কোনো বাস্তবতা নাই।

আশ্চর্য্য এই যে, এই নিষ্প্রয়োজনের জায়গাটাই হৃদয়ের জায়গা। এই জন্য ফলের চেয়ে ফুলেই তাহার তৃপ্তি। ফল কিছু কম সুন্দর নয়, কিন্তু ফলের প্রয়োজনীয়তাটা এমন একটা জিনিষ যাহা লোভীর

ভিড় জমায়, বুদ্ধি-বিবেচনা আসিয়া সেটা দাবী করে, সেই জন্ত ঘোমটা টানিয়া হৃদয়কে সেখান হইতে একটু সরিয়া দাঁড়াইতে হয়। তাই দেখা যায় তাম্রবর্ণ পাকা আমের ভারে গাছের ডালগুলি নত হইয়া পড়িলে বিরহিণীর রসনায় যে রসের উত্তেজনা উপস্থিত হয় সেটা গীতি-কাব্যের বিষয় নহে। সেটা অত্যন্ত বাস্তব, সেটার মধ্যে যে প্রয়োজন আছে তাহা টাকা-আনা-পাইয়ের মধ্যে বাঁধা যাইতে পারে।

বর্ষা-ঋতু নিষ্প্রয়োজনের ঋতু। অর্থাৎ তাহার সঙ্গীতে, তাহার সমারোহে, তাহার অন্ধকারে, তাহার দীপ্তিতে, তাহার চাঞ্চল্যে, তাহার গাম্ভীর্য্যে তাহার সমস্ত প্রয়োজন কোথায় ঢাকা পড়িয়া গেছে। এই ঋতু ছুটির ঋতু। তাই ভারতবর্ষে বর্ষায় ছিল ছুটি—কেননা ভারতবর্ষে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একটা বোঝাপড়া ছিল। ঋতুগুলি তাহার দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া দর্শন না পাইয়া ফিরিত না। তাহার হৃদয়ের মধ্যে ঋতুর অভ্যর্থনা চলিত।

ভারতবর্ষের প্রত্যেক ঋতুরই একটা না একটা উৎসব আছে। কিন্তু কোন্ ঋতু যে নিতান্ত বিনা-কারণে তাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে তাহা যদি দেখিতে চাও তবে সঙ্গীতের মধ্যে সন্ধান করো। কেননা সঙ্গীতেই হৃদয়ের ভিতরকার কথাটা ফাঁস হইয়া পড়ে।

বলিতে গেলে ঋতুর রাগরাগিণী কেবল বর্ষার আছে আর বসন্তের। সঙ্গীত-শাস্ত্রের মধ্যে সকল ঋতুরই জন্য কিছু কিছু সুরের বরাদ্দ থাকা সম্ভব—কিন্তু সেটা কেবল শাস্ত্রগত। ব্যবহারে দেখিতে পাই বসন্তের জন্য আছে বসন্ত আর বাহার—আর বর্ষার জন্য মেঘ, মল্লার, দেশ, এবং আরো বিস্তর। সঙ্গীতের পাড়ায় ভোট লইলে বর্ষারই হয় জিত।

শরতে, হেমন্তে, ভরা-মাঠ, ভরা-নদীতে মন নাচিয়া ওঠে, তখন উৎসবেরও অন্ত নাই, কিন্তু রাগিণীতে তাহার প্রকাশ রহিল না কেন?

তাহার প্রধান কারণ, ঐ ঋতুতে বাস্তব ব্যস্ত হইয়া আসিয়া মাঠঘাট জুড়িয়া বসে। বাস্তবের সভায় সঙ্গীত মুজরা দিতে আসে না—যেখানে অখণ্ড অবকাশ সেখানেই সে সেলাম করিয়া বসিয়া যায়।

যাহারা বস্তুর কারবার করিয়া থাকে তাহারা যেটাকে অবস্তু ও শূন্য বলিয়া মনে করে সেটা কম জিনিষ নয়। লোকালয়ের হাটে ভূমি বিক্রি হয়, আকাশ বিক্রি হয় না। কিন্তু পৃথিবীর বস্তু-পিণ্ডকে ঘেরিয়া যে বায়ুমণ্ডল আছে, জ্যোতির্লোক হইতে আলোকের দূত সেই পথ দিয়াই আনাগোনা করে। পৃথিবীর সমস্ত লাবণ্য ঐ বায়ু-মণ্ডলে। ঐখানেই তাহার জীবন। ভূমি ধ্রুব, তাহা ভাবি, তাহার একটা হিসাব পাওয়া যায়। কিন্তু বায়ু-মণ্ডলে যে কত পাগলামি তাহা বিজ্ঞ লোকের অগোচর নাই। তাহার মেজাজ কে বোঝে? পৃথিবীর সমস্ত প্রয়োজন ধূলির উপরে, কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত সঙ্গীত ঐ শূন্যে,—যেখানে তাহার অপরিচ্ছিন্ন অবকাশ।

মানুষের চিত্তের চারিদিকেও একটি বিশাল অবকাশের বায়ু-মণ্ডল আছে। সেইখানেই তাহার নানারঙের খেয়াল ভাসিতেছে, সেইখানেই অনন্ত তাহার হাতে আলোকের রাখী বাঁধিতে আসে, সেইখানেই ঝড়বৃষ্টি, সেইখানেই ঊনপঞ্চাশ বায়ুর উন্মত্ততা, সেখানকার কোনো হিসাব পাওয়া যায় না। মানুষের যে অতিচৈতন্যলোকে অভাবনীয়ের লীলা চলিতেছে সেখানে যে-সব অকেজো লোক আনাগোনা রাখিতে চায়—তাহারা মাটিকে মান্য করে বটে কিন্তু বিপুল অবকাশের মধ্যেই তাহাদের বিহার। সেখানকার ভাষাই সঙ্গীত। এই সঙ্গীতে বাস্তব-লোকে বিশেষ কী কাজ হয় জানি না—কিন্তু ইহারই কম্পমান পক্ষের আঘাত-বেগে অতিচৈতন্যলোকের সিংহদ্বার খুলিয়া যায়।

মানুষের ভাষার দিকে একবার তাকাও। ঐ ভাষাতে মানুষের প্রকাশ, সেই জন্যে উহার মধ্যে এত রহস্য। শব্দের বস্তুটা হইতেছে

তাঁহার অর্থ। মানুষ যদি কেবলমাত্র হইত বাস্তব, তবে তাহার ভাষার শব্দে নিছক্ অর্থ ছাড়া আর কিছুই থাকিত না। তবে তাহার শব্দ কেবলমাত্র খবর দিত,—সুর দিত না। কিন্তু বিস্তর শব্দ আছে যাহার অর্থ-পিণ্ডের চারিদিকে আকাশের অবকাশ আছে, একটা বায়ুমণ্ডল আছে। তাহারা যেটুকু জানায় তাহারা তাহার চেয়ে অনেক বেশি—তাহাদের ইসারা তাহাদের বাণীর চেয়ে বড়ো। ইহাদের পরিচয় তদ্ধিত প্রত্যয়ে নহে, চিত্তপ্রত্যয়ে। এই সমস্ত অবকাশওয়ালা কথা লইয়া অবকাশ-বিহারী কবিদের কারবার। এই অবকাশের বায়ুমণ্ডলেই নানা রঙিন আলোর রং ফলাইবার সুযোগ, এই ফাঁকটাতেই ছন্দগুলি নানা ভঙ্গীতে হিল্লোলিত হয়।

এই সমস্ত অবকাশবহুল রঙিন শব্দ যদি না থাকিত তবে বুদ্ধির কোনো ক্ষতি হইত না কিন্তু হৃদয় যে বিনা প্রকাশে বুক ফাটিয়া মরিত। অনির্ব্বচনীয়কে লইয়া তাহার প্রধান কারবার, এই জন্য অর্থে তাহার অতি সামান্য প্রয়োজন। বুদ্ধির দরকার গতিতে, কিন্তু হৃদয়ের দরকার নৃত্যে। গতির লক্ষ্য—একাগ্র হইয়া লাভ করা, নৃত্যের লক্ষ্য—বিচিত্র হইয়া প্রকাশ করা। ভিড়ের মধ্যে ভিড়িয়াও চলা যায় কিন্তু ভিড়ের মধ্যে নৃত্য করা যায় না। নৃত্যের চারিদিকে অবকাশ চাই। এই জন্য হৃদয় অবকাশ দাবী করে। বুদ্ধিমান তাহার সেই দাবীটাকে অবাস্তব এবং তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দেয়।

আমি বৈজ্ঞানিক নহি কিন্তু অনেক দিন ছন্দ লইয়া ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া ছন্দের তত্ত্বটা কিছু বুঝি বলিয়া মনে হয়। আমি জানি ছন্দের যে-অংশটাকে যতি বলে অর্থাৎ যেটা ফাঁকা, অর্থাৎ ছন্দের বস্তু-অংশ যেখানে নাই সেইখানেই ছন্দের প্রাণ—পৃথিবীর প্রাণটা যেমন মাটিতে নহে, তাহার বাতাসেই। ইংরাজিতে যতিকে বলে Pause—কিন্তু Pause শব্দে একটা অভাব সূচনা করে যতি সেই অভাব নহে।

সমস্ত ছন্দেব ভাবটাই ঐ যতির মধ্যে—কাবণ যতি ছন্দকে নিরস্ত করে না নিয়মিত কবে। ছন্দ যেখানে যেখানে থামে সেইখানেই তাহাব ইসারা ফুটিয়া উঠে, সেইখানেই সে নিশ্বাস ছাড়িয়া আপনার পরিচয় দিয়া বাঁচে।

এই প্রমাণটি হইতে আমি বিশ্বাস করি বিশ্বরচনায় কেবলি যে-সমস্ত যতি দেখা যায় সেইখানে শূন্যতা নাই, সেইখানেই বিশ্বেব প্রাণ কাজ করিতেছে। শুনিয়াছি অণু-পরমাণুর মধ্যে কেবলি ছিদ্র,—আমি নিশ্চয় জানি সেই ছিদ্রগুলির মধ্যেই বিবাটেব অবস্থান। ছিদ্রগুলিই মুখ্য, বস্তুগুলিই গৌণ। যাহাকে শূন্য বলি বস্তুগুলি তাহাবই অশ্রান্ত লীলা। সেই শূন্যই তাহাদিগকে আকাব দিতেছে, গতি দিতেছে, প্রাণ দিতেছে। আকর্ষণ-বিকর্ষণ তো সেই শূন্যেবই কুস্তির প্যাঁচ। জগতেব বস্তুব্যাপার সেই শূন্যেব, সেই মহাযতিব, পবিচয়। এই বিপুল বিচ্ছেদের ভিতর দিয়াই জগতেব সমস্ত যোগ সাধন হইতেছে—অণুব সঙ্গে অণুব, পৃথিবীর সঙ্গে সূর্যোর, নক্ষত্রেব সঙ্গে নক্ষত্রের। সেই বিচ্ছেদ-মহাসমুদ্রেব মধ্যে মানুষ ভাসিতেছে বলিয়াই মানুষেব শক্তি, মানুষের জ্ঞান, মানুষেব প্রেম, মানুষেব যত কিছু লীলাখেলা। এই মহাবিচ্ছেদ যদি বস্তুতে নিরেট হইযা ভরিয়া যায় তবে একেবারে নিবিড় একটানা মৃত্যু।

মৃত্যু আর কিছু নহে—বস্তু যখন আপনাব অবকাশকে হাবায় তখন তাহাই মৃত্যু। বস্তু তখন যেটুকু কেবলমাত্র সেইটুকুই, তাব বেশি নয়। প্রাণ সেই মহা-অবকাশ—যাহাকে অবলম্বন করিয়া বস্তু আপনাকে কেবলি আপনি ছাডাইয়া চলিতে পাবে।

বস্তুবাদীরা মনে কবে অবকাশটা নিশ্চল কিন্তু যাহারা অবকাশ-রসেব বসিক তাহাবা জানে বস্তুটাই নিশ্চল, অবকাশই তাহাকে গতি দেয়। বণক্ষেত্রে সৈন্যের অবকাশ নাই; তাহারা কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া

ব্যূহরচনা করিয়া চলিয়াছে, তাহারা মনে ভাবে আমরাই যুদ্ধ করিতেছি। কিন্তু যে-সেনাপতি অবকাশে নিমগ্ন হইয়া দূর হইতে স্তব্ধভাবে দেখিতেছে, সৈন্যদের সমস্ত চলা তাহারই মধ্যে। নিশ্চলের যে ভয়ঙ্কর চলা তাহার রুদ্রবেগ যদি দেখিতে চাও তবে দেখো ঐ নক্ষত্রমণ্ডলীর আবর্ত্তনে, দেখো যুগযুগান্তরের তাণ্ডব-নৃত্যে। যে নাচিতেছে না তাহারই নাচ এই সকল চঞ্চলতায়।

এত কথা যে বলিতে হইল তাহার কারণ, কবিশেখর কালিদাস যে আষাঢ়কে আপনার মন্দাক্রান্তাচ্ছন্দের অম্লান মালাটি পরাইয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন তাহাকে ব্যস্ত-লোকেরা "আষাঢ়ে" বলিয়া অবজ্ঞা করে। তাহারা মনে করে এই মেঘাবগুণ্ঠিত বর্ষণ-গম্ভীর-মুখর মাসটি সকল-কাজের বাহির, ইহার ছায়াবৃত প্রহরগুলির পসরায় কেবল বাজে-কথার পণ্য। অন্যায় মনে করে না। সকল-কাজের-বাহিরের যে দলটি যে অহৈতুকী স্বর্গসভায় আসন লইয়া বাজে-কথার অমৃত পান করিতেছে, কিশোর আষাঢ় যদি আপন আলোল কুন্তলে নবমালতীর মালা জড়াইয়া সেই সভার নীলকান্তমণির পেয়ালা ভরিবার ভার লইয়া থাকে, তবে স্বাগত, হে নবঘনশ্যাম, আমরা তোমাকে অভিবাদন করি। এসো এসো জগতের যত অকর্ম্মণ্য, এসো এসো ভাবের ভাবুক, রসের রসিক,—আষাঢ়ের মৃদঙ্গ ঐ বাজিল, এসো সমস্ত ক্ষ্যাপার দল, তোমাদের নাচের ডাক পড়িয়াছে। বিশ্বের চির-বিরহ-বেদনার অশ্রু-উৎস আজ খুলিয়া গেল, আজ তাহা আর মানা মানিল না। এসো গো অভিসারিকা, কাজের সংসারে কপাট পড়িয়াছে, হাটের পথে লোক নাই, চকিত বিদ্যুতের আলোকে আজ যাত্রায় বাহির হইবে—জাতীপুষ্পসুগন্ধিবনান্ত হইতে সজল বাতাসে আহ্বান আসিল—কোন্ ছায়াবিতানে বসিয়া আছে বহুযুগের চিরজাগ্রত প্রতীক্ষা।

১৩২১

সোনার কাঠি

রূপকথায় আছে, রাক্ষসের যাদুতে রাজকন্যা ঘুমিয়ে আছেন। যে পুরীতে আছেন সে সোনারপুরী, যে পালঙ্কে শুয়েছেন সে সোনার পালঙ্ক, সোনা মাণিকের অলঙ্কারে তাঁর গা ভরা। কিন্তু কড়াক্কড় পাহারা, পাছে কোনো সুযোগে বাহিরের থেকে কেউ এসে তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। তাতে দোষ কী? দোষ এই যে, চেতনার অধিকার যে বড়ো। সচেতনকে যদি বলা যায় তুমি কেবল এইটুকুর মধ্যেই চিরকাল থাক্‌বে, তার এক পা বাইরে যাবে না, তাহোলে তার চৈতন্যকে অপমান করা হয়। ঘুম পাড়িয়ে রাখার সুবিধা এই যে তা'তে দেহের প্রাণটা টিঁকে থাকে কিন্তু মনের বেগটা হয় একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, নয় সে অদ্ভুত স্বপ্নের পথহীন ও লক্ষ্যহীন অন্ধলোকে বিচরণ করে।

আমাদের দেশের গীতিকলার দশাটা এই রকম। সে মোহরাক্ষসের হাতে প'ড়ে বহুকাল থেকে ঘুমিয়ে আছে। যে ঘরটুকু যে পালঙ্কটুকুর মধ্যে এই সুন্দরীর স্থিতি তার ঐশ্বর্য্যের সীমা নেই, চারিদিকে কারুকার্য্য, সে কত সূক্ষ্ম কত বিচিত্র। সেই চেড়ির দল, যাদের নাম ওস্তাদি, তাদের চোখে ঘুম নেই, তারা শত শত বছর ধ'রে সমস্ত আসা যাওয়ার পথ আগ্‌লে ব'সে আছে, পাছে বাহির থেকে কোনো আগন্তুক এসে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়।

তাতে ফল হয়েছে এই যে, যে কাল্‌টা চল্‌ছে রাজকন্যা তার গলায় মালা দিতে পারেনি, প্রতিদিনের নূতন নূতন ব্যবহারে তার কোনো যোগ নেই। সে আপনার সৌন্দর্য্যের মধ্যে বন্দী, ঐশ্বর্য্যের মধ্যে অচল।

কিন্তু তার যত ঐশ্বর্য্য যত সৌন্দর্য্যই থাক্ তার গতিশক্তি যদি

না থাকে তাহোলে চলতি কাল তার ভার বহন করতে রাজি হয় না। একদিন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পালঙ্কের উপর অচলাকে শুইয়ে রেখে সে আপন পথে চলে যায়—তখন কালের সঙ্গে কলার বিচ্ছেদ ঘটে। তাতে কালেরও দারিদ্র্য, কলারও বৈকল্য।

আমরা স্পষ্টই দেখ্‌তে পাচ্চি আমাদের দেশে গান জিনিষটা চল্‌ছে না। ওস্তাদরা বল্‌ছেন, গান জিনিষটা তো চল্‌বার জন্যে হয় নি, সে বৈঠকে ব'সে থাক্‌বে তোমরা এসে সমের কাছে খুব জোরে মাথা নেড়ে যাবে। কিন্তু মুস্কিল এই যে, আমাদের বৈঠকখানার যুগ চলে গেছে, এখন আমরা যেখানে একটু বিশ্রাম করতে পাই সে মুসাফিরখানায়। যা কিছু স্থির হয়ে আছে তার খাতিরে আমরা স্থির হয়ে থাক্‌তে পারব না। আমরা যে নদী বেয়ে চল্‌ছি সে নদী চল্‌ছে, যদি নৌকোটা না চলে তবে খুব দামী নৌকো হোলেও তাকে ত্যাগ করে যেতে হবে।

সংসারের স্থাবর অস্থাবর দুই জাতের মানুষ আছে অতএব বর্ত্তমান অবস্থাটা ভালো কি মন্দ তা নিয়ে মতভেদ থাক্‌বেই। কিন্তু মত নিয়ে করব কী? যেখানে একদিন ডাঙা ছিল সেখানে আজ যদি জল হয়েই থাকে তবে সেখানকার পক্ষে দামী চৌঘুড়ির চেয়ে কলার ভেলাটাও যে ভালো।

পঞ্চাশ বছর আগে একদিন ছিল যখন বড়ো বড়ো গাইয়ে বাজিয়ে দূরদেশ থেকে কলকাতা সহরে আস্‌ত। ধনীদের ঘরে মজ্‌লিস বস্‌ত, ঠিক সমে মাথা নড়তে পারে এমন মাথা গুন্‌তিতে নেহাত কম ছিল না। এখন আমাদের সহরে বক্তৃতা সভার অভাব নেই, কিন্তু গানের মজলিস বন্ধ হয়ে গেছে। সমস্ত তানমানলয় সমেত বৈঠকী গান পুরোপুরী বরদাস্ত করতে পারে এত বড়ো মজবুত লোক এখনকার যুবকদের মধ্যে প্রায় দেখাই যায় না।

চর্চ্চা নেই ব'লে জবাব দিলে আমি শুনব না। মন নেই ব'লেই চর্চ্চা নেই। আকবরের রাজত্ব গেছে এ কথা আমাদের মানতেই হবে। খুব ভালো রাজত্ব কিন্তু কী করা যাবে—সে নেই। অথচ গানেতেই যে সে রাজত্ব বহাল থাকবে এ কথা বললে অন্যায় হবে। আমি বলছিনে আকবরের আমলের গান লুপ্ত হয়ে যাবে—কিন্তু এখনকার কালের সঙ্গে যোগ রেখে তাকে টিকতে হবে—সে যে বর্ত্তমান কালের মুখ বন্ধ ক'রে দিয়ে নিজেরই পুনরাবৃত্তিকে অন্তহীন ক'রে তুলবে তা হোতেই পারবে না।

সাহিত্যের দিক থেকে উদাহরণ দিলে আমার কথাটা স্পষ্ট হবে। আজ পর্য্যন্ত আমাদের সাহিত্যে যদি কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ধর্ম্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, মনসার ভাসানের পুনরাবৃত্তি নিয়ত চলতে থাকত তাহোলে কী হোত? পনেরো আনা লোক সাহিত্য পড়া ছেড়েই দিত। বাংলার সকল গল্পই যদি বাসবদত্তা কাদম্বরীর ছাঁচে ঢালা হোত তাহোলে জাতে ঠেলার ভয় দেখিয়ে সে গল্প পড়াতে হোত।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী কাদম্বরীর আমি নিন্দা করছিনে। সাহিত্যের শোভাযাত্রার মধ্যে চিরকালই তাদের একটা স্থান আছে কিন্তু যাত্রাপথের সমস্তটা জুড়ে তারাই যদি আড্ডা ক'রে বসে, তাহোলে সে পথটাই মাটি, আর তাদের আসরে কেবল তাকিয়া পড়ে থাকবে, মানুষ থাকবে না।

বঙ্কিম আনলেন সাতসমুদ্রপারের রাজপুত্রকে আমাদের সাহিত্য রাজকন্যার পালঙ্কের শিয়রে। তিনি যেমনি ঠেকালেন সোনার কাঠি, অমনি সেই বিজয়-বসন্ত লয়লামজনুর হাতীর দাঁতে বাঁধানো পালঙ্কের উপর রাজকন্যা ন'ড়ে উঠলেন। চলতিকালের সঙ্গে তাঁর মালা বদল হয়ে গেল, তার পর থেকে তাঁকে আজ আর ঠেকিয়ে রাখে কে?

যারা মনুষ্যত্বের চেয়ে কৌলীন্যকে বড়ো ক'রে মানে তারা বলবে ঐ রাজপুত্রটা যে বিদেশী। তারা এখনো বলে, এ সমস্তই ভুয়ো,

বস্তুতন্ত্র যদি কিছু থাকে তো সে ঐ কবিকঙ্কণ চণ্ডী, কেননা এ আমাদের খাঁটি মাল। তাদের কথাই যদি সত্য হয় তাহোলে এ কথা বল্‌তেই হবে নিছক খাঁটি বস্তুতন্ত্রকে মানুষ পছন্দ করে না। মানুষ তাকেই চায় যা বস্তু হয়ে বাস্তু গেড়ে বসে না, যা তার প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে চলে, যা তাকে মুক্তির স্বাদ দেয়।

বিদেশের সোনার কাঠি যে জিনিষকে মুক্তি দিয়েছে সে তো বিদেশী নয়—সে যে আমাদের আপন প্রাণ। তার ফল হয়েছে এই, যে, যে বাংলাভাষাকে ও সাহিত্যকে একদিন আধুনিকের দল ছুঁতে চাইত না এখন তাকে নিয়ে সকলেই ব্যবহার করছে ও গৌরব করছে। অথচ যদি ঠাহর ক'রে দেখি তবে দেখ্‌তে পাব, গদ্যে পদ্যে সকল জায়গাতেই সাহিত্যের চালচলন সাবেক কালের সঙ্গে সম্পূর্ণ বদ্‌লে গেছে। যাঁরা তাকে জাতিচ্যুত ব'লে নিন্দা করেন ব্যবহার করবার বেলা তাকে তাঁরা বর্জ্জন করতে পারেন না।

সমুদ্রপারের রাজপুত্র এসে মানুষের মনকে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে জাগিয়ে দেয় এটা তার ইতিহাসে চিরদিন ঘ'টে আসছে। আপনার পূর্ণ শক্তি পাবার জন্যে বৈষম্যের আঘাতের অপেক্ষা তাকে করতেই হয়। কোনো সভ্যতাই একা আপনাকে আপনি সৃষ্টি করে নাই। গ্রীসের সভ্যতার গোড়ায় অন্য সভ্যতা ছিল এবং গ্রীস বরাবর ইজিপ্ট্‌ ও এসিয়া থেকে ধাক্কা পেয়ে এসেছে। ভারতবর্ষে দ্রাবিড় মনের সঙ্গে আর্য্য মনের সংঘাত ও সম্মিলন ভারতসভ্যতা সৃষ্টির মূল উপকরণ, তার উপরে গ্রীস্‌ রোম পারস্য তাকে কেবলি নাড়া দিয়েছে। য়ুরোপীয় সভ্যতায় যে সব যুগকে পুনর্জন্মের যুগ বলে সে সমস্তই অন্য দেশ ও অন্য কালের সংঘাতের যুগ। মানুষের মন বাহির হতে নাড়া পেলে তবে আপনার অন্তরকে সত্যভাবে লাভ করে এবং তার পরিচয় পাওয়া যায় যখন দেখি সে আপনার বাহিরের জীর্ণ বেড়াগুলোকে ভেঙে আপনার

অধিকার বিস্তার করছে। এই অধিকার বিস্তারকে একদল লোক দোষ দেয়, বলে ওতে আমরা নিজেকে হারালুম—তারা জানে না নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া নিজেকে হারিয়ে যাওয়া নয়—কারণ বৃদ্ধি মাত্রই নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া।

সম্প্রতি আমাদের দেশে চিত্রকলার যে নবজীবন লাভের লক্ষণ দেখছি তার মূলেও সেই সাগরপারের রাজপুত্রের সোনার কাঠি আছে। কাঠি ছোঁয়ার প্রথম অবস্থায় ঘুমের ঘোরটা যখন সম্পূর্ণ কাটে না, তখন আমরা নিজের শক্তি পুরোপুরি অনুভব করিনে, তখন অনুকরণটাই বড়ো হয়ে ওঠে, কিন্তু ঘোর কেটে গেলেই আমরা নিজের জোরে চলতে পারি। সেই নিজের জোরে চলার একটা লক্ষণ এই যে তখন আমরা পরের পথেও নিজের শক্তিতেই চলতে পারি। পথ নানা, অভিপ্রায়টি আমার, শক্তিটি আমার। যদি পথের বৈচিত্র্য রুদ্ধ করি, যদি একই বাঁধা পথ থাকে, তাহোলে অভিপ্রায়ের স্বাধীনতা থাকে না—তাহোলে কলের চাকার মতো চলতে হয়। সেই কলের চাকার পথটাকে চাকার স্বকীয় পথ ব'লে গৌরব করার মতো অদ্ভুত প্রহসন আর জগতে নেই।

আমাদের সাহিত্যে চিত্রে সমুদ্রপারের রাজপুত্র এসে পৌঁচেছে কিন্তু সঙ্গীতে পৌঁছয়নি। সেই জন্যেই আজও সঙ্গীত জাগতে দেরি করছে। অথচ আমাদের জীবন জেগে উঠেছে। সেই জন্যে সঙ্গীতের বেড়া টলমল করছে। এ কথা বলতে পারব না, আধুনিকের দল গান একেবারে বর্জ্জন করেছে। কিন্তু তারা যে গান ব্যবহার করছে, যে গানে আনন্দ পাচ্চে সে গান জাত-খোয়ানো গান। তার শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার নেই। কীর্ত্তনে বাউলে বৈঠকে মিলিয়ে যে জিনিষ আজ তৈরি হয়ে উঠ্‌ছে সে আচারভ্রষ্ট। তাকে ওস্তাদের দল নিন্দা করছে। তার মধ্যে নিন্দনীয়তা নিশ্চয়ই অনেক আছে। কিন্তু অনিন্দনীয়তাই যে সব চেয়ে বড়ো গুণ তা নয়। প্রাণশক্তি শিবের মতো অনেক বিষ হজম ক'রে

ফেলে। লোকের ভালো লাগ্‌ছে, সবাই শুন্‌তে চাচ্চে, শুন্‌তে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ছে না,—এটা কম কথা নয়। অর্থাৎ গানের পঙ্গুতা ঘুচ্‌ল, চল্‌তে সুরু করল। প্রথম চালটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নয়, তার অনেক ভঙ্গী হাস্যকর এবং কুশ্রী—কিন্তু সব চেয়ে আশার কথা যে, চল্‌তে সুরু করেছে—সে বাঁধন মানছে না। প্রাণের সঙ্গে সম্বন্ধই যে তার সব চেয়ে বড়ো সম্বন্ধ, প্রথার সঙ্গে সম্বন্ধটা নয়, এই কথাটা এখানকার এই গানের গোলমেলে হাওয়ার মধ্যে বেজে উঠেছে। ওস্তাদের কারদানিতে আর তাকে বেঁধে রাখ্‌তে পারবে না।

দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সুরের মধ্যে ইংরেজি সুরের স্পর্শ লেগেছে ব'লে কেউ কেউ তাকে হিন্দুসঙ্গীত থেকে বহিষ্কৃত করতে চান। যদি দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দুসঙ্গীতে বিদেশী সোনার কাঠি ছুঁইয়ে থাকেন তবে সরস্বতী নিশ্চয়ই তাঁকে আশীর্ব্বাদ করবেন। হিঁদুসঙ্গীত ব'লে যদি কোনো পদার্থ থাকে তবে সে আপনার জাত বাঁচিয়ে চলুক, কারণ তার প্রাণ নেই, তার জাতই আছে। হিন্দুসঙ্গীতের কোনো ভয় নেই —বিদেশের সংস্রবে সে আপনাকে বড়ো ক'রেই পাবে। চিত্তের সঙ্গে চিত্তের সংঘাত আজ লেগেছে—সেই সংঘাতে সত্য উজ্জ্বল হবে না, নষ্টই হবে, এমন আশঙ্কা যে ভীরু করে, যে মনে করে সত্যকে সে নিজের মাতামহীর জীর্ণ কাঁথা আড়াল ক'রে ঘিরে রাখ্‌লে তবেই সত্য টিঁকে থাক্‌বে, আজকের দিনে সে যত আস্ফালনই করুক তাকে পথ ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হবে। কারণ, সত্য হিঁদুর সত্য নয়, পল্‌তে ক'রে ফোঁটা ফোঁটা পুঁথির বিধান খাইয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হয় না, চারিদিক থেকে মানুষের নাড়া খেলেই সে আপনার শক্তিকে প্রকাশ করতে পারে।

১৩২২

ছবির অঙ্গ

এক বলিলেন বহু হইব, এমনি করিয়া সৃষ্টি হইল—আমাদের সৃষ্টিতত্ত্বে এই কথা বলে।

একের মধ্যে ভেদ ঘটিয়া তবে রূপ আসিয়া পড়িল। তাহা হইলে রূপের মধ্যে দুইটি পরিচয় থাকা চাই, বহুর পরিচয়, যেখানে ভেদ, এবং একের পরিচয়, যেখানে মিল।

জগতে রূপের মধ্যে আমরা কেবল সীমা নয় সংযম দেখি। সীমাটা অন্য সকলের সঙ্গে নিজেকে তফাৎ করিয়া, আর সংযমটা অন্য সমস্তের সঙ্গে রফা করিয়া। রূপ এক দিকে আপনাকে মানিতেছে, আর এক দিকে অন্য সমস্তকে মানিতেছে তবেই সে টিঁকিতেছে।

তাই উপনিষৎ বলিয়াছেন, সূর্য্য ও চন্দ্র, দ্যুলোক ও ভূলোক, একের শাসনে বিধৃত। সূর্য্য চন্দ্র দ্যুলোক ভূলোক আপন-আপন সীমায় খণ্ডিত ও বহু—কিন্তু তবু তার মধ্যে কোথায় এককে দেখিতেছি? যেখানে প্রত্যেকে আপন-আপন ওজন রাখিয়া চলিতেছে, যেখানে প্রত্যেকে সংযমের শাসনে নিয়ন্ত্রিত।

ভেদের দ্বারা বহুর জন্ম কিন্তু মিলের দ্বারা বহুর রক্ষা। যেখানে অনেককে টিঁকিতে হইবে সেখানে প্রত্যেককে আপন পরিমাণটি রাখিয়া আপন ওজন বাঁচাইয়া চলিতে হয়। জগৎ-সৃষ্টিতে সমস্ত রূপের মধ্যে অর্থাৎ সীমার মধ্যে পরিমাণের যে সংযম সেই সংযমই মঙ্গল সেই সংযমই সুন্দর। শিব যে যতী।

আমরা যখন সৈন্যদলকে চলিতে দেখি তখন একদিকে দেখি প্রত্যেকে আপন সীমার দ্বারা স্বতন্ত্র, আর একদিকে দেখি প্রত্যেকে

একটি নির্দ্দিষ্ট মাপ রাখিয়া ওজন রাখিয়া চলিতেছে। সেইখানেই সেই পরিমাণের সুষমার ভিতর দিয়া জানি ইহাদের ভেদের মধ্যেও একটি এক প্রকাশ পাইতেছে। সেই এক যতই পরিস্ফুট এই সৈন্যদল ততই সত্য। বহু যখন এলোমেলো হইয়া ভিড় করিয়া পরস্পরকে ঠেলাঠেলি ও অবশেষে পরস্পরকে পায়ের তলায় দলাদলি করিয়া চলে তখন বহুকেই দেখি, এককে দেখিতে পাই না, অর্থাৎ তখন সীমাকেই দেখি ভূমাকে দেখি না—অথচ এই ভূমার রূপই কল্যাণরূপ, আনন্দরূপ।

নিছক বহু কী জ্ঞানে কী প্রেমে কী কর্ম্মে মানুষকে ক্লেশ দেয়, ক্লান্ত করে,—এই জন্য মানুষ আপনার সমস্ত জানায় চাওয়ায় পাওয়ায় করায় বহুর ভিতরকার এককে খুঁজিতেছে—নহিলে তার মন মানে না, তার সুখ থাকে না তার প্রাণ বাঁচে না। মানুষ তার বিজ্ঞানে বহুর মধ্যে যখন এককে পায় তখন নিয়মকে পায়, দর্শনে বহুর মধ্যে যখন এককে পায় তখন তত্ত্বকে পায়, সাহিত্যে শিল্পে বহুর মধ্যে যখন এককে পায় তখন সৌন্দর্য্যকে পায়, সমাজে বহুর মধ্যে যখন এককে পায় তখন কল্যাণকে পায়। এমনি করিয়া মানুষ বহুকে লইয়া তপস্যা করিতেছে এককে পাইবার জন্য।

এই গেল আমার ভূমিকা। তার পরে, আমাদের শিল্প-শাস্ত্র চিত্রকলা সম্বন্ধে কী বলিতেছে বুঝিয়া দেখা যাক্।

সেই শাস্ত্রে বলে, ছবির ছয় অঙ্গ। রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য ও বর্ণিকাভঙ্গ।

"রূপভেদাঃ"—ভেদ লইয়া সুরু। গোড়ায় বলিয়াছি ভেদেই রূপের সৃষ্টি। প্রথমেই রূপ আপনার বহু বৈচিত্র্য লইয়াই আমাদের চোখে পড়ে। তাই ছবির আরম্ভ হইল রূপের ভেদে—একের সীমা হইতে আরের সীমার পার্থক্যে।

কিন্তু শুধু ভেদে কেবল বৈষম্যই দেখা যায়। তার সঙ্গে যদি

সুষমাকে না দেখানো যায় তবে চিত্রকলা তো ভূতের কীর্তন হইয়া উঠে। জগতের সৃষ্টিকার্যে বৈষম্য এবং সৌষম্য রূপে রূপে একেবারে গায়ে গায়ে লাগিয়া আছে, আমাদের সৃষ্টিকার্যে যদি তার সেটা অন্যথা ঘটে তবে সেটা সৃষ্টিই হয় না, অনাসৃষ্টি হয়।

বাতাস যখন স্তব্ধ তখন তাহা আগাগোড়া এক হইয়া আছে। সেই এককে বীণার তার দিয়া আঘাত করো তাহা ভাঙিয়া বহু হইয়া যাইবে। এই বহুর মধ্যে ধ্বনিগুলি যখন পরস্পর পরস্পরের ওজন মানিয়া চলে তখন তাহা সঙ্গীত, তখনই একের সহিত অন্যের সুনিয়ত যোগ—তখনই সমস্ত বহু তাহার বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া একই সঙ্গীতকে প্রকাশ করে। ধ্বনি এখানে রূপ, এবং ধ্বনির সুষমা যাহা সুর তাহাই প্রমাণ। ধ্বনির মধ্যে ভেদ, সুরের মধ্যে এক।

এইজন্য শাস্ত্রে ছবির ছয় অঙ্গের গোড়াতে যেখানে "রূপভেদ" আছে সেইখানেই তার সঙ্গে সঙ্গে "প্রমাণানি" অর্থাৎ পরিমাণ জিনিষটাকে একেবারে যমক করিয়া সাজাইয়াছে। ইহাতে বুঝিতেছি ভেদ নইলে মিল হয় না এই জন্যই ভেদ, ভেদের জন্য ভেদ নহে, সীমা নহিলে সুন্দর হয় না এই জন্যই সীমা, নহিলে আপনাতে সীমার সার্থকতা নাই, ছবিতে এই কথাটাই জানাইতে হইবে। রূপটাকে তার পরিমাণে দাঁড় করানো চাই। কেননা আপনার সত্য-মাপে যে চলিল অর্থাৎ চারিদিকের মাপের সঙ্গে যার খাপ খাইল সেই হইল সুন্দর। প্রমাণ মানে না যে রূপ সেই কুরূপ, তাহা সমগ্রের বিরোধী।

রূপের রাজ্যে যেমন জ্ঞানের রাজ্যেও তেমনি। প্রমাণ মানে না যে যুক্তি সেই তো কুযুক্তি। অর্থাৎ সমস্তের মাপকাঠিতে যার মাপে কমিবেশি হইল, সমস্তের তুলাদণ্ডে যার ওজনের গরমিল হইল সেই তো মিথ্যা বলিয়া ধরা পড়িল। শুধু আপনার মধ্যেই আপনি তো কেহ সত্য

হইতে পারে না, তাই যুক্তিশাস্ত্রে প্রমাণ করার মানে অন্যকে দিয়া এককে মাপা। তাই দেখি, সত্য এবং সুন্দরের একই ধর্ম। একদিকে তাহা রূপের বিশিষ্টতায় চারিদিক হইতে পৃথক্ ও আপনার মধ্যে বিচিত্র, আর-একদিকে তাহা প্রমাণের সুষমায় চারিদিকের সঙ্গে ও আপনার মধ্যে সামঞ্জস্যে মিলিত। তাই যারা গভীর করিয়া বুঝিয়াছে তারা বলিয়াছে সত্যই সুন্দর, সুন্দরই সত্য।

ছবির ছয় অঙ্গের গোড়ার কথা হইল রূপভেদাঃ প্রমাণানি। কিন্তু এটা তো হইল বহিরঙ্গ—একটা অন্তরঙ্গও তো আছে।

কেননা, মানুষ তো শুধু চোখ দিয়া দেখে না, চোখের পিছনে তার মনটা আছে। চোখ ঠিক যেটি দেখিতেছে মন যে তারই প্রতিবিম্বটুকু দেখিতেছে তাহা নহে। চোখের উচ্ছিষ্টেই মন মানুষ এ কথা মানা চলিবে না—চোখের ছবিতে মন আপনার ছবি জুড়িয়া দেয় তবেই সে ছবি মানুষের কাছে সম্পূর্ণ হইয়া ওঠে।

তাই শাস্ত্র "রূপভেদাঃ প্রমাণানি"তে ষড়ঙ্গের বহিরঙ্গ সারিয়া অন্তরঙ্গের কথায় বলিতেছেন—"ভাবলাবণ্য যোজনং"—চেহারার সঙ্গে ভাব ও লাবণ্য যোগ করিতে হইবে—চোখের কাজের উপরে মনের কাজ ফলাইতে হইবে, কেননা শুধু কারু কাজটা সামান্য, চিত্র করা চাই—চিত্রের প্রধান কাজই চিৎকে দিয়া।

ভাব বলিতে কী বুঝায় তাহা আমাদের এক রকম সহজে জানা আছে। এই জন্যই তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টায় যাহা বলা হইবে তাহাই বুঝা শক্ত হইবে। স্ফটিক যেমন অনেকগুলা কোণ লইয়া দানা বাঁধিয়া দাঁড়ায় তেমনি "ভাব" কথাটা অনেকগুলা অর্থকে মিলাইয়া দানা বাঁধিয়াছে। এ সকল কথার মুস্কিল এই যে ইহাদের সব অর্থ আমরা সকল সময়ে পুরাভাবে ব্যবহার করি না, দরকার মতো ইহাদের অর্থচ্ছটাকে ভিন্ন পর্য্যায়ে সাজাইয়া এবং কিছু কিছু বাদসাদ দিয়া

নানা কাজে লাগাই। ভাব বলিতে feelings, ভাব বলিতে idea, ভাব বলিতে characteristics, ভাব বলিতে suggestion, এমন আরো কত কী আছে।

এখানে ভাব বলিতে বুঝাইতেছে অন্তরের রূপ। আমার একটা ভাব তোমার একটা ভাব; সেইভাবে আমি আমার মতো, তুমি তোমার মতো। রূপের ভেদ যেমন বাহিরের ভেদ, ভাবের ভেদ তেমনি অন্তরের ভেদ।

রূপের ভেদ সম্বন্ধে যে কথা বলা হইয়াছে ভাবের ভেদ সম্বন্ধেও সেই কথাই খাটে। অর্থাৎ কেবল যদি তাহা এক-বোখা হইয়া ভেদকেই প্রকাশ করিতে থাকে তবে তাহা বীভৎস হইয়া উঠে। তাহা লইয়া সৃষ্টি হয় না, প্রলয়ই হয়। ভাব যখন আপন সত্য ওজন মানে, অর্থাৎ আপনার চারিদিককে মানে, বিশ্বকে মানে, তখনই তাহা মধুর। রূপের ওজন যেমন তাহার প্রমাণ, ভাবের ওজন তেমনি তাহার লাবণ্য।

কেহ যেন না মনে করেন ভাব কথাটা কেবল মানুষের সম্বন্ধেই খাটে। মানুষের মন অচেতন পদার্থের মধ্যেও একটা অন্তরের পদার্থ দেখে। সেই পদার্থটা সেই অচেতনের মধ্যে বস্তুতই আছে কিম্বা আমাদের মন সেটাকে সেইখানে আরোপ করে সে হইল তত্ত্বশাস্ত্রের তর্ক, আমার তাহাতে প্রয়োজন নাই। এইটুকু মানিলেই হইল স্বভাবতই মানুষের মন সকল জিনিষকেই মনের জিনিষ করিয়া লইতে চায়।

তাই আমরা যখন একটা ছবি দেখি তখন এই প্রশ্ন করি এই ছবির ভাবটা কী? অর্থাৎ ইহাতে তো হাতের কাজের নৈপুণ্য দেখিলাম, চোখে দেখার বৈচিত্র্য দেখিলাম, কিন্তু ইহার মধ্যে চিত্তের কোন্ রূপ দেখা যাইতেছে—ইহার ভিতর হইতে মন মনের কাছে কোন্ লিপি পাঠাইতেছে? দেখিলাম একটা গাছ—কিন্তু গাছ তো ঢের দেখিয়াছি, এ গাছের অন্তরের কথাটা কী, অথবা যে আঁকিল গাছের

মধ্য দিয়া তার অন্তরের কথাটা কী সেটা যদি না পাইলাম তবে গাছ আঁকিয়া লাভ কিসের? অবশ্য উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের বইয়ে যদি গাছের নমুনা দিতে হয় তবে সে আলাদা কথা। কেননা সেখানে সেটা চিত্র নয় সেটা দৃষ্টান্ত।

শুধু-রূপ শুধু-ভাব কেবল আমাদের গোচর হয় মাত্র। "আমাকে দেখো" "আমাকে জানো" তাহাদের দাবি এই পর্য্যন্ত। কিন্তু "আমাকে রাখো" এ দাবি করিতে হইলে আরো কিছু চাই। মনের আম-দরবারে আপন-আপন রূপ লইয়া ভাব লইয়া নানা জিনিষ হাজির হয়, মন তাহাদের কাহাকেও বলে, "বোসো," কাহাকেও বলে "আচ্ছা যাও।"

যাহারা আর্টিষ্ট তাহাদের লক্ষ্য এই যে তাহাদের সৃষ্ট পদার্থ মনের দরবারে নিত্য আসন পাইবে। যে সব গুণীর সৃষ্টিতে রূপ আপনার প্রমাণে, ভাব আপনার লাবণ্যে, প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে তাহারাই ক্লাসিক হইয়াছে, তাহারাই নিত্য হইয়াছে।

অতএব চিত্রকলায় ওস্তাদের ওস্তাদী, রূপে ও ভাবে তেমন নয়, যেমন প্রমাণে ও লাবণ্যে। এই সত্য-ওজনের আন্দাজটি পুঁথিগত বিদ্যার পাইবার জো নাই। ইহাতে স্বাভাবিক প্রতিভার দরকার। দৈহিক ওজনবোধটি স্বাভাবিক হইয়া উঠিলে তবেই চলা সহজ হয়। তবেই নূতন নূতন বাধায়, পথের নূতন নূতন আঁকেবাঁকে আমরা দেহের গতিটাকে অনায়াসে বাহিরের অবস্থার সঙ্গে তালে লয়ে মিলাইয়া চলিতে পারি। এই ওজনবোধ একেবারে ভিতরের জিনিষ যদি না হয় তবে রেলগাড়ির মতো একই বাঁধা রাস্তায় কলের টানে চলিতে হয়, এক ইঞ্চি ডাইনে বাঁয়ে হেলিলেই সর্ব্বনাশ। তেমনি রূপ ও ভাবের সম্বন্ধে যার ওজনবোধ অন্তরের জিনিষ সে "নব-নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধির" পথে কলাসৃষ্টিকে চালাইতে পারে। যার সে বোধ নাই সে ভয়ে ভয়ে একই বাঁধা রাস্তায় ঠিক এক লাইনে চলিয়া পোটো হইয়া কারিগর

হইয়া ওঠে, সে সীমার সঙ্গে সীমার নূতন সম্বন্ধ জমাইতে পারে না। এই জন্য নূতন সম্বন্ধমাত্রকে সে বাঘের মতো দেখে।

যাহা হউক এতক্ষণ ছবির ষড়ঙ্গের আমরা দুটি অঙ্গ দেখিলাম, বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ। এইবার পঞ্চম অঙ্গে বাহির ও ভিতর যে-কোঠায় এক হইয়া মিলিয়াছে তাহার কথা আলোচনা করা যাক্। সেটার নাম "সাদৃশ্যং"। নকল করিয়া যে সাদৃশ্য মেলে এতক্ষণে সেই কথাটা আসিয়া পড়িল এমন যদি কেহ মনে করেন তবে শাস্ত্রবাক্য তাঁহার পক্ষে বৃথা হইল। ঘোড়াগোরুকে ঘোড়াগোরু করিয়া আঁকিবার জন্য রেখা প্রমাণ ভাব লাবণ্যের এত বড়ো উদ্যোগপর্ব্ব কেন ? তাহা হইলে এমন কথাও কেহ মনে করিতে পারেন উত্তর-গোগৃহে গোরু-চুরি কাণ্ডের জন্যই উদ্যোগ পর্ব্ব, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের জন্য নহে।

সাদৃশ্যের দুইটা দিক আছে। একটা, রূপের সঙ্গে রূপের সাদৃশ্য, আর-একটা, ভাবের-সঙ্গে রূপের সাদৃশ্য। একটা বাহিরের, একটা ভিতরের। দুটাই দরকার। কিন্তু সাদৃশ্যকে মুখ্যভাবে বাহিরের বলিয়া ধরিয়া লইলে চলিবে না।

যখনি রেখা ও প্রমাণের কথা ছাড়াইয়া ভাব লাবণ্যের কথা পাড়া হইয়াছে তখনি বোঝা গিয়াছে গুণীর মনে যে ছবিটি আছে সে প্রধানত রেখার ছবি নহে তাহা রসের ছবি। তাহার মধ্যে এমন একটি অনির্ব্বচনীয়তা আছে যাহা প্রকৃতিতে নাই। অন্তরের সেই অমৃতরসের ভাবচ্ছবিকে বাহিরে দৃশ্যমান করিতে পারিলে তবেই রসের সহিত রূপের সাদৃশ্য পাওয়া যায়, তবেই অন্তরের সহিত বাহিরের মিল হয়। অদৃশ্য তবেই দৃশ্যে আপনার প্রতিরূপ দেখে। নানারকম চিত্রবিচিত্র করা গেল, নৈপুণ্যের অন্ত রহিল না, কিন্তু ভিতরের রসের ছবির সঙ্গে বাহিরের রূপের ছবির সাদৃশ্য রহিল না, রেখাভেদ ও প্রমাণের সঙ্গে ভাব ও লাবণ্যের জোড় মিলিল না ;—হয়তো রেখার দিকে ত্রুটি রহিল নয়তো

ভাবের দিকে—পরস্পর পরস্পরের সদৃশ হইল না। বরও আসিল, কনেও আসিল, কিন্তু অশুভ লগ্নে মিলনের মন্ত্র ব্যর্থ হইয়া গেল। মিষ্টান্ন-মিতরে জনাঃ, বাহিরের লোক হয়তো পেট ভরিয়া সন্দেশ খাইয়া খুব জয়-ধ্বনি করিল কিন্তু অন্তরের খবর যে জানে সে বুঝিল সব মাটি হইয়াছে। চোখ-ভোলানো চাতুরীতেই বেশি লোক মজে, কিন্তু, রূপের সঙ্গে রসের সাদৃশ্যবোধ যার আছে, চোখের আড়ে তাকাইলেই যে-লোক বুঝিতে পারে রসটি রূপের মধ্যে ঠিক আপনার চেহারা পাইয়াছে কিনা, সেই তো রসিক। বাতাস যেমন সূর্য্যের কিরণকে চারিদিকে ছড়াইয়া দিবার কাজ করে তেমনি গুণীর সৃষ্ট কলাসৌন্দর্য্যকে লোকালয়ের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দিবার ভার সেই রসিকের উপর। কেননা যে ভরপুর করিয়া পাইয়াছে সে স্বভাবতই না দিয়া থাকিতে পারে না,—সে জানে তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে। সর্ব্বত্র এবং সকল কালেই মানুষ এই মধ্যস্থকে মানে। ইহারা ভাবলোকের ব্যাঙ্কের কর্ত্তা—এরা নানাদিক হইতে নানা ডিপজিটের টাকা পায়—সে টাকা বদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য নহে,—সংসারে নানা কারবারে নানা লোক টাকা খাটাইতে চায়, তাহাদের নিজের মূলধন যথেষ্ট নাই—এই ব্যাঙ্কার নহিলে তাহাদের কাজ বন্ধ।

এমনি করিয়া রূপের ভেদ প্রমাণে বাঁধা পড়িল, ভাবের বেগ লাবণ্যে সংযত হইল, ভাবের সঙ্গে রূপের সাদৃশ্য পটের উপর সুসম্পূর্ণ হইয়া ভিতরে বাহিরে পুরাপুরি মিল হইয়া গেল—এই তো সব চুকিল। ইহার পর আর বাকি রহিল কী?

কিন্তু আমাদের শিল্পশাস্ত্রের বচন এখনো যে ফুরাইল না। স্বয়ং দ্রৌপদীকে সে ছাড়াইয়া গেল। পাঁচ পার হইয়া যে ছয়ে আসিয়া ঠেকিল সেটা "বর্ণিকাভঙ্গং।" রঙের মহিমা।

এইখানে বিষম খট্‌কা লাগিল। আমার পাশে এক গুণী বসিয়া

আছেন তাঁরই কাছ হইতে এই শ্লোকটি পাইয়াছি। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, রূপ, অর্থাৎ রেখার কারবার যেটা ষড়ঙ্গের গোড়াতেই আছে আর এই রঙের ভঙ্গী যেটা তার সকলের শেষে স্থান পাইল চিত্রকলায় এ দুটোর প্রাধান্য তুলনায় কার কত?

তিনি বলিলেন, বলা শক্ত।

তাঁর পক্ষে শক্ত বই কী? দুটির পরেই যে তাঁর অন্তরের টান, এমন স্থলে নিরাসক্ত মনে বিচার করিতে বসা তাঁর দ্বারা চলিবে না। আমি অব্যবসায়ী, অতএব বাহির হইতে ঠাহর করিয়া দেখা আমার পক্ষে সহজ।

রং আর রেখা এই দুই লইয়াই পৃথিবীর সকল রূপ আমাদের চোখে পড়ে। ইহার মধ্যে রেখাটাতেই রূপের সীমা টানিয়া দেয়। এই সীমার নির্দেশই ছবির প্রধান জিনিষ। অনির্দিষ্টতা গানে আছে, গন্ধে আছে কিন্তু ছবিতে থাকিতে পারে না।

এই জন্যই কেবল রেখাপাতের দ্বারা ছবি হইতে পারে কিন্তু কেবল বর্ণপাতের দ্বারা ছবি হইতে পারে না। বর্ণটা রেখার আনুষঙ্গিক।

সাদার উপরে কালোর দাগ এই হইল ছবির গোড়া। আমরা সৃষ্টিতে যাহা চোখে দেখিতেছি তাহা অসীম আলোকের সাদার উপরকার সসীম দাগ। এই দাগটা আলোর বিরুদ্ধ তাই আলোর উপরে ফুটিয়া উঠে। আলোর উল্টা কালো, আলোর বুকের উপরে ইহার বিহার।

কালো আপনাকে আপনি দেখাইতে পারে না। স্বয়ং সে শুধু অন্ধকার, দোয়াতের কালীর মতো। সাদার উপর যেই সে দাগ কাটে অমনি সেই মিলনে সে দেখা দেয়। সাদা আলোকের পটটি বৈচিত্র্যহীন ও স্থির, তার উপরে কালো রেখাটি বিচিত্রনৃত্যে ছন্দে ছন্দে ছবি হইয়া উঠিতেছে। শুভ্র ও নিস্তব্ধ অসীম রজতগিরিনিভ, তারই বুকের উপর

কালীর পদক্ষেপ চঞ্চল হইয়া সীমায় সীমায় রেখায় রেখায় ছবির পরে ছবির ছাপ মারিতেছে। কালীরেখার সেই নৃত্যের ছন্দটি লইয়া চিত্রকলার রূপভেদাঃ প্রমাণানি। নৃত্যের বিচিত্র বিক্ষেপগুলি রূপের ভেদ, আর তার ছন্দের তালটিই প্রমাণ।

আলো আর কালো অর্থাৎ আলো আর না-আলোর দ্বন্দ্ব খুবই একান্ত। রংগুলি তারই মাঝখানে মধ্যস্থতা করে। ইহারা যেন বীণার আলাপের মীড়—এই মীড়ের দ্বারা স্বর যেন স্বরের অতীতকে পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে ইসারায় দেখাইয়া দেয়—ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে স্বর আপনাকে অতিক্রম করিয়া চলে। তেমনি রঙের ভঙ্গী দিয়া রেখা আপনাকে অতিক্রম করে, রেখা যেন অরেখার দিকে আপন ইসারা চালাইতে থাকে। রেখা জিনিষটা সুনির্দ্দিষ্ট,—আর রং জিনিষটা নির্দ্দিষ্ট অনির্দ্দিষ্টের সেতু, তাহা সাদা কালোর মাঝখানকার নানা টানের মীড়। সীমার বাঁধনে বাঁধা কালো-রেখার ভাবটাকে সাদা যেন খুব তীব্র করিয়া আপনার দিকে টানিতেছে, কালো তাই কড়ি হইতে অতিকোমলের ভিতর দিয়া রঙে রঙে অসীমকে স্পর্শ করিয়া চলিয়াছে। তাই বলিতেছি রং জিনিষটা রেখা এবং অরেখার মাঝখানের সমস্ত ভঙ্গী। রেখা ও অরেখার মিলনে যে ছবির সৃষ্টি সেই ছবিতে এই মধ্যস্থের প্রয়োজন। অরেখ সাদার বুকের উপর যেখানে রেখা-কালীর নৃত্য সেখানে এই রংগুলি যোগিনী। শাস্ত্রে ইহাদের নাম সকলের শেষে থাকিলেও ইহাদের কাজ নেহাৎ কম নয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সাদার উপর শুধু-রেখার ছবি হয়, কিন্তু সাদার উপর শুধু-রঙে ছবি হয় না। তার কারণ, রং জিনিষটা মধ্যস্থ—দুই পক্ষের মাঝখানে ছাড়া কোনো স্বতন্ত্র জায়গায় তার অর্থই থাকে না।

এই গেল বর্ণিকাভঙ্গ।

এই ছবির ছয় অঙ্গের সঙ্গে কবিতার কিরূপ মিল আছে তাহা দেখাইলেই কথাটা বোঝা হয়তো সহজ হইবে।

ছবির স্থূল উপাদান যেমন রেখা তেমনি কবিতার স্থূল উপাদান হইল বাণী। সৈন্যদলের চালের মতো সেই বাণীব চালে একটা ওজন একটা প্রমাণ আছে—তাহাই ছন্দ। এই বাণী ও বাণীর প্রমাণ বাহিরের অঙ্গ, ভিতরের অঙ্গ ভাব ও মাধুর্য্য।

এই বাহিবের সঙ্গে ভিতরকে মিলাইতে হইবে। বাহিবের কথাগুলি ভিতরের ভাবের সদৃশ হওয়া চাই, তাহা হইলেই সমস্তটায় মিলিয়া কবির কাব্য কবির কল্পনার সাদৃশ্য লাভ করিবে।

বহিঃসাদৃশ্য, অর্থাৎ রূপের সঙ্গে রূপের সাদৃশ্য, অর্থাৎ যেটাকে দেখা যায় সেইটাকে ঠিকঠাক করিয়া বর্ণনা করা কবিতাব প্রধান জিনিষ নহে। তাহা কবিতায় লক্ষ্য নহে উপলক্ষ্য মাত্র। এইজন্য বর্ণনামাত্রই যে-কবিতাব পরিণাম, রসিকেবা তাহাকে উঁচুদরের কবিতা বলিয়া গণ্য করেন না। বাহিরকে ভিতবের করিয়া দেখা ও ভিতবকে বাহিবের রূপে ব্যক্ত করা ইহাই কবিতা এবং সমস্ত আর্টেবই লক্ষ্য।

সৃষ্টিকর্ত্তা একেবারেই আপন পবিপূর্ণতা হইতে সৃষ্টি করিতেছেন তাঁব আব-কোনো উপসর্গ নাই। কিন্তু বাহিরেব সৃষ্টি মানুষের ভিতবেব তাবে ঘা দিয়া যখন একটা মানস পদার্থকে জন্ম দেয়, যখন একটা রসের সুর বাজায় তখনই সে আব থাকিতে পারে না, বাহিরে সৃষ্ট হইবার কামনা করে। ইহাই মানুষের সকল সৃষ্টির গোড়ার কথা। এই জন্যই মানুষেব সৃষ্টিতে ভিতর বাহিবেব ঘাত প্রতিঘাত। এই জন্য মানুষের সৃষ্টিতে বাহিরের জগতেব আধিপত্য আছে। কিন্তু একাধিপত্য যদি থাকে, যদি প্রকৃতির ধামা-ধরা হওয়াই কোনো আর্টিষ্টের কাজ হয় তবে তাব দ্বারা সৃষ্টিই হয় না। শবীব বাহিরের খাবার খায় বটে কিন্তু

তাহাকে অবিকৃত বমন করিবে বলিয়া নয়। নিজের মধ্যে তাহার বিকার, জন্মাইয়া তাহাকে নিজের করিয়া লইবে বলিয়া। তখন সেই খাদ্য একদিকে রসরক্তরূপে বাহ্য আকার, আরেক দিকে শক্তি স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য-রূপে আন্তর আকার ধারণ করে। ইহাই শরীরের সৃষ্টিকার্য্য। মনের সৃষ্টিকার্য্যও এমনিতরো। তাহা বাহিরের বিশ্বকে বিকারের দ্বারা যখন আপনার করিয়া লয় তখন সেই মানস পদার্থটা একদিকে বাক্য রেখা সুর প্রভৃতি বাহ্য আকার, অন্যদিকে সৌন্দর্য্য শক্তি প্রভৃতি আন্তর আকার ধারণ করে। ইহাই মনের সৃষ্টি—যাহা দেখিলাম অবিকল তাহাই দেখানো সৃষ্টি নহে।

তারপরে, ছবিতে যেমন বর্ণিকাভঙ্গং, কবিতায় তেমনি ব্যঞ্জনা (Suggestiveness)। এই ব্যঞ্জনার দ্বারা কথা আপনার অর্থকে পার হইয়া যায়। যাহা বলে তার চেয়ে বেশি বলে। এই ব্যঞ্জনা ব্যক্ত ও অব্যক্তর মাঝখানকার মীড়। কবির কাব্যে এই ব্যঞ্জনা বাণীর নির্দ্দিষ্ট অর্থের দ্বারা নহে, বাণীর অনির্দ্দিষ্ট ভঙ্গীর দ্বারা, অর্থাৎ বাণীর রেখার দ্বারা নহে, তাহার রঙের দ্বারা সৃষ্ট হয়।

আসল কথা, সকল প্রকৃত আর্টেই একটা বাহিরের উপকরণ, আর একটা চিত্তের উপকরণ থাকা চাই—অর্থাৎ একটা রূপ, আর একটা ভাব। সেই উপকরণকে সংযমের দ্বারা বাঁধিয়া গড়িতে হয়; বাহিরের বাঁধন প্রমাণ, ভিতরের বাঁধন লাবণ্য। তার পরে সেই ভিতর বাহিরের উপকরণকে মিলাইতে হইবে কিসের জন্য? সাদৃশ্যের জন্য। কিসের সঙ্গে সাদৃশ্য? না, ধ্যানরূপের সঙ্গে কল্পরূপের সঙ্গে সাদৃশ্য। বাহিরের রূপের সঙ্গে সাদৃশ্যই যদি মুখ্য লক্ষ্য হয় তবে ভাব ও লাবণ্য কেবল যে আবশ্যক হয় না তাহা নহে, তাহা বিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়। এই সাদৃশ্যটিকে ব্যঞ্জনার রঙে রঙাইতে পারিলে সোনায় সোহাগা—কারণ তখন তাহা সাদৃশ্যের চেয়ে বড়ো হইয়া ওঠে,—তখন তাহা কতটা যে

বলিতেছে তাহা স্বয়ং রচয়িতাও জানে না—তখন সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি তাহার সংকল্পকেও ছাড়াইয়া যায়।

অতএব, দেখা যাইতেছে ছবির যে ছয় অঙ্গ, সমস্ত আর্টের অর্থাৎ আনন্দরূপেরই তাই।

১৩২২

শরৎ

ইংরেজের সাহিত্যে শরৎ প্রৌঢ়। তার যৌবনের টান সবটা আলগা হয় নাই, ওদিকে তাকে মরণের টান ধরিয়াছে। এখনো সব চুকিয়া যায় নাই কেবল সব ঝরিয়া যাইতেছে।

একজন আধুনিক ইংরেজ কবি শরৎকে সম্ভাষণ করিয়া বলিতেছেন, "তোমার ঐ শীতের আশঙ্কাকুল গাছগুলাকে কেমন যেন আজ ভূতের মতো দেখাইতেছে, হায় রে, তোমার কুঞ্জবনের ভাঙা হাট, তোমার ঐ ভিজা পাতার বিবাগী হইয়া বাহির হওয়া। যা অতীত এবং যা আগামী তাদের বিষণ্ণ বাসরশয্যা তুমি রচিয়াছ। যা-কিছু ম্রিয়মাণ তুমি তাদেরই বাণী, যত-কিছু গতস্য শোচনা তুমি তারই অধিদেবতা।"

কিন্তু এ শরৎ আমাদের শরৎ একেবারেই নয়, আমাদের শরতের নীল চোখের পাতা দেউলে-হওয়া যৌবনের চোখের জলে ভিজিয়া ওঠে নাই। আমার কাছে আমাদের শরৎ শিশুর মূর্ত্তি ধরিয়া আসে।

সে একেবারে নবীন। বর্ষার গর্ভ হইতে এইমাত্র জন্ম লইয়া ধরণী ধাত্রীর কোলে শুইয়া সে হাসিতেছে।

তার কাঁচা দেহখানি, সকালে শিউলিফুলের গন্ধটি সেই কচি-গায়ের গন্ধের মতো। আকাশে আলোকে গাছেপালায় যা-কিছু রং দেখিতেছি সে তো প্রাণেরই রং, একেবারে তাজা।

প্রাণের একটি রং আছে। তা ইন্দ্রধনুর গাঁঠ হইতে চুরি-করা লাল নীল সবুজ হল্‌দে প্রভৃতি কোনো বিশেষ রং নয়, তা কোমলতার রং। সেই রং দেখিতে পাই ঘাসে পাতায়, আর দেখি মানুষের গায়ে। জন্তুর কঠিন চর্মের উপরে সেই প্রাণের রং ভালো করিয়া ফুটিয়া ওঠে নাই সেই লজ্জায় প্রকৃতি তাকে রং-বেরঙের লোমের ঢাকা দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছে। মানুষের গা-টিকে প্রকৃতি অনাবৃত করিয়া চুম্বন করিতেছে।

যাকে বাড়িতে হইবে তাকে কড়া হইলে চলিবে না, প্রাণ সেইজন্য কোমল। প্রাণ জিনিষটা অপূর্ণতার মধ্যে পূর্ণতার ব্যঞ্জনা। সেই ব্যঞ্জনা যেই শেষ হইয়া যায় অর্থাৎ যখন, যা আছে কেবলমাত্র তাই আছে, তার চেয়ে আরো-কিছুর আভাস নাই তখন মৃত্যুতে সমস্তটা কড়া হইয়া ওঠে, তখন লাল নীল সকল রকম রংই থাকিতে পারে কেবল প্রাণের রং থাকে না।

শরতের রংটি প্রাণের রং। অর্থাৎ তাহা কাঁচা, বড়ো নরম। রৌদ্রটি কাঁচা সোনা, সবুজটি কচি, নীলটি তাজা। এইজন্য শরতে নাড়া দেয় আমাদের প্রাণকে, যেমন বর্ষায় নাড়া দেয় আমাদের ভিতর-মহলের হৃদয়কে, যেমন বসন্তে নাড়া দেয় আমাদের বাহির-মহলের যৌবনকে।

বলিতেছিলাম শরতের মধ্যে শিশুর ভাব। তার, এই-হাসি, এই-কান্না। সেই হাসিকান্নার মধ্যে কার্য্যকারণের গভীরতা নাই, তাহা

এম্‌নি হাল্কাভাবে আসে এবং যায় যে, কোথাও তার পায়ের দাগটুকু পড়ে না,—জলের ঢেউয়ের উপরটাতে আলোছায়া ভাইবোনের মতো যেমন কেবলই দুরন্তপনা করে অথচ কোনো চিহ্ন রাখে না।

ছেলেদের হাসিকান্না প্রাণের জিনিষ, হৃদয়ের জিনিষ নহে। প্রাণ জিনিষটা ছিপের নৌকার মতো ছুটিয়া চলে তাতে মাল বোঝাই নাই; সেই ছুটিয়া-চলা প্রাণের হাসিকান্নার ভার কম। হৃদয় জিনিষটা বোঝাই নৌকা, সে ধরিয়া রাখে, ভরিয়া রাখে,—তার হাসিকান্না চলিতে চলিতে ঝরাইয়া ফেলিবার মতো নয়। যেমন ঝরনা, সে ছুটিয়া চলিতেছে বলিয়াই ঝলমল করিয়া উঠিতেছে। তার মধ্যে ছায়া আলোর কোনো বাসা নাই, বিশ্রাম নাই। কিন্তু এই ঝরনাই উপত্যকায় যে সরোবরে গিয়া পড়িয়াছে, সেখানে আলো যেন তলায় ডুব দিতে চায়, সেখানে ছায়া যেন জলের গভীর অন্তরঙ্গ হইয়া উঠে। সেখানে স্তব্ধতার ধ্যানের আসন।

কিন্তু প্রাণের কোথাও আসন নাই, তাকে চলিতেই হইবে, তাই শরতের হাসিকান্না কেবল আমাদের প্রাণপ্রবাহের উপরে ঝিকিমিকি করিতে থাকে, যেখানে আমাদের দীর্ঘনিশ্বাসের বাসা সেই গভীরে গিয়া সে আটকা পড়ে না। তাই দেখি শরতের রৌদ্রের দিকে তাকাইয়া মনটা কেবল চলি-চলি করে, বর্ষার মতো সে অভিসারের চলা নয়, সে অভিমানের চলা।

বর্ষায় যেমন আকাশের দিকে চোখ যায় শরতে তেমনি মাটির দিকে। আকাশ-প্রাঙ্গণ হইতে তখন সভার আস্তরণখানা গুটাইয়া লওয়া হইতেছে, এখন সভার জায়গা হইয়াছে মাটির উপরে। একেবারে মাঠের এক পার হইতে আর এক পার পর্য্যন্ত সবুজে ছাইয়া গেল, সেদিক হইতে আর চোখ ফেরানো যায় না।

শিশুটি কোল জুড়িয়া বসিয়াছে সেইজন্যই মায়ের কোলের দিকে

এমন করিয়া চোখ পড়ে। নবীন প্রাণের শোভায় ধরণীব কোল আজ এমন ভরা। শরৎ বড়ো বড়ো গাছের ঋতু নয়, শরৎ ফসলক্ষেতের ঋতু। এই ফসলেব ক্ষেত একেবারে মাটির কোলেব জিনিষ। আজ মাটির যত আদব সেইখানেই হিল্লোলিত, বনস্পতি দাদাবা একধারে চুপ কবিয়া দাঁড়াইয়া তাই দেখিতেছে।

এই ধান, এই ইক্ষু, এরা যে ছোটো, এবা যে অল্পকালের জন্য আসে, ইহাদেব যত শোভা যত আনন্দ সেই দুদিনের মধ্যে ঘনাইয়া তুলিতে হয়। সূর্য্যের আলো ইহাদের জন্য যেন পথের ধারের পানসত্রেব মতো—ইহারা তাড়াতাড়ি গণ্ডূষ ভবিয়া সূর্য্যকিরণ পান কবিয়া লইয়াই চলিয়া যায়—বনস্পতির মতো জল বাতাস মাটিতে ইহাদেব অন্নপানেব বাঁধাবরাদ্দ নাই, ইহাবা পৃথিবীতে কেবল আতিথ্যই পাইল, আবাস পাইল না। শরৎ পৃথিবীর এই সব ছোটোদের এই সব ক্ষণজীবীদের ক্ষণিক উৎসবেব ঋতু। ইহাবা যখন আসে তখন কোল ভরিয়া আসে, যখন চলিয়া যায় তখন শূন্য প্রান্তবটা শূন্য আকাশের নিচে হা-হা করিতে থাকে। ইহারা পৃথিবীব সবুজ মেঘ, হঠাৎ দেখিতে দেখিতে ঘনাইয়া ওঠে, তার পবে প্রচুব ধারায় আপন বর্ষণ সাবিয়া দিয়া চলিয়া যায়, কোথাও নিজেব কোনো দাবিদাওয়ার দলিল বাখে না।

আমবা তাই বলিতে পারি, হে শরৎ, তুমি শিশিবাশ্রু ফেলিতে ফেলিতে গত এবং আগতেব ক্ষণিক মিলনশয্যা পাতিয়াছ। যে বর্ত্তমানটুকুব জন্য অতীতের চতুর্দোলা দ্বারেব কাছে অপেক্ষা করিয়া আছে, তুমি তাবি মুখচুম্বন কবিতেছ, তোমার হাসিতে চোখের জল গড়াইয়া পডিতেছে।

মাটির কন্যার আগমনীব গান এই তো সেদিন বাজিল। মেঘেব নন্দীভৃঙ্গী শিঙা বাজাইতে বাজাইতে গৌরী শারদাকে এই কিছু দিন

হইল ধরা-জননীর কোলে রাখিয়া গেছে। কিন্তু বিজয়ার গান বাজিতে আর তো দেরি নাই, শ্মশানবাসী পাগলটা এল বলিয়া,—তাকে তো ফিরাইয়া দিবার জো নাই,—হাসির চন্দ্রকলা তার ললাটে লাগিয়া আছে, কিন্তু তার জটায় জটায় কান্নার মন্দাকিনী।

শেষকালে দেখি ঐ পশ্চিমের শরৎ আর এই পূর্ব্বদেশের শরৎ একই জায়গায় আসিয়া অবসান হয়—সেই দশমী রাত্রির বিজয়ার গানে। পশ্চিমের কবি শরতের দিকে তাকাইয়া গাহিতেছেন, "বসন্ত তার উৎসবের সাজ বৃথা সাজাইল, তোমার নিঃশব্দ ইঙ্গিতে পাতার পর পাতা খসিতে খসিতে সোনার বৎসর আজ মাটিতে মিশিয়া মাটি হইল যে।"—তিনি বলিতেছেন, "ফাল্গুনের মধ্যে মিলন-পিপাসিনীর যে রস-ব্যাকুলতা তাহা শান্ত হইয়াছে, জ্যৈষ্ঠের মধ্যে তপ্ত-নিশ্বাস-বিক্ষুব্ধ যে হৃৎস্পন্দন তাহা স্তব্ধ হইয়াছে। ঝড়ের মাতনে লণ্ডভণ্ড অরণ্যের গায়ন সভায় তোমার ঝোড়ো বাতাসের দল তাহাদের প্রেতলোকের রুদ্রবীণায় তার চড়াইতেছে তোমারি মৃত্যুশোকের বিলাপ গান গাহিবে বলিয়া। তোমার বিনাশের শ্রী তোমার সৌন্দর্য্যের বেদনা ক্রমে সুতীব্র হইয়া উঠিল, হে বিলীয়মান মহিমার প্রতিরূপ।"

কিন্তু তবুও পশ্চিমে যে শরৎ, বাষ্পের ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া আসে, আর আমাদের ঘরে যে শরৎ মেঘের ঘোমটা সরাইয়া পৃথিবীর দিকে হাসি মুখখানি নামাইয়া দেখা দেয়, তাদের দুইয়ের মধ্যে রূপের এবং ভাবের তফাৎ আছে। আমাদের শরতে আগমনীটাই ধুয়া। সেই ধুয়াতেই বিজয়ার গানের মধ্যেও উৎসবের তান লাগিল। আমাদের শরতে বিচ্ছেদ-বেদনার ভিতরেও একটা কথা লাগিয়া আছে যে, বারে বারে নূতন করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে বলিয়াই চলিয়া যায়—তাই ধরার আঙিনায় আগমনী-গানের আর অন্ত নাই। যে লইয়া যায় সেই

আবার ফিরাইয়া আনে। তাই সকল উৎসবের মধ্যে বড়ো উৎসব এই হারাইয়া ফিরিয়া পাওয়ার উৎসব।

কিন্তু পশ্চিমে শরতের গানে দেখি পাইয়া হারানোর কথা। তাই কবি গাহিতেছেন, "তোমার আবির্ভাবই তোমার তিরোভাব। যাত্রা এবং বিদায় এই তোমাব ধূয়া, তোমার জীবনটাই মরণের আড়ম্বর, আর তোমাব সমারোহেব পরম পূর্ণতার মধ্যেও তুমি মায়া, তুমি স্বপ্ন।"

১৩২২

চিঠির টুকরি

চিঠির টুক্‌রি

শান্তিনিকেতন
১৯ চৈত্র, ১৩৩২

সেই পাগল কবি বেচারা দিন তিনেক এখানে ছিল। কথায়বার্ত্তায় হঠাৎ তাকে পাগল ব'লে চেনা যায় না। একটুখানির জন্যে ওর তার ছিঁড়ে গেছে অথচ হয়তো ওর যন্ত্রটি ভালো ক'রেই গড়া ছিল। আমাদের সকলের মধ্যেই একটা পাগল আছে, সে আমাদের সব দেখা ও ভাবার মধ্যে নিজের খেয়ালী রং মিশিয়ে দেয়, আমাদের ছবির মধ্যে নিজের তুলি বুলোয়, আমাদের গানের মধ্যে নিজের সুর লাগিয়ে বসে। ফলের মধ্যে আঁঠির কর্ত্তা হচ্ছেন জ্ঞানী, তিনি তাকে পাকা রকমে পাহারা দেন, আর ফলের মধ্যেকার পাগল ব'সে ব'সে খামকা তার খোসার উপর রং মাখায়, যে-খোসা ফেলে দিতে হবে; তার শাঁসের মধ্যে রসের সাধনা করে যে-শাঁস দুদিনে যাবে নষ্ট হয়ে; তাতে পাগলের খেয়াল নেই। যে-পাগলের তুলি রং দিতে গিয়ে খোঁচা দিয়ে বসে, তাকে নিয়েই বিপদ। জীবনের মধ্যে পাগলের খোঁচা সম্পূর্ণ এড়ানো চলে না—এড়াতে পারলে বেশ ঠাণ্ডা হয়ে দিনে ঘুমিয়ে তাসপাশা খেলে নিরাপদভাবে সংসারযাত্রা ক'রে নাতিনাৎনীর মুখ দেখে কোম্পানীর কাগজ জমিয়ে আয়ুটিকে বায়ুর ধাক্কা থেকে বাঁচিয়ে চলা যেতে পারত। সে আর হয়ে উঠল না।

---

২৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩

কিছু খবর দেবার চেষ্টা করব। নইলে চিঠি বেশি ভাবি হয়ে পড়ে। অনেকদিন থেকে চিঠিতে খবর চালান দেবার অভ্যাস চলে গেছে। এটা একটা ত্রুটি। কেননা আমরা খবরের মধ্যেই বাস করি। যদি তোমাদের কাছে থাকতুম তাহোলে তোমরা আমাকে নানাবিধ খবরের মধ্যেই দেখতে, কী হোলো এবং কে এল এবং কী করলুম এইগুলোর মধ্যে গেঁথে নিয়ে তবে আমাকে স্পষ্ট ধরতে পারা যায়। চিঠির প্রধান কাজ হচ্চে সেই গাঁথন সূত্রটিকে যথাসম্ভব অবিচ্ছিন্ন ক'রে রাখা। আমি যে বেঁচে বর্ত্তে আছি সেটা হোলো একটা সাধারণ তথ্য—কিন্তু সেই আমার থাকার সঙ্গে আমার চারিদিকের বিচিত্র যোগবিয়োগের ঘাতপ্রতিঘাতের দ্বারাই আমি বিশেষভাবে প্রত্যক্ষগোচর। এইজন্যেই চিঠিতে খবর দিতে হয়—দূরে থাকলে পরস্পরের মধ্যে সেই প্রত্যক্ষতাকে চালাচালি করবার দরকার হয়। প্রয়োজনটা বুঝি কিন্তু সত্যিকার চিঠি লেখার যে আর্ট সেটা খুইয়ে বসে আছি। তার কারণ হচ্চে কাছে থাকলে তুমি আমাকে আমার চারিদিকের নব নব ব্যাপারের সঙ্গে মিলিয়ে যেমন ক'রে দেখতে, আমি নিজেকে তেমন ক'রে দেখিনে। অন্যমনস্ক স্বভাবের জন্যে আমি চারিদিককে বড়ো বেশি বাদ দিয়ে দেখি। সেইজন্যে যা ঘটে তা পরক্ষণেই ভুলে যাই—ঐতিহাসিকের মতো ঘটনাগুলোকে দেশকালের সঙ্গে গেঁথে রাখতে পারিনে। তার মুস্কিল আছে। তোমরা কেউ যখন আমার সম্বন্ধে কোনো নালিশ উপস্থিত করো তখন তোমাদের পক্ষের প্রমাণগুলোকে বেশ সুসম্বদ্ধ সাজিয়ে ধরতে পারো—আমার পক্ষের প্রমাণগুলো দেখি আমার আনমনা চিত্তের নানা ফাঁকের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে গেছে। আমি কেবল আমার ধারণা উপস্থিত করতে

পারি। কিন্তু ধারণা জিনিষটা বহুবিস্তৃত প্রমাণের সম্মিলনে তৈরী। সে প্রমাণগুলোকে সপিনে দিয়ে সাক্ষ্যমঞ্চে আনা যায় না। যাদের ধারণাগুলো শনিগ্রহের মতো বহু প্রমাণমণ্ডলের দ্বারা সর্ব্বদাই পরিবেষ্টিত তাদের ধারণার সঙ্গে আমার ধারণার ঠোকাঠুকি হোলে আমার পক্ষেই দুর্ব্বিপাক ঘটে।

শান্তিনিকেতন
২৭ পৌষ, ১৩৩৩

আমার মনটা স্বভাবতই নদীর ধারার মতো, চলে আর বলে একসঙ্গেই,—বোবার মতো অবাক হয়ে বইতে পারে না। এটা যে ভালো অভ্যাস তা নয়। কারণ মুছে ফেলবার কথাকে লিখে ফেললে তাকে খানিকটা স্থায়িত্ব দেওয়া হয়—যার বাঁচবার দাবী নেই সেও বাঁচবার জন্যে লড়তে থাকে। ডাক্তারী শাস্ত্রের উন্নতির কল্যাণে অনেক মানুষ খামকা বেঁচে থাকে প্রকৃতি যাকে বাঁচবার পরোয়ানা দিয়ে পাঠাননি—তারা জীবলোকের অন্ন ধ্বংস করে। আমাদের মনে যখন যা উপস্থিত হয় তার পাসপোর্ট বিচার না ক'রেই তাকে যদি লেখনরাজ্যে ঢুকতে দেওয়া হয় তাহোলে সে গোলমাল ঘটাতে পারে। যে কথাটা ক্ষণজীবী তাকেও অনেকখানি আয়ু দেবার শক্তি সাহিত্যিকের কলমে আছে, সেটাতে বেশি ক্ষতি হয় না সাহিত্যে। কিন্তু লোক-ব্যবহারে হয় বই কি। চিন্তাকে আমি তাড়াতাড়ি রূপ দিয়ে ফেলি—সব সময়ে সেটা অযথা হয় তা নয়—কিন্তু জীবনযাত্রায় পদে পদে এই রকম রূপকারের কাজের চেয়ে চুপকারের কাজ অনেক

ভালো। আমি প্রগল্‌ভ, কিন্তু যারা চুপ করতে জানে তাদের শ্রদ্ধা করি। যে-মনটা কথায় কথায় চেঁচিয়ে কথা কয় তাকে আমি এখানকার নির্ম্মল আকাশের নিচে গাছতলায় ব'সে চুপ করাতে চেষ্টা করছি। এই চুপের মধ্যে শান্তি পাওয়া যায়, সত্যও পাওয়া যায়। প্রত্যেক নূতন অবস্থার সঙ্গে জীবনকে খাপ খাওয়াতে গিয়ে নানা জায়গায় ঘা লাগে—তখনকার মতো সেগুলো প্রচণ্ড—নতুন চলতে গিয়ে শিশুদের প'ড়ে যাওয়ার মতো—তা নিয়ে আহা উহু করতে গেলেই ছেলেদের কাঁদিয়ে তোলা হয়—বুদ্ধি যার আছে সে এমন জায়গায় চুপ ক'রে যায়—কেননা সব-কিছুকেই মনে-রাখা মনের শ্রেষ্ঠ শক্তি নয়, ভোলবার জিনিষকে ভুলতে দেওয়াতেও তার শক্তির পরিচয়।

শান্তিনিকেতন

২৫ মাঘ, ১৩৩৩

আমার চিঠি লেখার বয়স চলে গেছে—এখন দু'লাইন চিঠি লেখার চেয়ে গাড়ি ভাড়া ক'রে বাড়িতে গিয়ে ব'লে আসা অনেক সহজ বোধ হয়। কলমের ভিতর দিয়ে কথা কইতে গেলে কথার প্রাণগত অনেকটা অংশ এদিক ওদিক দিয়ে ফ'সকে যায়—যখন মনের শক্তি প্রচুর থাকে তখন বাদ সাদ দিয়েও যথেষ্ট উদ্বৃত্ত থাকে—তাই তখন লেখার বকুনিতে অভাবের লক্ষণ দেখা যায় না। এখন বাণী সহজে বকুনিতে উছ্‌লে উঠতে বাধা পায়—তাই কলমের ডগায় কথার ধারা ক্ষীণ হয়ে আসে, বোধ হয় এইজন্যেই লেখবার দুঃখ স্বীকার করতে মন রাজি হয় না।

তা হোক্ গে, তবু তোমাকে কিছু বলা যাক। কোনো ঘটনার বিবরণ নয়, নিছক ভিতরের কথা। অন্তর অন্তরীক্ষের মেঘ ও রৌদ্রের

লীলা। সময় অনুকূল নয়, নানা চিন্তা, নানা অভাব, নানা আঘাত সংঘাত। ক্ষণে ক্ষণে ভিতরে ভিতরে অবসাদের ছায়া ঘনিয়ে আসে, একটা পীড়াব হাওয়া মনের একদিক থেকে আর-একদিকে হুহু ক'রে বইতে থাকে। এমন সময় চ'মকে উঠে' মনে প'ড়ে যায় যে এ ছায়াটা "আমি" ব'লে একটা রাহুর। সে রাহুটা সত্য পদার্থ নয়। তখন মনটা ধড়ফড় ক'রে চেঁচিয়ে উঠে' ব'লে ওঠে—ও নেই ও নেই। দেখতে দেখতে মন পরিষ্কার হয়ে যায়। বাড়ির সামনের কাঁকর-বিছানো লাল রাস্তায় বেড়াই আর মনের মধ্যে এই ছায়া-আলোর দ্বন্দ্ব চলে। বাইরে থেকে যারা দেখে তারা কে জানবে ভিতরে একটা সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলছে। এ সৃষ্টির কি আমারই মনের মধ্যে আরম্ভ আমারই মনের মধ্যে অবসান? বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে এর কি কোনো চিরন্তন যোগসূত্র নেই? নিশ্চয়ই আছে। জগৎ জুড়ে' অসীম কাল ধ'রে একটা কী হয়ে উঠছে, আমাদের চিত্তের মধ্যে বেদনায় বেদনায় তারি একটা ধাক্কা চল্‌ছে। ব্যক্তিগত জীবনে সুখ দুঃখ লাভ ক্ষতি বিচ্ছেদ মিলন নিয়ে যে সব বিশেষ ঘটনার ধারা বয়ে চলে গেল কয়েক বছর পরে কোথাও তার কোনো চিহ্নই থাকবে না—ঝঞ্ঝামথিত সমুদ্রের 'পরে ফেনাগুলোর যেমন কোনো চিহ্নই পাওয়া যায় না। তরুণ পৃথিবীতে আগুন জল হাওয়ার যে প্রচণ্ড তাণ্ডবলীলা চলেছিল সে নৃত্যলীলার নাট্যমঞ্চ আজ একেবারেই নেই—কিন্তু সেই নৃত্যলীলারই চরণ পাতে আজকেকার পৃথিবীর প্রাণ-নিকেতন তৈরি হয়ে উঠেছে—সৃষ্টির উপকরণ ও প্রকরণ বদল হোলো কিন্তু সৃষ্টি রইল। মনের উপর দিয়ে নানা ঘটনার ধাক্কা নানা অবস্থার আলোড়ন তুফান তুলে যায় আজ বাদে কাল তা'রা থাকে না কিন্তু সেই ধাক্কায় যেখানেই এই "আমির" ঘন আবরণ ছিন্ন হয়ে যায় সেইখানেই সত্যের কোনো একটা চিরন্তন রূপসৃষ্টির প্রকাশ হোতে থাকে —আমি তার উপলক্ষ্য মাত্র। সভ্যতার ইতিহাসধারায় মানুষ আজ

যে অবস্থার মধ্যে এসে উত্তীর্ণ হয়েছে—এই অবস্থাসৃষ্টির প্রক্রিয়ার মধ্যে কত কোটি কোটি নামহীন মানুষের ব্যক্তিগত জীবনেব চিরবিস্মৃত চিত্ত-সংঘাত আছে। সৃষ্টির যা-কিছু রয়ে-যাওয়া তা সংখ্যাহীন চ'লে-যাওয়ার প্রতিমুহূর্তের হাতের গড়া। আজ আমার এই জীবনের মধ্যে সৃষ্টির সেই দূতগুলি, সেই চলে-যাওয়ার দল তার কাজ করছে—"আমি" ব'লে পদার্থটা উপলক্ষ্য মাত্র—বাড়ি তৈরির সময় যে-ভারা বাঁধা হয় তা ভারা মাত্র—আজকের দিনে এর প্রয়োজনীয়তার প্রাধান্য যতই থাক্ কালকের দিনে যখন এর চিহ্ন মাত্র থাকবে না তখন কারো গায়ে একটুও বাজবে না। ইমারত আপন ভারার জন্যে কোথাও শোক করে না, তার জন্যে সমাধি-মন্দির স্থাপন করে না। মোদ্দা কথাটা এই যে, আজ আমার এই "আমি"-টাকে নিয়ে যে-গড়া-পেটা চলছে, এই লাল কাঁকর বিছানো রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে ভিতরে ভিতরে যা-কিছু উপলব্ধি করছি তার অনেকখানিই আমার নামের স্বাক্ষর মুছে ফেলে দিয়ে মানুষের সৃষ্টিভাণ্ডারে জমা হচ্চে। এই কথা মনে রেখে ক্ষণিকেব আঘাত বেদনাকে যেন তুচ্ছ করতে পারি। মনে যেন রাখি চিরমানব আমার মধ্যে তপস্যা কবছেন—তপস্যার দ্বারাই সৃষ্টি হয়। সেই তপস্যার আগুনে আমার এই "আমি"-ইন্ধন ছাই হয়ে যাক্ না, তাতে ক্ষতি কী? কিন্তু তার অন্তরের দান সবটাই ব্যর্থ হবে না।

শান্তিনিকেতন

৩০ কার্ত্তিক, ১৩৩৪

আজ সকালে বিচ্ছিন্ন মেঘের মধ্যে দিয়ে চমৎকার সূর্য্যোদয় হয়েছিল, ঈষৎ বাষ্পাবিষ্ট তার সকরুণ আলো এখানকার গাছপালা

বাড়িঘর যা-কিছুকে স্পর্শ করছিল তার থেকেই যেন অসীমের সুর বাজিয়ে তুললে। এই হচ্চে চিরপরিপূর্ণতার সুব—আমাদের অহমিকার বেড়াটুকুর মধ্যে যত-কিছু বিঘ্ন বেদনা বিপত্তি—তাকে ডুবিয়ে দিয়ে ভাসিয়ে দিয়ে এই সুর বয়ে যায়। এর আব ক্ষয় নেই—এই তো বিশ্বকে চিবনবীন ক'রে বেখেছে—যত বড়ো আঘাত যত নিবিড় কালিমাই জগতের গায়ে আঁচড় কাটতে থাকে তার কোনো চিহ্নই থাকে না—পরিপূর্ণেব শান্তি সমস্ত ক্ষয়কে অনিষ্টকে নিয়তই পূরণ ক'রে বিরাজ কবে। নইলে ভেবে দেখো অতীতের আবর্জ্জনার কী বিষম বোঝা, ব্যক্তিগত মানুষ ও জাতিগত মানুষেব কত যুগযুগান্তবেব কত বিপুল বেদনা—তার ভার কোথায় গেল। ঐ প্রতিদিন প্রভাতের কাঁচাসোনাকে একটুও ম্লান করতে পারেনি, আব আমার দ্বারের কাছে নীলমণিলতা যে উচ্ছ্বসিত বাণী আকাশে প্রচাব করছে আজ পর্য্যন্ত সে একটুও জীর্ণ হোতে জানল না। আমি ঐখান থেকে আমাব জীবনের মন্ত্র নিতে চাই, কোনো গুরুভাব গুরুবাক্য থেকে নয়—গাছ যেমন ক'বে পাতা মেলে দিয়ে আকাশের আলো থেকে অদৃশ্য অচিহ্নিত পথে ডেকে নেয় আপনার প্রাণ আপনার তেজ। শিশুকালেই এই পরিপূর্ণতাব মন্ত্র আমাব কানে প্রবেশ করেছে—সেই মন্ত্রই আমাকে নানা দুঃসহ শোক দুঃখ অতৃপ্তি নৈরাশ্যের জটিল কঠিন জাল থেকে মুক্তি দিয়ে এসেছে—পরম দুঃখ বেদনাব সময়েই আমি চোখেব জলের ভিতব দিয়ে আরো স্পষ্ট ক'রে দেখতে পাই সে দুঃখকে অতিক্রম ক'রে চিরালোকিত চির মুক্তির দিগন্ত বয়েছে। নইলে আমি এতদিন বাঁচতেই পারতুম না, কেননা বেদনাপবতা আমার মধ্যে যত প্রবল এমন অল্পই দেখেছি—বোধ করি সেইজন্যেই সকল বেদনার অতীত যে সত্য তার মধ্যে মুক্তি পাবার জন্যে আমাব এমন অনববত আকাঙ্ক্ষা।

শান্তিনিকেতন

২৪ আষাঢ়, ১৩৩৫

* * * বৃষ্টি ধরে গেছে, মেঘও গেছে স'রে—চারিদিকে সরস সবুজের চিকণ আভা—একেবারে ঝলমল করছে—বাঙ্গালোরের সেই সবুজ সিল্কের সাড়িতে যেন সোনালি স্থতোর কাজ করা। একটু একটু হাওয়া দিচ্চে। এখন বেলা দুটো। কেয়াফুলের গন্ধ আসছে—টেবিলের একপাশে কে রেখে দিয়েছে। এই বর্ষাদিনের দুপুর-বেলাকার রোদ্দুর ঈষৎ আর্দ্র, তারপরে যেন তন্দ্রার আবেশ আছে; সামনের আকন্দগাছে ফুল ধরেছে, তারই উপরে গোটাকতক প্রজাপতি কেবল ঘুরঘুর ক'রে বেড়াচ্চে—কোথাও কোনো শব্দটিমাত্র নেই—চাকরবাকর আহারে বিশ্রামে রত—ছুতোর মিস্ত্রির দল এখনো কাজ করতে আসেনি, মাঝে মাঝে কেবল পাশের ঘর থেকে এক-একবার কার কাশি শুনতে পাচ্চি। বসে বসে কোনো একটা খেয়ালের কাজ করতে ইচ্ছে করছে—এই "রৌদ্র মাখানো অলস বেলায়" গুন্ গুন্ করতে কিম্বা সৃষ্টিছাড়া ধরণের ছবি আঁকতে—অথচ কোনোটাই করা হবে না—সহজ ইচ্ছেগুলোরই সহজে পূরণ হয় না। আমার ক্লান্তিভরা কুঁড়েমির ডিগ্রিটা অতটুকু কাজ করারও নিচে। সেই আমার গদিওয়ালা মোটা কেদারাটাকে নামিয়ে এনেছি—দক্ষিণের জানালার কাছে ঐটের মধ্যেই এখনি আমার কৈবল্যপ্রাপ্তি হবে ব'লে মনে হচ্চে।

শান্তিনিকেতন

৩১ ভাদ্র, ১৩৩৫

আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন, কিছুদিন থেকে বৃষ্টির অভাব ঘটাতে তরুণ ধানের ক্ষেত পাণ্ডুবর্ণ,—তারা বিদায়কালীন বর্ষার দানের জন্যে

উৎসুক হয়ে আকাশে চেয়ে আছে। মেঘের কৃপণতা নেই কিন্তু বাতাস হয়েছে অন্তরায়। যেই বৃষ্টির আয়োজন প্রায় পূর্ণ হয়ে ওঠে অমনি কুমন্ত্রীর মতো প্রতিকূল হাওয়া কী যে কানে মন্ত্র দেয় উপরিওয়ালার সমস্ত পলিসি যায় ব'দ্‌লে। আকাশের পার্লামেন্টে কয়েকদিন ধ'রে আশা নৈরাশ্যের debate চল্‌ছে—আজ বোধ হচ্চে যেন বাজেট পাস হয়ে গেছে—বর্ষণ হোতে বাধা ঘটবে না। খুব ঝমাঝম যদি বৃষ্টি নামে—তাহোলে চমৎকার লাগবে—এ বৎসরটা আমার কপালে বাদলের সম্ভোগটা মারা গেছে—জোড়াসাঁকোর গলি জলে ভেসে গেছে কিন্তু মনের মধ্যে বর্ষার মৃদঙ্গ নাচের তাল লাগায়নি। এবারকার বর্ষায় গান হোলো না—এমন কার্পণ্য আমার বীণার অনেকদিন ঘটেনি।

শান্তিনিকেতন
১৮ কার্ত্তিক, ১৩৩৫

বর্ষা, শেষ পর্য্যন্ত তার আকাশের সিংহাসন আঁকড়ে রইল, মাঝে মাঝে দু'চারদিন ফাঁক পড়েছে—হোলির রাত্রে হিন্দুস্থানীর দল ক্ষণ-কালের জন্য যেমন তাদের মাদোল পিটুনিতে ক্ষান্ত দেয়, সেই রকম, তারপরেই আবার দ্বিগুণ উৎসাহে কোলাহল সুরু করে। এমনি করতে করতে শরতের মেয়াদ ফুরিয়ে গেল—হেমন্ত এসে হাজির। ধরাতলে শিউলি মালতী বর্ষার অভ্যর্থনার আয়োজন যথেষ্ট করেছে, কিন্তু আকাশ-তলে দেবতা পথ আট্‌কে ছিলেন। শীতের বাতাস সুরু হয়েছে, গায়ে গরম কাপড় চড়িয়েছি। ভালোই লাগ্‌ছে—বিশেষত বেলা দশটার পর থেকে প্রান্তরের উপর যখন পৃথিবীর রোদ পোহাবার সময় আসে—নির্ম্মল

আকাশে একটা ছুটির ঘোষণা হোতে থাকে—পথ দিয়ে পথিকেরা চলে, মনে হয় যেন ছবি রচনায় সাহায্য করবার জন্যেই, তাদের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। আমি প্রায় প্রত্যেক চিঠিতেই আমার এই চেয়ে দেখার বিবরণটা লিখি। পৃথিবী কিছুতেই আমাব কাছে পুরানো হোলো না—ওব সঙ্গে আমাব মোকাবিলা চল্‌ছে এইটেই আমাব সব খবরের চেয়ে বড়ো খবর।

শান্তিনিকেতন
২১ কার্ত্তিক, ১৩৩৫

আমার এখানকার সব প্রধান দৈনিক খবর হচ্চে ছবি আঁকা। রেখার মায়াজালে আমার সমস্ত মন জড়িয়ে পড়েছে। অকালে অপবিচিতাব প্রতি পক্ষপাতে কবিতা একেবারে পাড়া ছেড়ে চলে গেছে। কোনোকালে যে কবিতা লিখ্‌তুম সে কথা ভুলে গেছি। এই ব্যাপাবটা মনকে এত ক'রে যে আকর্ষণ কবছে তাব প্রধান কারণ এর অভাবনীয়তা। কবিতার বিষয়টা অস্পষ্টভাবেও গোড়াতেই মাথায় আসে, তাব পরে শিবের জটা থেকে গোমুখী বেয়ে যেমন গঙ্গা নামে তেমনি ক'রে কাব্যের ঝরনা কলমের মুখে তট রচনা করে, ছন্দ প্রবাহিত হোতে থাকে। আমি যে সব ছবি আঁকার চেষ্টা করি তাতে ঠিক তার উল্টো প্রণালী—রেখার আমেজ প্রথমে দেখা দেয় কলমের মুখে তারপরে যতই আকার ধারণ কবে ততই সেটা পৌঁছতে থাকে মাথায়। এইরূপ সৃষ্টির বিস্ময়ে মন মেতে ওঠে। আমি যদি পাকা আর্টিস্‌ট্ হতুম তাহোলে গোড়াতেই সঙ্কল্প ক'বে ছবি আঁকতুম, মনের জিনিষ বাইরে খাড়া হোত—তাতেও

আনন্দ আছে। কিন্তু বাইরের রচনায় মনকে যখন আবিষ্ট করে তখন তাতে আরো যেন বেশি নেশা। ফল হয়েছে এই যে, বাইরের আর সমস্ত কাজ দরজার বাইরে এসে উঁকি মেরে হাল ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্চে। যদি সেকালের মতো কর্ম্মদায় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতুম—তাহোলে পদ্মার তীরে ব'সে কালের সোনার তরীর জন্যে কেবলি ছবির ফসল ফলাতুম—এখন নানা দায়ের ভিড় ঠেলে ওর জন্যে অল্পই একটু জায়গা করতে পারি—তাতে মন সন্তুষ্ট হয় না—ও চাচ্চে আকাশের প্রায় সমস্তটাই, আমারো দিতে আগ্রহ—কিন্তু গ্রহদের চক্রান্তে নানা বাধা এসে জোটে জগতের হিতসাধন তার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান।

শান্তিনিকেতন
২৫ কার্ত্তিক, ১৩৩৫

এতদিনে আমাদের মাঠের হাওয়ার মধ্যে শীত এসে পৌঁছল। এখনো তার সব গাঁঠরি খোলা হয়নি। কিন্তু আকাশে তাঁবু পড়েছে। বাতাসে ঘাসগুলো গাছের পাতাগুলো একটু একটু সির্ সির্ করতে আরম্ভ করল। তরুণ শীতের এই আমেজটায় কঠোরে কোমলে মিশোল আছে। সন্ধ্যাবেলায় বাইরে বসি কিন্তু ঘরের ভিতরকার নিভৃত আলোটি পিছন থেকে মৃদুস্বরে ডাক দিতে থাকে—প্রথমে গায়ের কাপড়টা একটু ভাল ক'রে জড়িয়ে নিই, তার খানিকটা পরে মনটা উঠি-উঠি করে—অবশেষে ঘরে ঢুকে কেদারাটায় আরাম ক'রে ব'সে মনে হয় এটুকুর দরকার ছিল। এখন দুপুর বেলার মেঘমুক্ত আকাশের রোদ্দুর সমস্ত মাঠে কেমন যেন তন্দ্রালসভাবে এলিয়ে রয়েছে; সামনে ঐ দুটো

বেঁটে পরিপুষ্ট জামগাছ পূর্ব্ব উত্তরদিকে ঘাসের উপর এক-এক পোঁচ ছায়া টেনে দিয়েছে। আজ ওখানে একটিও গরু নেই, সমস্ত মাঠ শূন্য, সবুজ রঙের একটা প্রলেপ আছে কিন্তু তার প্রাচুর্য্য অনেক কম। ঐ আমাদের টগর বীথিকার গাছগুলি রোদ্দুরে ঝিলিমিলি এবং হাওয়ায় দোলাদুলি করছে। বাতাস এখনও তেতে উঠল না। নিঃশব্দতার ভিতরে ঐ রাঙা রাস্তায় গরুর গাড়ীর একটা আর্ত্তস্বর মাঝে মাঝে শোনা যাচ্চে—আর, কী জানি কী সব পাখীর অনির্দ্দিষ্ট ক্ষীণ আওয়াজ যেন নীরবতার সাদা খাতায় সরু সরু রেখায় ছেলেমানুষি হিজিবিজি কাটছে। জানি না, কেন আমার মনে পড়ছে বহুকাল আগে সেই যে হাজারিবাগে গিয়েছিলুম—ডাকবাংলার সামনের মাঠে হাতাওয়ালা কেদারায় আমি অর্দ্ধশয়ান, রোদ্দুর পরিণত হয়ে উঠেছে, কাজকর্ম্মের বেলা হোলো—মাঝে মাঝে অনতিদূরে ঘণ্টা বাজে। সেই ঘণ্টার ধ্বনি ভারি উদাস।—আজ হাটের দিনে হাট ক'রে পথিকরা রাস্তা দিয়ে ঘরে ফিরে চলেছে, কারো বা মাথায় পুঁটুলি, কারো বা কাঁধে বাঁক। আর সেই ঘণ্টার ধ্বনি যেন আকাশে নীরবে বাজছে, মূলতানে বলছে—বেলা যায়।

---

৮ ফাল্গুন, ১৩৩৫

যারা স্বভাবতই কুঁড়ে তাদের যখন কাজে কিম্বা অকাজে পায় তখন তাদের টিকি দেখবার জো থাকে না। পদ্মার এক পাড়িতে যেমন নিচু বালির চর, অন্য পাড়িতে উঁচু ডাঙা এবং লোকালয়—ইদানীং আমার জীবনস্রোতে সেই দশা—একই সঙ্গে তার এক পারে অত্যন্ত

খাজে কাজ—মাইল মাইল ধ'রে—যেটা হচ্চে ছবি আঁকা; অন্যপারে রীতিমতো কেজো কাজ। অর্থাৎ এর একদিকটা দায়িত্ববিহীন আকাশ এবং আলো এবং বর্ণ বিভঙ্গী—আর একটা দিক, লোকযাত্রা ও তার সংখ্যাহীন দায়িত্ব। ছবি আঁকাটাও কাজ তারই পক্ষে, যে সত্যি আর্টিস্‌ট্, আমার পক্ষে ওটা খাম্‌খেয়ালী। খাম্‌খেয়ালীতে ভদ্রতা থাকে না, জীবনযাত্রার নিত্যকৃত্যগুলো একেবারেই ঝাপসা হয়ে যায়,—সময়ের উপর একটা প্লাবনের মতো বইতে থাকে—তার পরে যেই সেটা উত্তীর্ণ হয়ে যায় অমনি দেখা যায় তার পথে পথে সব নুড়ি সাজানো—তাতে কারো কোনো কাজ হয় না। এটা খামখেয়ালী সৃষ্টিকর্ত্তার নিছক ছেলেমানুষী, সময়ের যিনি অধীশ্বর তিনি মাঝে মাঝে এই রকম কোমর বেঁধে সময় নষ্ট করেন—এ সম্বন্ধে তাঁর লজ্জা নেই, কারো কাছে কোনো জবাবদিহী স্বীকার করেন না। অথচ এর বন্যাবেগ তাঁর প্রাত্যহিক কেজো কাজের ধারার চেয়ে অনেক বেশি প্রবল। বিধাতার সেই ছেলেমানুষী যখন মানুষের চিত্তে আবির্ভূত হয় তখন তার কাছ থেকে চিঠির উত্তর প্রত্যাশা করা মিথ্যে।

---

১৮ ফাল্গুন, ১৩৩৫

যখন দূরে যাত্রা করবার সময় আসে তখন খোঁটা ওপড়ানো ও রসি টেনে ছেঁড়া এত কঠিন হয়ে ওঠে। মানুষ যখন বাড়ি তৈরি করে তখন নিজেকে মনে মনে আপন সুদূর ভাবীকালে বিস্তার করে দেয়—যে কালের মধ্যে তার নিজের স্থান নেই। তাই পয়লা নম্বরের ইঁট ও সেরামার্কার দামী সিমেণ্ট ফরমাস করে—তার নিজের ইচ্ছের কঠিন

স্তূপটাকে উত্তরকালের হাতে দিয়ে যায়, সেই কাল সেটাব গ্রন্থি শিথিল করতে লেগে যায় নয়তো নিজের চলতি ইচ্ছের সঙ্গে সেই স্থাবর ইচ্ছেটার মিল করবার জন্যে নানাপ্রকার কসরৎ করতে থাকে। বস্তুত মানুষের বাস কবা উচিত সেই তাঁবুতে যে তাঁবুর ভিৎ মাটিকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে না এবং পাথরের দেয়াল উঁচিয়ে মুক্ত আকাশকে মুষ্টিঘাত করতে থাকে না। আমাদেব দেহটাই যে আল্‌গা বাসা, আমাদের যাযাবর আত্মার উপযোগী, ত্যাগ করবাব সময় এলে সেটাকে কাঁধে ক'রে নিয়ে যেতে হয় না। এইজন্যেই আমি তোমাকে অনেকবার পবামর্শ দিয়েছি ইঁটকাঠেব বাঁধন দিয়ে অচল ডাঙার উপরে বাড়ি তৈরি কোরো না—স্রোতের উপর সচল বাসাব ব্যবস্থা কোরো—যখন স্থির থাক্‌তে চাও একটা নোঙব নামিয়ে দিলেই চলবে—আবার যখন চল্‌তে চাও তখন নোঙরটা টেনে তোলা খুব বেশি কঠিন হবে না। আমাদের কালস্রোতে-ভাসা জীবনের সঙ্গে বাসাগুলোব্ সামঞ্জস্য থাকে না ব'লেই টানাছেঁড়ায় পদে পদে দুঃখ পেতে হয়। আমাদেব বাসাগুলোর মধ্যে দুটো তত্ত্বই থাকা চাই স্থাবর এবং জঙ্গম। থাক্‌বার বেলা থাক্‌তে হবে ফেল্‌বার বেলা ফেল্‌তে হবে আত্মার সঙ্গে দেহের সম্বন্ধেব মতো। এ সম্বন্ধ সুন্দর কারণ এটা ধ্রুব নয়। সেইজন্য নিয়তই দেহেব সঙ্গে দেহীর বোঝাপড়া করতে হয়। সাধনার অন্ত নেই; এর বেদনা এর আনন্দ সমস্তই অধ্রুবতার স্রোত থেকেই আবর্ত্তিত হয়ে উঠছে—এর সৌন্দর্য্যও সকরুণ, তাব উপরে মৃত্যুর ছায়া। কালের এবং ভাবের পবিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই এব পরিবর্ত্তন চলেইছে।—

সংসাবে আমাদেব সব বাসাই এমনি হওয়াই ভালো।

আমার ধ্যান যে রূপকে আশ্রয় কবেছে পরের হাতে নিজেকে বেচবার জন্যে সে যেন সেজেগুজে লোভনীয় হয়ে বসে না থাকে, নিজেকে সম্পূর্ণ ক'রে তারপরে অন্যকালের অন্য লোকের তপস্যাকে

ইচ্ছাকে সম্পূর্ণ পথ ছেড়ে দিয়ে যেন একেবারেই সরে দাঁড়ায়। নইলে কালের পথ রোধ করতে চেষ্টা করলে তার দুর্গতি ঘটতে বাধ্য। টাকার জোরে আমরা আমাদের ধ্যানের রূপটাকে বেঁধে দিয়ে যেতে ইচ্ছা করি। তার মধ্যে অন্য পাঁচজনের ধ্যান যখন প্রবেশ করতে চেষ্টা করে তখন সেটা বেখাপ হোতেই হবে। আমার উচিত ছিল বিশ্বভারতীর সম্পূর্ণতা সাধনের জন্যে বিশ্বভারতীর শেষ টাকা ফুঁকে দিয়ে চলে যাওয়া। তারপরে নতুন কাল নিজের সম্বল ও সাধনা নিয়ে নিজের ধ্যানমন্দির পাকা করুক। আমার সঙ্গে যদি মেলে তো ভালো যদি না মেলে তো সেও ভালো। কিন্তু এটা যেন ধার-করা জিনিষ না হয়। প্রাণের জিনিষে ধার চলে না—অর্থাৎ তাতে প্রাণবান কাজ হয় না—আমগাছ নিয়ে তক্তপোষ করা চলে কিন্তু কাঁঠালব্যবসায়ী তা নিয়ে কাঁঠাল ফলাতে চেষ্টা যেন না করে, এর ভিতরকার কথাটা হচ্চে 'মা গৃধঃ'।

আমি যে কথাটা বল্‌তে বসেছিলুম সেটা এ নয়। তোমরা তাঁবুতে থাক্‌বে কিম্বা নৌকোতে থাক্‌বে সে পরামর্শ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আমার হাল খবরটা হচ্চে এই যে, কাল যখন জাহাজে চড়েছিলুম তখন মনটা তার নতুন দেহ না পেয়ে থেকে-থেকে ডাঙা আঁকড়ে ধরছিল—কিন্তু তাহার দেহান্তর প্রাপ্তি ঘটেছে। তবুও নতুন দেহ সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে কিছু দিন লাগে, কিন্তু খুব সম্ভব কাল থেকেই লেক্‌চার লিখতে বসতে পারব। সেটাকে বলা যেতে পারে সম্পূর্ণ নতুন ঘরকন্না পাতানো। যে পার ছেড়ে এলুম সে পাড়ের সঙ্গে এর দাবী দাওয়ার সম্পর্ক নেই। এর ভাষাও স্বতন্ত্র। বাজে কথা গেল। এবার সংবাদ শুন্‌তে চাও। আজ সকাল সাতটা পর্য্যন্ত অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলুম। ক্লান্তি যেন অজগর সাপের মতো আমার বুক পিঠ জড়িয়ে ধ'রে চাপ দিচ্ছিল। তারপর থেকে নিজেকে বেশ

ভদ্রলোকেরই মতো বোধ হচ্চে। যুগল ক্যাবিনের অধীশ্বর হয়ে খুসি আছি। পুব ক্যাবিনে দিন কাটে পশ্চিম ক্যাবিনে রাত্রি অর্থাৎ আমার আকাশের মিতার পন্থা অবলম্বন করেছি—পূর্ব্বদিগন্তে ওঠা পশ্চিমদিগন্তে পড়া। আমার সহচরত্রয় ভালোই আছে—ত্রিবেণীসঙ্গমের মতো উত্তর প্রত্যুত্তর হাস্য প্রতিহাস্যের কলধ্বনি তুলে তাদের দিন বয়ে চলেছে। আমি আছি ঘরে, তারা আছে বাইরে। আমার অভিভাবক স্থানীয় সঙ্গীটি মনে করছে এখানে আমার যা-কিছু সুযোগ সুবিধা সমস্তই তার নিজের ব্যবস্থার গুণে। আমি তার প্রতিবাদ করিনে—প্রতিবাদের অভ্যাসটা খারাপ—স্থানবিশেষে সংসারে ছোটো ছোটো অসত্যকে যারা মেনে নিতে পারে না, তারা অশান্তি ঘটায়। এই জন্যেই ভগবান মনু বলেছেন—সে কথা থাক্।

---

২৩ ফাল্গুন, ১৩৩৫

জাহাজ জিনিষটাই আগাগোড়া চলে, কিন্তু আর সব চলাকেই সে সীমাবদ্ধ ক'রে রেখেছে। এই বাসাটুকুর বেড়ার মধ্যে সময়ের গতি অত্যন্ত মন্দবেগে। সময়ের এই মন্দাক্রান্তা ছন্দে যে সব ঘটনা অত্যন্ত প্রধান হয়ে প্রকাশ পায় অন্যত্র ছন্দের বেগে সেগুলো চোখেই পড়তে চায় না। এই মুহূর্ত্তেই ডাঙার মানুষ যে সব খেলা খেলছে তা প্রচণ্ড খেলা—জীবনমরণ নিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি। এখানে দুই পক্ষের খেলোয়াড় বিঁড়ে নিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি করছে। তাতেই উৎসাহ উত্তেজনার অন্ত নেই। এই সব দেখ্‌লে একথা স্পষ্ট ক'রেই বোঝা যায় যে স্থানান্তরকে লোকান্তর বলে না। বিশেষ বিশেষ বেড়া বেঁধে সময়ের গতির মধ্যে

পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে আমাদের জগতের বিশেষত্ব ঘটাই। তার মানেই হচ্চে ছন্দ বদল হোলেই রূপের বদল হয়। আমি এবং আমার প্রতিবেশী ইংরেজ এক জায়গায় বাস করি কিন্তু এক জগতে নয়। তার মানে তার জীবনে কালের ছন্দ আমার থেকে স্বতন্ত্র। সেই জন্যেই তার খেলার সঙ্গে আমার খেলার তাল মেলে না। আমি ঠেলা গাড়িতে চল্‌ছি, সে মোটরে চল্‌ছে—আমাদের উভয়ের সময়ের পরিমাণ এক, ছন্দ আলাদা। বস্তুত এক হোলেও ঝাঁপতালে এবং ঢিমেতেতালায় তার মূল্য সম্পূর্ণ বদ্‌লে দেয়। মানুষে মানুষে সুরের ঐক্য থাক্‌তেও পারে, সব চেয়ে বড়ো অনৈক্য তালের। তালের দ্বারা জীবনের ঘটনাগুলোকে ভাগ করে, সাজায়, বিশেষ বিশেষ জায়গায় ঝোঁক দেয়। একেই বলে সৃষ্টি। জগৎ জুড়ে এই ব্যাপার চল্‌ছে। মহাকালের মৃদঙ্গ এক-এক তাণ্ডব-ক্ষেত্রে এক-এক তালে বাজছে, সেই নৃত্যের রূপেই রূপের অসংখ্য বৈচিত্র্য। আমার জীবনের নটরাজ আমার মধ্যে যে নাচ তুলেছেন, সে আর কোথাও নেই,—কোনো জীবনচরিতের পটে এর সম্পূর্ণ ছবি উঠ্‌বে কী ক'রে? কোনো কালেই উঠ্‌বে না। আমাদের আর্টিষ্ট যা গড়েন—তার নব নব সংস্করণ ঘট্‌তে দেন না, সাজানো টাইপ ভেঙে ফেলেন—অতএব রবীন্দ্রনাথ নিরবধিকালের চয়নিকায় একবার ধরা দেয়, তারপর তাকে ফেলে দেয়—অনন্তকালে আর রবীন্দ্রনাথ নেই। হয়তো পরকালে আর একটা ধারা চল্‌তে পারে, কিন্তু তার এ নাম নয়, এ রূপ নয়, এ পরিবেশ নয়, এ সমাবেশ নয়; সুতরাং রবীন্দ্রনাথের পালা এইখানেই চিরকালের মতো চুকিয়ে দিয়ে চলে যেতে হবে। আর যাই হোক্ বিশ্বসভায় কারো মেমোরিয়াল মিটিং হয় না। হয় কেবল আগমনী এবং বিসর্জ্জন। আজ রাত্রে পিনাঙ।

---

২৬ ফাল্গুন, ১৩৩৫

চলেছি, নতুন নতুন মেয়েপুরুষের সঙ্গে আলাপ চলেছে। আলাপ জম্‌তে না জম্‌তে আবার ঘাটে ঘাটে মানুষ বদল হচ্চে। অর্থাৎ দিনের পর দিন যাদের নিয়ে সময় কাটুছে তারা যেন এমন জীব যাদের ভিতরটা নেই কেবল উপরটা আছে—যা ধাঁ ক'রে চোখে পড়ে, মনের উপর ছায়া ফেলে সেইটুকু মাত্র। কেদারার পিঠে তাদের নামের ফলক ঝুল্‌ছে, আর তারা কেদারার উপর পা ছড়িয়ে বসে আছে,—তারা আর কোথাও নেই কেবল ঐটুকুর উপরে। আমার সঙ্গে কেবল তিন জন মাত্র মানুষ আছে যারা জায়গা ওদের চেয়ে বেশি জোড়ে না, কিন্তু যারা অনেকখানি,—যাদের সত্যতা, দৃশ্য অদৃশ্য বহু সাক্ষ্যের দ্বারা আমার মনের মধ্যে চারদিক থেকে প্রমাণীকৃত—এই জন্যে যাদের কাছ থেকে অনেকখানি পাই এবং যারা সরে গেলে অনেকখানি হারাই—যারা তাসের উপরকার ছবির মতো একতলবর্ত্তী নয়—যাদের মধ্যে পূর্ণায়তন জগতের পরিচয়। পূর্ণায়তন জগতেই বাস্তবতার স্বাদ পাওয়া আমাদের অভ্যাস তার চেয়ে কম পড়লে দুধের বদলে এক বাটি ফেনা খাবার চেষ্টা করার মতো হয়। যতটা চুমুক দিলে আমার জানার পুরো স্বাদ পাই এই জাহাজভরা যাত্রীদের মধ্যে তা পাবার জো নেই।—এই কারণে আমাদের পেট ভ'রে জানার অভ্যাস পীড়িত হচ্চে। কিছুদিনের উপবাসে ক্ষতি হয় না। কিন্তু বেশিদিন এমন অত্যল্প জানার খোরাকে চলে না। আত্মীয়ের মধ্যে আমাদের জানার ভরপুর খোরাক মেলে ব'লেই তাতে আমরা এত আরাম পাই। কেন এই কথাটা এমন জোরে মনে এল সেই কথাটা খুলে বলি। আজ বিকেলে সিঙ্গাপুরের ঘাটে জাহাজ থাম্‌তেই সরযূ জাহাজে এসে উপস্থিত। আমি তাঁকে গতবারে অল্প কয়দিনমাত্র দেখেছিলুম, সুতরাং তাঁকে সুপরিচিত বল্‌লে বেশি বলা হবে।

কিন্তু তাঁকে দেখে মন খুসি হোলো এই জন্যে যে তিনি বাঙালি মেয়ে অর্থাৎ এক মুহূর্ত্তে অনেকখানি জানা গেল—তাঁর সরযূ নাম বিয়াট্রীস্ বা এলিয়োনোবার মতো পরিচয়সূচক নয়, আমাব পক্ষে তাতে তার চেয়ে অনেকবেশি পদার্থ আছে। তার পরে তাঁর শাড়ী, তাঁর বালা, তাঁর কপালের মাঝখানের কুঙ্কুমের বিন্দু, কেবলমাত্র দৃশ্যগত নয়, তার পিছনে অনেকখানি অদৃশ্য সামগ্রী আছে এক নিমেষেই সেই সমস্ত এসে চোখ এবং মনকে ভ'রে ফেলে। ভালো ক'রে ভেবে দেখো এই সমস্ত চিহ্ন, বচনীয় এবং অনির্ব্বচনীয় কত বিচিত্র পদার্থকে সংক্ষেপে একই কালে বহন করে; তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করতে গেলে আঠারো পর্ব্ব বই ভরতি হয়ে যায়। এ জাহাজে অনেক মেয়ে আছে তাদের মধ্যে এই বাঙালি মেয়েকে দেখে মন এত খুসি হোলো—আর কিছু নয় জান্‌তেই মনেব আনন্দ—মন যখন বলে জান্‌লুম তখন সে খুসি হয়—আমরা যাকে বলি মন-কেমন-করা তার মানে হচ্চে চাবদিকেব জানা পদার্থটা যথেষ্ট পূর্ণায়তন নয়।

৯ই চৈত্র, ১৩৩৫

কাল জাপানী বন্দরে এসেছি—নাম মোজি। আগামী কাল পৌছব কোবে। পাখী বাসা বাঁধে খড়কুটো দিয়ে, সে বাসা ফেলে যেতে তাদের দেবি হয় না—আমবা বাসা বাঁধি প্রধানত মনেব জিনিষ দিয়ে—কাজেকর্ম্মে, লেখাপড়ায, ভাবনাচিন্তায চারিদিকে একটা অদৃশ্য আশ্রয় তৈবী হোতে থাকে। হাওয়া-গাড়িব গদি যেমন শরীবেব মাপে টোল খেয়ে খোঁদলগুলি গড়ে তোলে, মন তেমনি নড়তে চড়তে তার হাওয়া-

আসলে নানা আকারের খোঁদল তৈরী করে, তার মধ্যে যখন সে বসে তখন সে ব'সে যায়—তারপরে যখন সেটাকে ছাড়তে হয় তখন আর ভালো লাগে না। এ জাহাজে আমার তেমনি ঘটেছে। এই ক্যাবিনে এক পাশে একটি লেখবার ডেস্ক, আর একপাশে বিছানা, তা ছাড়া আয়নাওয়ালা দেরাজ আর কাপড় ঝোলাবার আলমারী—এর সংলগ্ন একটি নাবার ঘর এবং সেটা পেরিয়ে গিয়ে আর একটা ক্যাবিন—সেখানে আমার বাক্স তোরঙ্গ প্রভৃতি। এরই মধ্যে মন নিজের আসবাব গুছিয়ে নিয়েছে। অল্প জায়গা ব'লেই আশ্রয়টি বেশ নিবিড়—প্রয়োজনের জিনিষ সমস্ত হাতের কাছে। এখান থেকে নেমে দুদিনের জন্য সাংহাইয়ে 'সু'র বাড়িতে ছিলাম, ভালো লাগেনি, অত্যন্ত ক্লান্ত করেছিল—তার প্রধান কারণ নূতন জায়গায় মন তার গায়ের মাপ পায়নি—চারি-দিকে এখানে ঠেকে ওখানে ঠেকে—আর তার উপরে দিনরাত আদর অভ্যর্থনা গোলমাল। প্রতিদিনের ভাবনা কল্পনার মধ্যেই নতুনত্ব আছে—বাইরের নতুনত্ব তাকে বাধা দিতে থাকে। জীবনে আমরা যে-কোনো পদার্থকে গভীর ক'রে পেয়েছি অর্থাৎ অনেকদিন ধ'রে অনেক ক'রে জেনেছি সত্যিকার নতুন তারি মধ্যে,—তাকে ছেড়ে নতুনকে খুঁজতে হয় না। অন্য সব মূল্যবান জিনিষেরই মতো নতুনকে সাধনা ক'রে লাভ করতে হয়। অর্থাৎ পুরানো ক'রে তবে তাকে পাওয়া যায়। হঠাৎ যাকে পেয়েছি ব'লে মনে হয়, সে ফাঁকি—দুদিন বাদেই তার যথার্থ জীর্ণতা ধরা পড়ে। আজকের দিনে এই সস্তা নতুনত্বের মৃগয়ায় মানুষ মেতেছে—সেইজন্যেই মুহূর্তে মুহূর্তে তার বদল চাই—তার এই বদলের নেশায় বিজ্ঞান তার সহায়তা করছে—সে সময় পাচ্চে না গভীরের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে চিরনূতনের পরিচয় পেতে। এই জন্যেই চারিদিকে একটা পুঁথি-পড়া ইতরতা ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে। ধ্রুবসত্যকে সত্যরূপে পাবার সময় নেই, সময় নেই। সাহিত্যে যে অশ্লীলতা দেখা

দিয়েছে তার কারণ এই, অশ্লীলতা অতি সহজেই প্রবলবেগে মনকে আঘাত করে—যাদের সময় নেই ও শক্তি কম তাদের পক্ষে অতি দ্রুতবেগে আমোদ পাবার এই অতি সস্তা উপায়। তীব্র উত্তেজনা চাই সেই মনেরই পক্ষে যে-মন নির্জীব—মনের জীবনীশক্তি ক'মে গেছে অগভীর মাটিতে—তার শিকড়গুলি উপবাসী।

---

৪ শ্রাবণ, ১৩৩৬

আমাব চিঠিগুলো চিঠি নয় এই তর্ক উঠেছে। আমি নিজে অনেকবার স্বীকার করেছি যে আমি চিঠি লিখতে পাবিনে। এটা গর্ব্ব করবার কথা নয়। আমরা যে-জগতে বাস কবি সেখানে কেবল যে চিন্তা কববাব কিম্বা কল্পনা করবার বিষয় আছে তা নয়। সেখানকাব অনেকটা অংশই ঘটনার ধারা; অন্তত যেটা আমাদের চোখে পড়ে, সেটা একটা ব্যাপার, সে কেবল হচ্চে, চলছে, আসছে যাচ্চে, অস্তিত্বের সদর রাস্তা দিয়ে চলাচল, তাব ভিতরকার সব আসল খবর আমাদের নজরে পড়ে না। মাঝে মাঝে যদি বা পড়ে, তাদেব ধরে রাখিনে, পথ ছেড়ে দিই, সমস্ত ধরতে গেলে মনেব বোঝা অসহ্য ভারী হয়ে উঠত। আমাদের ঘরের ভিতর দিকটাতে সংসারের সঙ্কীর্ণ দেয়াল-ঘেরা সীমানাব মধ্যে আমাদের অনেক ভাবনার বিষয়, অনেক চেষ্টার বিষয় আছে তাব ভার আমাদেব বহন করতে হয়। কিন্তু যখন জানলায় এসে বসি তখন বাস্তায় দেখি চলাচলের চেহারা। ভালো ক'রে যদি খোঁজ নিতে পাবতুম তাহোলে দেখতুম তার কোনো অংশই বস্তুত হাল্‌কা নয়,—

ট্র্যাম হু হু ক'রে চলে গেল কিন্তু তার পিছনে মস্ত একটা ট্র্যাম কোম্পানি,—সমুদ্রের এপারে ওপারে তার হিসেব চালাচালি। মানুষটা ছাতা বগলে নিয়ে চলেছে, মোটর গাড়ি তার সর্ব্বাঙ্গে কাদা ছিটিয়ে চলে গেল—তার সব কথাটা যদি চোখে পড়ত তাহোলে দেখতুম বৃহৎ কাণ্ড—সুখে দুঃখে বিজড়িত একটা বিপুল ইতিহাস। কিন্তু সমস্তই আমাদের চোখে হাল্‌কা হয়ে ঘটনা প্রবাহ আকারে দেখা দিচ্চে। অনেক মানুষ আছে যারা এই জান্‌লার ধারে ব'সে যা দেখে তাতে এক রকমের আনন্দ পায়। যারা ভালো চিঠি লেখে তারা মনের জানলার ধারে ব'সে লেখে—আলাপ ক'রে যায়—তার কোনো ভার নেই, বেগও নেই, স্রোত আছে। এই সব চল্‌তি ঘটনার 'পরে লেখকের বিশেষ অনুরাগ থাকা চাই, তাহোলেই তার কথাগুলি পতঙ্গের মতো হাল্‌কা পাখা মেলে হাওয়ার উপর দিয়ে নেচে যায়। অত্যন্ত সহজ ব'লেই জিনিষটি সহজ নয়—ছাগলের পক্ষে একটুও সহজ নয় ফুলের থেকে মধু সংগ্রহ-করা। ভারহীন সহজের রসই হচ্চে চিঠির রস। সেই রস পাওয়া এবং দেওয়া অল্প লোকের শক্তিতেই আছে। কথা বলবার বিষয় নেই অথচ কথা বলবার রস আছে এমন ক্ষমতা ক'জন লোকের দেখা যায়? জলের স্রোত কেবল আপন গতির সংঘাতেই ধ্বনি জাগিয়ে তোলে, তার সেই সংঘাতের উপকরণ অতি সামান্য, তার নুড়ি, বালি, তার তটের বাঁকচোর, কিন্তু আসল জিনিষটা হচ্চে তার ধারার চাঞ্চল্য। তেমনি যে-মানুষের মধ্যে প্রাণস্রোতের বেগ আছে সে মানুষ হাসে আলাপ করে, সে তার প্রাণের সহজ কল্লোল, চারিদিকের যে-কোনো-কিছুতেই তার মনটা একটু মাত্র ঠেকে তাতেই তার ধ্বনি ওঠে। এই অতিমাত্র অর্থভারহীন ধ্বনিতে মন খুসি হয়—গাছের মর্ম্মর ধ্বনির মতো প্রাণ-আন্দোলনের এই সহজ কলরব।

অল্প বয়সে আমি চিঠি লিখতুম যা-তা নিয়ে। মনের সেই হাল্‌কা

চাল অনেকদিন থেকে চলে গেছে—এখন মনের ভিতর দিকে তাকিয়ে বক্তব্য সংগ্রহ করে চলি। চিন্তা করতে করতে কথা কয়ে যাই—দাঁড় বেয়ে চলিনে, জাল ফেলে ধরি। উপরকার ঢেউয়ের সঙ্গে আমার কলমের গতির সামঞ্জস্য থাকে না। যাই হোক্ এ-কে চিঠি বলে না। পৃথিবীতে চিঠি লেখায় যারা যশস্বী হয়েছে তাদের সংখ্যা অতি অল্প। যে দু-চারজনের কথা মনে পড়ে তারা মেয়ে। আমি চিঠি রচনায় নিজের কীর্ত্তি প্রচার করব এ আশা করিনে।

নীলমণি দ্বিতীয়বার এসে বললে চা তৈরি। চা বিলম্ব সয় না—পোষ্টআপিসের পেয়াদাও তথৈবচ। অতএব ইতি।

---

১৪ শ্রাবণ, ১৩৩৬

তোমার ভরপুর বিশ্রামের খবর শুনে আমার লোভ হচ্চে। লিখেছ তোমার বিছানা ঘিরে দেশীবিদেশী নানা জাতের নানা বই। সংসারে কর্ত্তব্য-না-করা ছাড়া তোমার কোনো কর্ত্তব্য নেই। যে বদমেজাজি লোকটা অন্তরে বাহিরে সর্ব্বদাই কাজের জবাবদিহী তলব করে, শুনছি তোমার ঘরে তার নাকি দরওয়াজা বন্ধ। কর্ত্তব্যবুদ্ধির এমনতরো নির্ব্বাসন কেবলমাত্র দেবলোকেই সম্ভব। এই পরিপূর্ণ চুপচাপ রসের নিবিড় স্বাদ আমিও একদা ভোগ করেছি। চারসপ্তাহ শয্যালীন অবস্থায় ছিলেম শুশ্রূষালয়ে। তখন একটি সত্য আমার কাছে খুব স্পষ্ট হয়েছিল সেটি হচ্চে এই যে, নদীটাকে পান করা যায় না। তার চেয়ে একগ্লাস জলে অনেক সুবিধে। কিছুদিনের জন্যে যখন

জীবনটাকে চারটে দেয়ালের মধ্যে সঙ্কীর্ণ করে এনেছিলুম, তার পদার্থভার যতদূর সম্ভব কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল তখন সেই হাল্কা জিনিষটাকে হাতে তুলে নিয়ে বেশ চেখে চেখে ভোগ করবার সুযোগ হয়েছিল। ভোগের সামগ্রীটি আর কিছুই না, কেবলমাত্র একখানি মন, আর একখানি প্রাণ। সে মন সে প্রাণ আপনার শেষপ্রান্তে—আপনার অতীত দেশের গায়ে-ঠেকা। লণ্ডনের ডাক্তার পাড়ায় সে বাড়িটা। ছোটোঘর, বিছানা ছাড়া আর কোনো আসবাব নেই। দেয়ালের উপরিভাগে একটি বাতায়ন, তার থেকে কিছুই দেখা যেত না। কেবল কোনো একসময়ে আসৃত একটুখানি রোদ্দুর, আর বাকী সময়ে আসৃত কেবল পরিমিত আলো। আকাশভরা রোদ্দুরকে এমন ক'রে কখনো দেখিনি—এটিকে পেতুম যেন একটুক্রো পরশমণির মতো, আমার মনের সমস্ত ভিতরটাকে সোনার আভায় পরিপূর্ণ ক'রে দিত। এমনি টুক্‌রো ক'রে পাওয়াতেই আমি যেন আকাশের সমস্ত আলোককে সত্য ক'রে পেয়েছি—উদাসীন অঞ্জলি উপছিয়ে আঙুলের ফাঁকের ভিতর দিয়ে একটুও গ'লে প'ড়ে যায়নি। দীর্ঘকাল নিস্তব্ধ হয়ে থাকার দরুণ মনের ধারণাশক্তি বোধ হয় বাড়ে। তাকে ঠিক ধারণাশক্তি নাম দেওয়া যায় না—আত্মানুভূতি বলা যেতে পারে। অহরহ নানা বিষয়ে চিত্ত যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে বেড়ায় তখন সে আপনার কাছে আসবার অবকাশ পায় না—কিছুকাল দায়ে প'ড়ে যখন চলাচল বন্ধ ক'রে স্থির হয়ে থাকা যায় তখন ক্রমে সমস্ত আবিলতা থিতিয়ে গিয়ে চিত্ত আপনাকে আপনি স্বচ্ছ ক'রে জানতে পায়—সেই জানাতে নিবিড় একটি আনন্দ আছে। সেই আনন্দটি কেন ও কী, স্পষ্ট ক'রে বলা শক্ত। ইংরেজি ভাষায় যাকে Mystic বলে যদি সেই জাতীয় একটা ব্যাখ্যা চিঠির মধ্যে দিলে নিতান্ত অসঙ্গত না হয় তাহোলে বলা যেতে পারে যে, বিশ্বজগতের গভীরতার মধ্যে একটি নিস্তব্ধ বিশুদ্ধ

আনন্দময় আত্মানুভূতি আছে, কোনো উপায়ে যদি বাহিরের অবিশ্রাম নানা গোলমাল থেকে ছুটি পাওয়া যায়, তাহোলে আপন সত্তার নির্ম্মল উপলব্ধিকে পরম সত্তার সেই ধ্রুব আনন্দে প্রতিষ্ঠিত দেখতে পাই। আমরা যখন নানাখানাকে কেবলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে বেড়াই, তখনি সমগ্র বোধটা হারিয়ে যায়, সেই অখণ্ডই হচ্চেন উপনিষৎ যাকে বলেন ভূমা। এই ভূমাব মধ্যে অভিনিবিষ্ট হবার যে আনন্দ তার তুলনা হয় না। অমনি চারিদিকের ছোটো ছোটো জিনিষকে আমরা অসীমেব ভূমিকার মধ্যে দেখতে পাই। ঐ যে বল্লেম আমার শুশ্রূষালয়ে অল্পখানিকটা-সূর্য্যের আলো দেখতে পেতেম, কিন্তু সেইটুকুতেই আমাকে অখণ্ড জ্যোতিঃস্বরূপ বেশ স্পর্শ দিত—যে জ্যোতিঃ আনন্দময়। মাঝে মাঝে কোনো ইংবেজবন্ধু আমাকে দেখতে আসতেন। সাধারণতঃ বহুলোকেব মাঝখানে তাঁদেব ঠিক মূল্যটি পাইনি। কিন্তু এই ঘরটির মধ্যে যখন তাঁবা আসতেন তখন একেবারে পূর্ণভাবে তাঁদেব পাওয়া যেত, অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষ স্বভাবতই অসামান্য। সে একান্তই বিশেষ। কিন্তু তাঁদের আমরা অনেকের সঙ্গে তাল পাকিয়ে দেখি এই জন্যেই ঠিকমতো দেখি না। কিন্তু জনহীনতার বৃহৎ অবকাশের মধ্যে যখন কাউকে দেখি, তখন তাকে বিশেষভাবে সত্য ক'রে দেখার আনন্দ পাই। তাকে ধাঁ ক'রে এড়িয়ে যাবার জো থাকে না। তখন সে আপন ঐকান্তিকতার মধ্যে বড়ো হয়ে ওঠে। বড়ো হয়ে ওঠে বললে ভুল হয়। সে যথার্থ হয়। অন্য সময় আমাদের দৃষ্টির জড়তায় সে ছোটো হয়ে থাকে। কথাটা একটু অদ্ভুত শোনায়, কিন্তু আরোগ্যশালাব নিঃশব্দতা ও নিঃস্তব্ধতার মধ্যে আমি যে নিরবচ্ছিন্ন গভীর আনন্দ পেয়েছি জীবনে তেমন আনন্দ বেশিবাব পাইনি। প্রথমবার যখন আমেরিকায়-যাত্রা উপলক্ষ্যে অতলান্তিক পাড়ি দিয়েছিলাম, জাহাজটা ছিল জীর্ণ, সমুদ্র ছিল অশান্ত, অসুস্থ শরীর নিয়ে ক্যাবিনেব মধ্যে অবরুদ্ধ ছিলাম।

তখন সেই স্বাস্থ্যের অভাব ও স্থানাভাবের সঙ্কীর্ণতার মধ্যে একটি নিবিড় আনন্দের উৎস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল, নিতান্তই অকারণ আনন্দ, অস্বচ্ছন্দতাকে প্লাবিত করে দিয়ে। শরীরের কষ্টটাই তখন বাহিরের বহু বৈচিত্র্যকে ঠেকিয়ে রেখেছিল। বেদনার সেই খিড়্‌কীর দরজার ভিতর দিয়ে একটা মুক্তির ক্ষেত্রে এসে পড়েছিলুম। সেইক্ষেত্রে আলোতে আনন্দে এবং আমার সত্তার কোনো ভেদ নাই। বিজ্ঞান যখন বস্তুর অন্তরতম লোকে প্রবেশ করে, অনির্ব্বচনীয় আলোকের নৃত্যশালায় গিয়ে উপস্থিত হয়, দেখে যে সেখানে রূপের বৈচিত্র্য প্রায় বিলীন হয়েছে। রূপলোক—সেটা প্রত্যন্তভূমি। তার পরেই অরূপ। সেই অরূপের কথা বিজ্ঞান কিছু বলতে পারে না। উপনিষৎ তাঁকেই বলেছেন আনন্দ। "প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্"—সেই অরূপ আনন্দ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণ নিরন্তর কম্পিত হচ্চে। নিজের গভীরতার মধ্যে গিয়ে পড়তে পারলে, সেইরকমই একটি নির্ব্বিশেষ পূর্ণতার মধ্যে এসে যেন পৌঁছই। সেখানে শরীর মনের দুঃখও দুঃখ নয়, কেননা শরীর মনের গণ্ডীটাই নেই।

---

৩১ ভাদ্র, ১৩৩৬

ফুল ফোটে গাছের ডালে, সেই তার আশ্রয়। কিন্তু মানুষ তাকে আপনার মনে স্থান দেয় নাম দিয়ে। আমাদের দেশে অনেক ফুল আছে যারা গাছে ফোটে, মানুষ তাদের মনের মধ্যে স্বীকার করেনি। ফুলের প্রতি এমন উপেক্ষা আর কোনো দেশেই দেখা যায় না। হয়তো বা

নাম আছে সে নাম অখ্যাত। গুটিকয়েক ফুল নামজাদা হয়েছে কেবল গন্ধের জোরে—অর্থাৎ উদাসীন তাদের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ না করলেও তারা এগিয়ে এসে গন্ধের দ্বারা স্বয়ং নিজেকে জানান দেয়। আমাদের সাহিত্যে তাদেরই বাঁধা নিমন্ত্রণ। তাদেরও অনেকগুলির নামই জানি, পরিচয় নেই, পরিচয়ের চেষ্টাও নেই। কাব্যের নাম-মালায় রোজই বারবার প'ড়ে আসছি যুথী জাতি সেঁউতি। কিন্তু ছন্দ মিললেই খুসি থাকি,—কোন্ ফুল জাতি, কোন্ ফুল সেঁউতি সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবারও উৎসাহ নেই। জাতি বলে চামেলিকে, অনেক চেষ্টায় এই খবর পেয়েছি—কিন্তু সেঁউতি কা'কে বলে আজ পর্য্যন্ত অনেক প্রশ্ন ক'রে উত্তর পাইনি। শান্তিনিকেতনে একটি গাছ আছে তাকে কেউ কেউ পিয়াল বলে—কিন্তু সংস্কৃত কাব্যে বিখ্যাত পিয়ালের পরিচয় কয়জনেরই বা আছে? অপর পক্ষে দেখো, নদীর সম্বন্ধে আমাদের মনে ঔদাস্ত নেই, নিতান্ত ছোটো নদীও আমাদের মনে প্রিয় নামের আসন পেয়েছে, কপোতাক্ষী, ময়ূরাক্ষী, ইচ্ছামতী—তাদের সঙ্গে আমাদের প্রাত্যহিক ব্যবহারের সম্বন্ধ। পূজার ফুল ছাড়া আর কোনো ফুলের সঙ্গে আমাদের অবশ্য প্রয়োজনের সম্বন্ধ নেই। ফ্যাসানের সম্বন্ধ আছে অচিবায়ু সীজ্‌ন্ ফ্লাউয়ারের সঙ্গে—মালীর হাতে তাদের শুশ্রূষার ভার—ফুলদানিতে যথা-রীতি তাদের গতায়াত। একেই বলে তামসিকতা, অর্থাৎ মেটিরিয়ালিজ্‌ম্—স্থূল প্রয়োজনের বাইরে চিত্তের অসাড়তা। এই নামহীন ফুলের দেশে কবির কী দুর্দ্দশা ভেবে দেখো,—ফুলের রাজ্যে নিতান্ত সঙ্কীর্ণ তার লেখনীর সঞ্চরণ। পাখী সম্বন্ধেও ঐ কথা, কাক কোকিল পাপিয়া বৌ-কথা-কও-কে অস্বীকার করবার উপায় নেই—কিন্তু কত সুন্দর পাখী আছে যার নাম অন্তত সাধারণে জানে না। ঐ প্রকৃতিগত ঔদাসীন্য আমাদের সকল পরাভবের মূলে—দেশের লোকের সম্বন্ধে আমাদের ঔদাসীন্যও এই স্বভাববশতই প্রবল। পরীক্ষাপাসের জন্যে ইতিহাস পাঠে উপেক্ষা

করবার জো নেই—আমাদের স্বাদেশীকতা সেই পুঁথির বুলি দিয়ে তৈরী— দেশের লোকের 'পরে অনুরাগের উৎসুক্য দিয়ে নয়। আমাদের জগৎটা কত ছোটো ভেবে দেখো—তার থেকে ও জিনিষটাই বাদ পড়েছে।

শান্তিনিকেতন
মাঘ, ১৩৩৬

মেয়েরা ঋতুরঙ্গ অভিনয় করবে আজ সন্ধ্যেবেলায়। ওরা অঙ্গভঙ্গির লতানে রেখা দিয়ে গানের সুরের উপর নক্সা কাটতে থাকে। এর অর্থটা কী। আমাদের প্রতিদিনটা দাগ-ধরা ছেঁড়া-খোঁড়া, কাটাকুটিতে ভরা, তার মধ্যে এর সঙ্গতি কোথায়? যারা লোকহিত-ব্রতপরায়ণ সন্ন্যাসী তারা বলে বাস্তব সংসারে দুঃখ দৈন্য শ্রীহীনতার অন্ত নেই, তার মধ্যে এই বিলাসের অবতারণা কেন? তারা জানে "দরিদ্র নারায়ণ" তো নাচ শেখেননি, তিনি নানা দায় নিয়ে কেবলি ছটফট্ ক'রে বেড়ান, তাতে ছন্দ নেই। এরা এই কথাটা ভুলে যায় যে, দরিদ্র শিবের আনন্দ নাচে। প্রতিদিনের দৈন্যটাই যদি একান্ত সত্য হোত, তাহোলে এই নাচটা আমাদের একেবারেই ভালো লাগত না, এটাকে পাগ্‌লামি বলতুম। কিন্তু ছন্দের এই সুসম্পূর্ণ রূপলীলাটি যখন দেখি, মন বলতে থাকে এই জিনিষটি অত্যন্ত সত্য—ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অপরিচ্ছন্নভাবে চারিদিকে যা চোখে পড়তে থাকে তার চেয়ে অনেক গভীরভাবে নিবিড়ভাবে। পর্দাটার উপরেই প্রতিদিনের চলতি হাতের ছাপ পড়ছে, দাগ ধরছে, ধুলো লাগছে, পরিপূর্ণতার চেহারাটা কেবলি অপ্রমাণ হচ্চে—একেই বলি বাস্তব।

কিন্তু পর্দার আড়ালে আছে সত্য, তার ছন্দ ভাঙে না, সে অম্লান, সে অপরূপ, তাই যদি না হবে তবে গোলাপফুল ফুটে ওঠে কিসের থেকে—কোন্ গভীরে কোথায় বাজে সেই বাঁশি যার ধ্বনি শুনে মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে যুগে যুগে গান চলে এসেছে আর মনে হয়েছে মানুষের কল-কোলাহলের চেয়ে মানুষের এই গানেই চিরন্তনের লীলা? অঙ্গে অঙ্গে যখন নাচ দেখা দিল তখন ঐ ময়লা ছেঁড়া পর্দাটার এক কোণা উঠে গেল—"দরিদ্র নারায়ণ"কে হঠাৎ দেখা গেল বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর ডান পাশে। তাকেই অসত্য ব'লে উঠে' চলে যাব মন তো তাতে সায় দেয় না। দরিদ্রনারায়ণকে বৈকুণ্ঠের সিংহাসনেই বসাতে হবে, তাঁকে লক্ষ্মীছাড়া ক'রে রাখব না। আমাদের পুরাণে শিবের মধ্যে ঈশ্বরের দরিদ্র বেশ আর অন্নপূর্ণায় তাঁর ঐশ্বর্য্য—বিশ্বের এই দুইয়ের মিলনেই সত্য। সাধুরা এই মিলনকে যখন স্বীকার করতে চান না তখন কবিদের সঙ্গে তাঁদের বিবাদ বাধে। তখন শিবের ভক্ত কবি কালিদাসের দোহাই পেড়ে সেই যুগলকেই আমাদের সকল অনুষ্ঠানের নান্দীতে আবাহন করব যাঁরা "বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ"। যাঁদের মধ্যে অভাব ও অভাবের পূর্ণতার নিত্যলীলা।

শান্তিনিকেতন
১৯ বৈশাখ, ১৩৩৮

আমাকে তুমি মনে মনে অনেকখানি বাড়িয়ে নিয়ে নিজের পছন্দসই করবার চেষ্টা করছ। কিন্তু আমি তো রচনার উপাদানমাত্র নই, আমি যে রচিত। তুমি যে লিখছ এখন থেকে আমার বই খুব ক'রে পড়বে

—এমন কাজ কোরো না—অত্যন্ত বেশি ক'রে পড়তে গেলে কম ক'রে পাবে। হঠাৎ মাঝে মাঝে একখানা বই তুলে নিয়ে সাতের পাতা কি সতেরোর পাতা কি সাতাশের পাতা থেকে যদি পড়তে স্বরু ক'রে দাও হয়তো তোমাব মন ব'লে উঠবে—বাঃ, বেশ লিখেছে তো। রীতি-মতো পড়া অভ্যাস করো যদি তাহোলে স্বাদ নষ্ট হোতে থাকবে—কিছু-দিন বাদে মনে হবে, এমনই কী। আমাদের সৃষ্টির একটা সীমানা আছে সেইখানে বারে বারে যদি তোমার মনোরথ এসে ঠেকে যায় তবে মন বিগড়ে যাবে। মানুষের একটা রোগ আছে যা পায় তার চেয়ে বেশি পেতে চায়, তোমার প্রকৃতিকে সর্ব্বতোভাবে পরিতৃপ্তি দিতে পারে আমার রচনা থেকে এমন প্রত্যাশা কোরো না। কিছু তোমার ভালো লাগবে কিছু অন্যের ভালো লাগবে—কিছু তোমাব মনের সঙ্গে মিলবে না অথচ আর একজন ভাববে সেটা তারই মনের কথা। নানা ভাবে নানা সুরে নানা কথাই বলেছি—যেটুকু তোমার পছন্দ হয় বাছাই ক'রে নিয়ো। পাঠকেরও রসগ্রহণ কববাব একটা সীমা আছে ; তোমার মন অনুভূতির একটা বিশেষ অভ্যাসে প্রবলভাবে অভ্যস্ত, সেই অভ্যাস সব-কিছু থেকে নিজের জোগান খোঁজে। কিন্তু কবিতায় কোনো একটা বিশেষ ভাব বড়ো জিনিষ নয়, এমন কি খুব বড়ো অঙ্গের ভাব। কবিতার মুখ্য জিনিষ হচ্চে সৃষ্টি—অর্থাৎ রূপভাবন। বিশ্বকাব্যেও যেমন, কবিব কাব্যেও তেমনি,—রূপ বিচিত্র—কোনোটা তোমার চোখে পড়ে, কোনোটা আর কারও। তুমি খুঁজছ তোমার মনের একটি বিশেষ ভাবকে তৃপ্তি দিতে পারে এমন কোনো একটি রূপ,—অন্যগুলোও রূপের মূল্যে মূল্যবান হোলেও হয়তো তুমি গ্রহণ কবতে চাইবে না। কিন্তু কাব্যের যারা যথার্থ রসজ্ঞ, তাবা নিজেব ভাবকে কাব্যে খোঁজে না—তারা যে-কোনো ভাব রূপবান হয়ে উঠেছে তাতেই আনন্দ পায়। তোমার চিঠি পড়তে পড়তে আমাব মনে হয়েছে একটা বিশেষ খাদে তোমার চিন্তাধাবা

প্রবাহিত—সেইটেই তোমার সাধনা। আমরা কবিরা কেবল সাধকদের জন্য লিখিনে, বিশেষ রসের রসিকদের জন্যও না। আমরা লিখি রূপদ্রষ্টার জন্য—তিনি বিচার করেন সৃষ্টির দিক থেকে—যাচাই ক'রে দেখেন রূপের আবির্ভাব হোলো কি না। আমার রূপকাব বিধাতা সেইজন্যে আমাকে নানা রসের নানা ভাবেব নানা উপলব্ধির মধ্যে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ান—নিজের মনকে নানান্‌খানা ক'রে নানা চেহারায়ই গড়তে হয়। যেই একটা কিছু চেহারা জাগে ওস্তাদজী তখন আমাকে চেলা ব'লে জানেন। আমি যে-সব কর্ম্ম হাতে নিয়েছি তার মধ্যেও সেই চেহাবা গড়ে তোলবার ব্যবসায়। উপদেশ দেওয়া উপকাব করা গৌণ, বচনা করাই মুখ্য। আমি কর্ম্মীও বটে—কিন্তু যার অন্তর্দৃষ্টি আছে সে বুঝতে পারে আমি কারুকর্ম্মের কর্ম্মী। আমি কবিতা লিখি, গান লিখি, গল্প লিখি, নাট্যমঞ্চেও অভিনয় করি, নাচি নাচাই, ছবি আঁকি, হাসি, হাসাই, একান্তে কোনো একটা মাত্র আসনেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসবার উপায় বাখিনে। যাবা আমাকে ভক্তি কবতে চায় তাদের পদে পদে খটকা লাগে। তুমি আমাব লেখা পড়তে চেয়েছ, পোড়ো, কিন্তু কবির লেখা বলেই পোড়ো। অর্থাৎ আমি সকলেরই বন্ধু, সকলেরই সমবয়সী, সকলেবই সহযাত্রী। আমি কিন্তু পণ্ডিত নই। পথ চলতে চলতে আমাব যা-কিছু সংগ্রহ। যা-কিছু জানি তাব অনেকখানি আন্দাজ। যতখানি পড়ি, তার চেয়ে গড়ি অনেক বেশি।

দার্জ্জিলিং

৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮

আমার জীবনটা তিন ভাগে বিভক্ত—কাজে, বাজে কাজে, অকাজে। কাজেব দিকে আছে ইস্কুলমাষ্টারী, লেখা, ইত্যাদি, এইটে হোলো কর্ত্তব্য

বিভাগ। তার পর আছে অনাবশ্যক বিভাগ। এইখানে যত কিছু নেশার সরঞ্জাম। কাব্য, গান এবং ছবি। নেশার মাত্রা পরে পরে তীব্রতর হয়ে উঠেছে।

একদা প্রথম বয়সে কবিতা ছিলেন একেশ্বরী—ধরণীর আদিযুগে যেমন সমস্তই ছিল জল। মনের এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্ত তারই কলকল্লোলে ছিল মুখরিত। নিছক ভাবরসের লীলা, স্বপ্নলোকের উৎসব। তার পর দ্বিতীয় বয়সে এল কাজের তাগিদ। এই উপলক্ষে মানুষের সঙ্গে কাছাকাছি মিল্‌তে হোলো। তখনি এল কর্ত্তব্যের আহ্বান। জলের ভিতর থেকে স্থল মাথা তুল্‌ল। সেখানে জলের ঢেউয়ে আর ঊনপঞ্চাশ পবনের ধাক্কায় ট'লে ট'লে কেবল ভেসে বেড়ানো নয়, বাসা বাঁধার পালা, বিচিত্র তার উদ্যোগ। মানুষকে জান্‌তে হোলো, রঙীন্ প্রদোষের আবছায়ায় নয়, সে তার সুখ দুঃখ নিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল বাস্তবলোকে। সেই মানব অতিথি যখন মনের দ্বারে ধাক্কা দিয়ে বল্‌লে, অয়মহং ভোঃ, সেই সময়ে ঐ কবিতাটা লিখেছিলুম, এবার ফিরাও মোরে। শুধু আমার কল্পনাকে নয়, কলাকৌশলকে নয়, দাবি করলে আমার বুদ্ধিকে চিন্তাকে সেবাকে আমার সমগ্র শক্তিকে, সম্পূর্ণ মনুষ্যত্বকে।

তখন থেকে জীবনে আর এক পর্ব্ব সুরু হোলো। একটা আর একটাকে প্রতিহত করলে না—মহাসাগরে পরিবেষ্টিত মহাদেশের পালা এল। মাতামাতি ঐ রসসাগরের দিকে, আর ত্যাগ ও তপস্যা ঐ মহাদেশের ক্ষেত্রে। কাজেও টানে, নেশাতেও ছাড়ে না। বহুদিন আমার নেশার দুই মহল ছিল বাণী এবং গান, শেষ বয়সে তার সঙ্গে আর একটি এসে যোগ দিয়েছে—ছবি। মাতনের মাত্রা অনুসারে বাণীর চেয়ে গানের বেগ বেশি, গানের চেয়ে ছবির। যাই হোক্ এই লীলাসমুদ্রেই আরম্ভ হয়েছে আমার জীবনের আদি মহাযুগ—এইখানেই

ধ্বনি এবং নৃত্য এবং বর্ণিকাভঙ্গ, এইখানেই নটরাজের আত্মবিস্মৃত তাণ্ডব। তার পরে নটরাজ এলেন তপস্বী-বেশে ভিক্ষুরূপে! দাবির আর শেষ নেই। ভিক্ষার ঝুলি ভরতে হবে। ত্যাগের সাধনা, কঠিন সাধনা।

এই লীলা এবং কর্ম্মের মাঝখানে নৈষ্কর্ম্ম্যের অবকাশ পাওয়া যায়। ওটাকে আকাশ বলা যেতে পারে, মনটাকে শূন্যে উড়িয়ে দেবার সুযোগ ঐখানে—না আছে বাঁধা রাস্তা, না আছে গম্য স্থান, না আছে কর্ম্মক্ষেত্র। শরীর মন যখন হাল ছেড়ে দেয় তখনি আছে এই শূন্য।

শান্তিনিকেতন
১৫ মাঘ, ১৩৩৯

এই পৃথিবীকে আমরা ভালো বেসেছি, এ'কে আমাদের ভালো লাগে, কেবলমাত্র এ জন্যে নয় যে, এর থেকে আমাদের প্রয়োজন সাধ্য হয়। এর রঙে রূপে রসে আমাদের মন ভুলিয়েছে। এর সকাল বেলাকার সূর্য্যোদয় কেবল যে আমাদের আলো দেয় তা নয়, তার চেয়ে বেশি কিছু দেয় যাকে বলি আনন্দ। সেই আনন্দের উপাদানগুলি খুব সূক্ষ্ম খুব ব্যাপক, সেগুলির স্পর্শে খুসি হয়ে আমাদের মন দেয় সাড়া। আমার বাগানের রাস্তায় সকালে যখন বেড়াচ্ছি দেখি আমার পলাশ ডালে ডালে গুটি ধরেছে, পাতা-ঝরা শিমূল গাছ ভরে গেছে কুঁড়িতে, অপেক্ষা করে আছি কবে মাঘের শেষে হাওয়া দেবে দখিন থেকে, নীল আকাশের আঙিনায় ফুলের গুচ্ছে গুচ্ছে লাল রঙের পাগলামি লেগে যাবে। এই যে আমাদের অন্তরের সঙ্গে বাহিরের একটা ভালো-

লাগবার সম্বন্ধ নানা প্রকার রূপকে নিয়ে ভাবকে নিয়ে গভীর হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, একে অবজ্ঞা করা চলে না। এ যে কেবল সুখের, আরামের তা নয়, এর মধ্যে কঠোরতা আছে, বেসুর আছে, দ্বন্দ্ব আছে। সব সুদ্ধ জড়িয়ে এ আমাদের চৈতন্যকে জাগিয়ে রেখেছে, নানা রঙে রঙিয়ে রেখেছে। এই যেমন প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের রসবোধের সম্বন্ধ মানুষের সঙ্গেও তেমনি। সে আরো বিপুল, আরো গভীর, তার সুখ-দুঃখের তীব্রতা আরো প্রবল, তার মধ্যে পদে পদে অভাবনীয়তা, তার ঘাতপ্রতিঘাত আমাদের সমস্ত দেহমন প্রাণকে নাড়া দিয়ে তোলে। এই নিয়ে আমাদের চৈতন্যের বিচিত্র অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতার মূল্য অনুসারে আমাদের ব্যক্তিস্বরূপ সম্পদবান হয়ে উঠেছে। মানুষের এই বহুবিচিত্র প্রাণবান অভিজ্ঞতার শ্রেষ্ঠ মূল্য প্রকাশ পাচ্চে তার সাহিত্যে তার কলাবিদ্যায়। এই অভিজ্ঞতা রসের অভিজ্ঞতা, যাকে ইংরেজিতে বলে Emotion। এ বুদ্ধির অভিজ্ঞতা নয়, প্রয়োজনের অভিজ্ঞতা নয়।

শক্তির প্রকাশ দেখলেও মানুষের বিস্ময়মিশ্রিত আনন্দ হয়, সার্কাসে ঘোড়ার উপর ডিগবাজি খেলা দেখলে হাততালি দিয়ে ওঠে। এর একটা হেতু আছে, সেই হেতুটা হচ্চে দুঃসাধ্যসাধন, তাসের খেলার ভোজবাজির মধ্যেও সেই হেতু আছে, কী ক'রে কী হোলো বোঝা গেল না ব'লে মজা লাগল। কিন্তু আমার পলাশ গাছে যখন ফুল ফোটে তখন সে কোনো শক্তির ডিগ্‌বাজির ধাক্কায় আমাদের চৈতন্যকে তরঙ্গিত করে না। "Love is enough" ভালোবাসা ভালোলাগা আপনাতেই আপনি পর্য্যাপ্ত।

মানুষের সব-কিছুর মতো এই ভালোলাগারও একটা চর্চ্চা আছে, একটা বিদ্যা আছে। বিশ্বপ্রকৃতি থেকে মানবপ্রকৃতি থেকে বাছাই ক'রে সাজাই ক'রে মানুষ আপনার একটি বিশেষ আনন্দ-লোক আপনি সৃষ্টি করে তুলছে। দেশে দেশে কত কাব্য কত ছবি কত মূর্ত্তি কত মন্দির

তার এই সৃষ্টির অন্তর্গত। আজ মানুষের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনা হঠাৎ অত্যন্ত বিপুল হয়ে উঠেছে। তার ফল অত্যন্ত প্রভূত, জিনিষ উৎপন্ন হচ্চে অসংখ্য আকারে অসম্ভব বেগে, সংখ্যায় এবং পরিমাণে, শক্তির দুঃসাধ্যতায় ও কৌশলে মানুষের মনকে অভিভূত করে দিয়েছে। লোভে এবং দুরাকাঙ্ক্ষায় মানুষ আপন প্রাণকে পীড়িত ক'রে মানবসম্বন্ধকে ভেঙে চুরে যন্ত্রকে ও বস্তুকে মনুষ্যত্বের চেয়ে বড়ো ক'রে তুলছে। তার এই শক্তিমদমত্ততার অবস্থায় যন্ত্রশক্তির প্রকাশকেই সে যদি বলিষ্ঠ ব'লে আস্ফালন করে এবং প্রাণের প্রকাশকে হৃদয়ের প্রকাশকে বলে সেণ্টিমেণ্টাল দুর্ব্বলতা তাহোলে তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার যে, সুন্দর দুর্ব্বলও নয় সবলও নয়, তা সুন্দর, তার শ্রেষ্ঠতা যদি এই ব'লে বিচার করতে চাই যে সে এক সেকেণ্ডে কয়বার চাকা ঘোরাতে পারে কিম্বা তার উৎপাদনের সংখ্যা কত তাহোলে বলব সেটা বর্ব্বরতা। এবং সেই সঙ্গে এটাও মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে, যন্ত্রের অপরিমিত জটিলতা, তার বিকট আওয়াজ, তার দুরন্তবেগ ও দুর্মূল্য উপকরণ, যাতে ক'রে সে বর্ত্তমান যুগের মনকে ছেলে-ভোলানোর মতো ক'রে ভোলায় সেটাতে তার শক্তির চেয়ে অশক্তিরই পরিচয় বেশি। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির যতই উন্নতি হবে তার হাঁসফাঁসানি ততই কমবে, তার মানুষমারা দৌরাত্ম্য ততই হালকা হয়ে আসবে, তার উপকরণ ততই হবে সহজ। কারখানাঘর কুশ্রী কেননা মানুষের অশক্তিই এখানে উৎকট হয়ে উঠেছে, নিজের শক্তি দিয়ে প্রকৃতির শক্তিকে বাঁধতে গিয়ে বন্ধনটাকেই ক'রে তুলেছে অত্যন্ত জবড়জঙ্গ, সেইটেই তার দুর্ব্বলতা—দুর্ব্বলতা কুশ্রী। যে মানুষ সাঁতার জানে না, সে বিকট রকম হাত পা ছোঁড়াছুড়ি করে, তার আস্ফালনে শিশুর মন ভুলতে পারে কিন্তু যে মানুষ সাঁতার জানে, সমজদার তার সাঁতারের ভঙ্গী দেখে বাহবা দেয়—কেবল যে সেই ভঙ্গী ফলদায়ক তা নয় সেই ভঙ্গী সুশ্রী, তার গতির সুপরিমিত সুঠামতা তার

শক্তির উদ্দামতাকে অনায়াসে সংযত করে রাখে। শক্তি বর্ত্তমান যুগের কলকারখানায় দৈত্যের মতো বিকটাকার, কেন না আপন দুর্দ্দামতাকে সে দেবতার মতো সহজে সংযত করতে পারেনি, তাই সে আমাদের ইন্দ্রিয়বোধকে সৌন্দর্য্যবোধকে মানবসম্বন্ধবোধকে এমন ক'রে পীড়িত করছে। মানুষের কলাবুদ্ধি আনন্দিত হয় দেবতাকে নিয়ে, কলবুদ্ধি দৈত্যকে নিয়ে, এই দৈত্যের সঙ্গে তার লোভ মিতালি করতে পারে কিন্তু তার আনন্দ এর বেদীতে পূজা আনবে না। কলকারখানার প্রয়োজন নেই এমন কথা আমি কখনই বলিনে—কিন্তু সে দাস, পণ্য বিনিময়ের কাজে তাকে পুরো দমে খাটিয়ে নেও কিন্তু তার সঙ্গে হৃদয় বিনিময়ের ভান করতে যাওয়া ছেলেমানুষী।

(২)

চিঠির একটা অংশের উত্তর দেওয়া হয়নি, সেটুকুও যোগ ক'রে দিই : লিখেছ একটা যুগ আসছে যখন আমরা বিজ্ঞান, economic production নিয়ে কবিতা লিখব। কত ধানে কত চাল হয় এই প্রয়োজনীয় বিষয়টা এতকাল ধ'রে এত গৃহস্থকে আলোচনা করতে হয়েছে তবু কেন আজ পর্য্যন্ত এই প্রসঙ্গ নিয়ে কেউ কবিতা লেখেনি। কিম্বা "ধন্য রাজা পুণ্যদেশ, যদি বর্ষে মাঘের শেষ," এই ছড়াটাকে কেউ কেউ সাহিত্যে বড়ো জায়গা দেয় নি? মাঘের শেষে বৃষ্টি হোলে চাষীদের উপকার হয় এ তথ্যটা তো "production" তত্ত্বের অন্তর্গত। এক্স্‌চেঞ্জের বাজার ওঠা নামা নিয়ে দেশজুড়ে সুখদুঃখ তো কম নয়, এ নিয়ে খবরের কাগজে লেখালেখি চলে, কিন্তু ভৈরবীরাগিণীতে আলাপ তো কেউ করে না। মানুষের জীবনের একটা ভাগ আছে যেটা খবর

দেওয়া-নেওয়া নিয়ে—তা নিয়ে লাভ লোকসান ঘটে কিন্তু তা নিয়ে কেউ গান গায় না, নাচে না, মূর্ত্তি বানাতে বসে না। তা নিয়ে যা লেখালেখি হয় তা হিসেবের খাতায়, সেই খাতায় কবিত্ব ফলাতে গেলেই মনিবের কাছে কানমলা খেতে হয়। আইনষ্টাইন বেহালা বাজাতে পারেন এবং ভালোবাসেন কিন্তু রেলেটিভিটি নিয়ে সঙ্গীত রচনার কথা তাঁর মনে হয়নি, সেটা তাঁর পক্ষে ও তাঁর বিজ্ঞানের পক্ষে ভালোই হয়েছে। রেলেটিভিটি তত্ত্বে দেশ ও কালের যুগলমিলন ঘটেছে ব'লে কোনো কবি যদি তাই নিয়ে সনেট্ লিখ্‌তে বসেন, তাহোলে আপত্তি করব না যদি রচনাটা ভালো হয়। কিন্তু সেই উপলক্ষ্যে সাহানা রাগিণীর নাড়া খেয়ে রেলেটিভিটি তত্ত্বটা ঘুলিয়ে যাবে সে কথাটা ধ'রে নিতেই হবে। তোমার মতে, স্বয়ং বিজ্ঞান যখন কবিত্বের আসরে নামবে সেই যুগে অকাম প্রেমের জায়গায় লালসার আকর্ষণ, মানুষের স্বভাবের অতীত ভাবুকতার জায়গায় স্বভাবসঙ্গত প্রবৃত্তি সাহিত্যে সম্মান পাবে।—কথাটা ভেবে দেখা যাক্। কলকারখানা জিনিষটা স্বভাবসঙ্গত নয়। মানুষের হাতদুখানা স্বভাবদত্ত, সেই হাত দিয়ে মাটি খোঁড়াটা ছিল তার পক্ষে স্বাভাবিক, খুঁড়তে গায়ের জোরও লাগত বেশি। অথচ তোমার মতে কৃত্রিম কলকারখানায় মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সেইজন্যে সেইটেই কবিতার বিষয় হওয়া উচিত, তাই ট্র্যাক্‌টার তোমাকে মুগ্ধ করছে। অথচ যাকে তুমি ন্যাচারাল ইন্‌ষ্টিঙ্ক্‌ট অর্থাৎ সহজ প্রবৃত্তি বলেছ সেটাকে তুমি বড়ো বলেছ মানুষের বানানো সেন্টিমেন্টের চেয়ে। এটা যে উল্টো কথা হোলো। সায়ান্সের বেলায় মানুষ পশুর স্বাভাবিক বুদ্ধি ছাড়িয়ে নিজ চেষ্টায় বড়ো হয়ে উঠবে অথচ তার চরিত্রের বেলায় মানুষ পশুর সহজ প্রবৃত্তির দিকে গেলেই তার বাহাদুরী এ কেমনতরো কথা হোলো। ক্ষিদে পেলেই কুকুর যেমন-তেমন জায়গা থেকে যেমন-তেমন ক'রে খায়, ক্ষিদের এইটেই স্বভাব। কিন্তু মানুষ রেঁধে খায়,

সাজিয়ে খায়, যেমন-তেমন ক'রে খাওয়াটাকে ঘৃণা করে। মানুষ খিদের ইন্‌স্টিঙ্ক্‌টের সঙ্গে আর্টের আনন্দ মিলিয়ে তবেই খেয়ে সুখ পায়। সে কুকুরের মতো খায় না ব'লে কেউ তাকে সেণ্টিমেণ্টাল ব'লে উপহাস করে না। অসভ্য মানুষেরা যেমন-তেমন ক'রেই খায় তাই ব'লে তারাই যে উঁচুদরের মানুষ এমন কথা কেউ বলে না। কামুকতা নিয়েই মানুষ পুরো তৃপ্তি পায়নি ব'লেই প্রেমিকতাকে বড়ো ক'রে তুলেছে। তাতে আনন্দের গভীরতা প্রবলতা ও স্থায়িকতা বেশি তাই তার মূল্য বেশি। স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ নিতান্তই যেমন-তেমনভাবে যদি ঘটে তাহোলে সেটা কুকুরদের সমান হয় ব'লেই যদি তাকে প্রবল ও পুরুষোচিত বলা হয় তাহোলে থালা ফেলে দিয়ে ধুলো থেকে খাবার খাওয়া চাই এবং ট্র্যাকটার পুড়িয়ে হাত দিয়ে আঁচড়ে মাটি চাষ করা কর্ত্তব্য। তুমি বলবে হাত দিয়ে মাটিখোঁড়ার চেয়ে ট্র্যাক্‌টার দিয়ে চাষ ক'রে ফল বেশি পাওয়া যায়, আমি বলব অমিশ্র কামুকতার চেয়ে প্রেমিকতায় আনন্দের পূর্ণতা বেশি। ভালো ক'রে খাওয়াও মানুষের সৃষ্টি তেমনি স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধকে সংযমে ত্যাগে শোভনতায় ভরিয়ে তোলাও মানুষের। কেবল শক্তির নয়, আনন্দেরও একটা সায়ান্স আছে, সেই সায়ান্সে মানুষের উপভোগকে তার সহজ পশুত্ব থেকে বড়ো ক'রে তুলেছে, তার বিচিত্র সৌন্দর্য্যসৃষ্টিকে উদ্বোধিত করছে। এতদিন তো মানুষের পশুপ্রবৃত্তিকে দাবিয়ে রাখাকেই বলিষ্ঠতা ব'লে জানত, আজ কি তার উল্টো কথা বলবার দিন এল। যে ভাবীযুগে কেবল সায়ান্সই মানুষের আদিমশক্তিকে ছাড়িয়ে যাবে আর তার চরিত্রই নামবে আদিমতার দিকে, সে যুগে কবিতাই থাকবে না।

শান্তিনিকেতন
১৮আশ্বিন, ১৩৪০

শরৎকালের আলোয় ছুটির আমন্ত্রণ আকাশে আকাশে। কোনো কাজ না করবার মতো মেজাজে আছি, অথচ কাজ এসেছে ভিড় ক'রে। মন ক্লান্ত হয়ে আছে অথচ কলমের বিশ্রাম নেই।

আমি মাটির মানুষ, তার মানে এ নয় যে ভালোমানুষ আমি। তার মানে এই যে, ধরণীর মাটির পাত্র থেকেই আমি অমৃত পান করি—জলস্থল আকাশে আমার মনের খেলাঘর। মেয়েরা শ্বশুর ঘরের উপর বিরক্ত হোলেই বাপের ঘরে চলে যায়। তেমনিতরো মনের ভাব নিয়েই মানুষ দৌড় মারতে চায় বৈকুণ্ঠের দিকে—এই মর্ত্ত্য পৃথিবীর উপর আমার যদি তেমন বিতৃষ্ণা হোত আমিও তাহোলে বৈকুণ্ঠের প্রতি বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরতুম। দরকার হয়নি ব'লে কল্পনাও করিনে। আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি—আমার কাছে এই মর্ত্ত্যের রূপই আনন্দরূপ অমৃতরূপ—একে অবজ্ঞা করি এত বড়ো ধৃষ্টতা আমার নেই। এর চেয়ে আরো কিছু উঁচু আছে ব'লে যে মনে করে, তার নিজের চোখে দোষ আছে। আমার এই উত্তরের দিকের জানলা দিয়ে নীল আকাশ ঢেলে দিচ্চে তার আলোকসুধা, পূর্ব্বদিকের খোলা দরজার সামনে উদার পৃথিবী তার শ্যামল আমন্ত্রণ প্রসারিত করে ধরেছে—আমি এই সোনার ধারা সবুজধারার মোহানায় ব'সে দুই চক্ষুকে ছাড়া দিয়েছি, বেলা যাচ্চে কেটে—আর কী চাই আমার—বুঝতেই পারিনে যতসব হুতবল মন্ত্র। এতবড়ো সুস্পষ্টতার মধ্যেও উপলব্ধি যদি না হয় তবে কিছুতেই হবে না।

শান্তিনিকেতন
২৫চৈত্র, ১৩৪১

মনে পড়ছে সেই শিলাইদহের কুঠি, তেতালার নিভৃত ঘরটি—আমের বোলের গন্ধ আসছে বাতাসে—পশ্চিমের মাঠ পেরিয়ে বহুদূরে দেখা যাচ্ছে বালুচরের রেখা, আর গুণটানা মাস্তুল। দিনগুলো অবকাশেভরা—সেই অবকাশের উপর প্রজাপতির ঝাঁকের মতো উড়ে বেড়াচ্ছে রঙীন পাখাওয়ালা কত ভাবনা এবং কত বাণী। কর্ম্মের দাবও ছিল তারি সঙ্গে—আর হয়তো মনের গভীরে ছিল অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, পরিচয়হীন বেদনা। সব নিয়ে ছিল যে আমার নিভৃত বিশ্ব সে আজ চলে গিয়েছে বহুদূরে। এই বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে ছিল আমার পরিণত যৌবন—কোনো ভারই তার কাছে ভার ছিল না—নদী যেমন আপন স্রোতের বেগেই আপনাকে সহজে নিয়ে চলে, সেও তেমনি আপনার ব্যক্ত অব্যক্ত সমস্ত কিছুকে নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে চলেছিল—যে ভবিষ্যৎ ছিল অশেষের দিকে অভাবনীয়।—এখন আমার ভবিষ্যৎ এসেছে সঙ্কীর্ণ হয়ে। তার প্রধান কারণ, যে-লক্ষ্যগুলো এখন আমার দিনরাত্রির প্রয়াসগুলিকে অধিকার করেছে তারা অত্যন্ত সুনির্দ্দিষ্ট। তার মধ্যে অচরিতার্থ অসম্পূর্ণ আছে অনেক কিন্তু অপ্রত্যাশিত নেই। এইটেতেই বোঝা যায় যৌবন দেউলে হয়েছে কেননা যৌবনের প্রধান সম্পদ হচ্চে অকৃপণ ভাগ্যের অভাবনীয়তা। তখন সামনেকার যে অজানা ক্ষেত্রের ম্যাপ আঁকা বাকি ছিল, মাইলপোষ্ট বসানো হয়নি সেখানে, সম্ভবপরতার ফর্দ্দ তলায় এসে ঠেকেনি। আমার শিলাইদহের কুঠি পদ্মার চর সেখানকার দিগন্তবিস্তৃত ফসলক্ষেত ও ছায়ানিভৃত গ্রাম ছিল সেই অভাবনীয়কে নিয়ে যার মধ্যে আমার কল্পনার ডানা বাধা পায়নি। যখন শান্তিনিকেতনে

প্রথম কাজ আরম্ভ করেছিলেম তখন সেই কাজের মধ্যে অনেক খানিই ছিল অভাবনীয়, কর্ত্তব্যের সীমা তখন সুনির্দ্দিষ্ট হয়ে কঠিন হয়ে ওঠেনি, আমার ইচ্ছা আমার আশা আমার সাধনা তার মধ্যে আমার সৃষ্টির ভূমিকাকে অপ্রত্যাশিতের দিকে প্রসারিত ক'রে রেখেছিল—সেই ছিল আমার নবীনের লীলাভূমি—কাজে খেলায় প্রভেদ ছিল না। প্রবীণ এল বাইরে থেকে, এখানে কেজো লোকের কারখানা ঘরের ছক কেটে দিলে, কর্ত্তব্যের রূপ সুনির্দ্দিষ্ট ক'রে দিলে, এখন সেইটের আদর্শকে নিয়ে চালাই পেটাই করা হোলো প্রোগ্রাম—হাপরের হাঁপানি শব্দ উঠছে, আর দমাদম চলছে হাতুড়ি পেটা। যথানির্দ্দিষ্টের শাসন আইনে কানুনে পাকা হোলো, এখানে অভাবনীয়কেই অবিশ্বাস ক'রে ঠেকিয়ে রাখা হয়। যে পথিকটা একদিন শিলাইদহ থেকে এখানকার প্রান্তরে শালবীথিছায়ায় আসন বিছিয়ে বসেছিল তাকে সরতে সরতে কতদূরে চলে যেতে হয়েছে তার আর উদ্দেশ মেলে না—সেই মানুষটার সমস্ত জায়গা জুড়ে বসেছে অত্যন্ত পাকা গাঁথুনির কাজ। মাঝখানে প'ড়ে শুকিয়ে এল কবির যৌবন, বৈশাখে অজয় নদীর মতো। নইলে আমি শেষদিন পর্য্যন্তই বলতে পারতুম আমার পাক্‌বে না চুল, মরব না বুড়ো হয়ে। জিৎ হোলো কেজো লোকের। এখন যে কর্ম্মের পত্তন তার পরিমাপ চলে, তার সীমানা সুস্পষ্ট, অন্য বাজারের সঙ্গে তার বাজারদর খতিয়ে দেবার হিসাব মিলবে পাকা খাতায়। মন বলছে, "নিজ বাসভূমে পরবাসী হোলে।" এর মধ্যে যেটুকু ফাঁকা আছে সে ঐ সামনে যেখানে রক্তকরবী ফোটে, সেদিকে তাকাই আর ভুলে যাই যে, পাঁচজনে মিলে আমাকে কারখানাঘরের মালিকগিরিতে চেপে বসিয়ে দিয়ে গেছে।

শান্তিনিকেতন
২৩ বৈশাখ, ১৩৪২

বয়স যখন অল্প ছিল জন্মদিনের প্রভাতে ঘুম থেকে উঠতেই নানা লোকের কাছ থেকে নানা উপহার এসে পৌঁছত। তুমি যেমন ক'রে বাজার ঘুরেছ তেমনি ক'রেই তারা, যারা আমার জন্মোৎসবে খুশি হোত এবং আমাকে খুসি করতে চাইত, দোকানে দোকানে এমন কিছুর সন্ধান করত যা দেখে আমার চমক লাগতে পারে। অপ্রত্যাশিত বই ছবি কাপড় শিল্পদ্রব্য, আর তার সঙ্গে সঙ্গে ফলফুলের ঝুড়ি। তখন জীবনে প্রভাতের আকাশ ছিল উজ্জ্বল স্নিগ্ধ স্বচ্ছ, মন ছিল সুকুমার সরস, সব কিছুতেই ছিল তার ঔৎসুক্য, স্নেহের ছোঁওয়া লাগলেই বেজে উঠত মনোযন্ত্রের তার—তখন জন্মদিনগুলি সমস্ত দিনই গুঞ্জরিত হয়ে থাকত, তার বেশ যেন থামতে চাইত না। তার একটা কারণ, তখনকার পৃথিবী প্রায় ছিল আমার সমবয়সী, পরস্পর এক সমতলে বইত হৃদয়ের আদান-প্রদানের প্রবাহ, জন্মের অধিকাংশই ছিল সামনের দিকে অনুদ্‌ঘাটিত, মন তখন মৌমাছির মতো হাওয়ায় ঘুরে বেড়াত সম্ভাব্যতার প্রত্যাশায়, অনাঘ্রাত পুষ্পের সৌরভে। এখনকার জন্মদিন তো কাঁচা নয়, কচি নয়, মন তার সকল প্রত্যাশার শেষে এসে পৌঁচেছে। অজানা পথে চলতে চলতে ভাগ্যের হাতে হঠাৎ অভাবনীয় দান পেয়ে অধীর হয়ে উঠব এই ছিল তখনকার আকাশবাণীতে, তখনকার জন্মদিনের অভাবিতপূর্ব্ব উপহারগুলিও এই বাণী বহন করত। তখনকার সেই জন্মদিনের ধারা এখন আর নেই। কিন্তু উৎসর্গ যে আসে না তা নয়—কিন্তু সে আসে দূরের দান পায়ের কাছে, কণ্ঠে আসে না হাতে আসে না—উপহার আসে না অঞ্জলি থেকে অঞ্জলিতে। দেবতারা কি খুসি হন তাঁদের

পূজায়, মর্ত্ত্য যখন স্বর্গের দ্বারের উদ্দেশে রেখে আসে তার নৈবেদ্য। সেই আমার অল্প বয়সের পঁচিশে বৈশাখের স্নিগ্ধ ভোরবেলাটা মনে পড়ছে—শোবার ঘরে নিঃশব্দচরণে ফুল রেখে গিয়েছিল কা'রা, প্রত্যূষের শেষঘুম ভ'রে গিয়েছিল তারি গন্ধে—তারপরে হেসেছি ভালো-বাসার এই সমস্ত সুমধুর কৌশলে, তারাও হেসেছে আমার মুখের দিকে চেয়ে। সার্থক হয়েছে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ।

অপরাহ্ণ এখন রৌদ্রতাপে ক্লান্ত, মাঝে মাঝে একটা কোকিল ডাকছে বোধ হয় য়ুকলিপ্‌টস্‌ গাছের ডালে ব'সে—এতে ক'রে কোকিলের আধুনিকতার প্রমাণ হয়, উচিত ছিল ওর বকুলের ডালে আশ্রয়। কিন্তু ওর দোষ নেই। পূর্ব্ব আকাশে মেঘের প্রলেপ লেগেছে—কিন্তু বর্ষণের আশা বারবার প্রতিহত হয়ে চলে যাচ্ছে।